শিব মাহাত্ম্য প্রকাশক

সৌর পুরাণ

সারানুবাদ

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমি
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০

সৌর পুরাণের ভূমিকা

সূর্য এই পুরাণের বক্তা বলে নাম সৌর পুরাণ। যেমন মার্কণ্ডেয় ঋষি বক্তা বলে নাম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী মাহাত্ম্যই সে পুরাণের আকর্ষণ। সৌর পুরাণে শিবের মাহাত্ম্য। বায়ু বা শিব পুরাণের মধ্যে একখানি মহাপুরাণের অন্তর্গত। বায়ু পুরাণ নামে যা প্রচলিত আছে, তা খুব প্রাচীন। শিব পুরাণ ছটি সংহিতায় বিভক্ত, তার একটি সংহিতার নাম বায়বীয়। শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে শিবের বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকেয়র জন্ম, কাশী মাহাত্ম্য ও শিব পূজার বিধি এই পুরাণের বিষয়। বায়ু পুরাণখানি বিষ্ণু পুরাণের মতো প্রাচীন ও সর্বলক্ষণ যুক্ত বলে এই পুরাণখানিরই সারানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সৌর পুরাণ নামক উপপুরাণখানি হস্তগত থাকায় বিকল্প হিসাবে এরই সারানুবাদ প্রকাশ করা হল। এই পুরাণও পুরাণের সমস্ত লক্ষণ যুক্ত এবং এতে শিবের মাহাত্ম্য প্রকাশক সব কথাই বলা হয়েছে। হরপার্বতীর বিবাহের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কার্তিকেয়র জন্ম ও তারকাসুর বধের কথাও আছে। কিন্তু গণেশের জন্মের কথা নেই। তবে কাশীমাহাত্ম্য এবং শিবের নানা কীর্তি মাহাত্ম্য এবং শিব পূজা ও ব্রতাদির বিবরণ আছে। প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা এবং অন্যান্য পুরাণের অনেক কাহিনী ও উপাখ্যানও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে সৌর পুরাণ ব্রহ্ম পুরাণের অন্তর্গত উপপুরাণ এবং শিব মাহাত্ম্য প্রকাশক গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধানতম গ্রন্থ। এর শ্লোক সংখ্যা ছয় হাজার এবং উনসত্তরটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সৌর পুরাণ যে ব্রহ্ম পুরাণের খিল, এ কথা এই পুরাণেই আছে। প্রতর্দন রাজার উপাখ্যান ও শিব নিন্দকের জন্ম এই অধ্যায়গুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লে এই গ্রন্থ রচনার স্থান ও কাল সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে।

প্রতর্দন সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তিনি ব্রহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণপ্রিয় ছিলেন। পাষণ্ডী বা বৌদ্ধ তাঁর রাজ্যে ছিল না। একদিন রাজধানীর বহির্ভাগে একজন ক্ষপণক অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি বিস্ময়ান্বিত হয়ে তাঁর

জাত ধর্ম জানতে চাইলেন। ক্ষপণক বলল, অহিংসা পরম ধর্ম, শারীরিক দমই তত্ত্ব, বোদ্ধা জৈন ও বৌদ্ধ। এর বক্তা ভগবান জিন। রাজা, বেদবেদাঙ্গবেত্তা যাজ্ঞিক বৈষ্ণব দ্বিজ ও মহেশ্বরদের ভয়ে আমি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকি।

নিজের রাজ্যে বেদ বহির্ভূত ব্যক্তি বাস করে বলে রাজা দুঃখিত চিত্তে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলে ব্রহ্মা তাঁকে দর্শন দিয়ে বর দিলেন যে তাঁর রাজ্যের সমস্ত প্রজাই বেদকে মান্য করবে। তাই হল। পৃথিবীতে আর অধার্মিক রইল না। ধর্মরাজের নরক জলশূন্য হয়ে গেল। ধর্মরাজ গেলেন ইন্দ্রের নিকটে, ইন্দ্র একজন কিন্নরকে পাঠালেন প্রতর্দন রাজার রাজ্যে অধর্ম প্রচার করতে। ধরা পড়ে রাজার হাতে সেই কিন্নরের প্রাণ যায়। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মা ভবিষ্যতের কথা বললেন, ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হলে ভূমণ্ডল ম্লেচ্ছে ব্যাপ্ত হবে এবং মানুষ সমস্ত আচারভ্রষ্ট ও অধম হবে। সেই সময়ে আন্ধ্রী দেশে এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের ব্যভিচারের ফলে একজন বিধবা ব্রহ্মণীর যে পুত্র হবে, সে পূর্বাদৃষ্ট বশে সুখী গুণান্বেষী ও অধ্যয়নে উৎসুক হবে। তার নাম মধু শর্মা। গুরুর নিকটে নিজের পরিচয় গোপন করে শাস্ত্রাধ্যয়ন করার জন্য গুরু তাকে শাপ দেবেন, তোমার বেদান্ত সিদ্ধান্তের স্ফূর্তি হবে না, অদ্বৈত দর্শনে হবে জড়তা। তুমি শুধু শাস্ত্রের পূর্ব পক্ষ অবলোকন করবে।

শিবের ক্রোধাগ্নিতে মদন ভস্ম হবার পর তাঁর পত্নী রতি তাদের বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে শিবের নিন্দা প্রচার করবেন বলে স্থির করবেন। ঋতুরাজ বসন্ত ব্রাহ্মণের ঔরসে বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন হয়ে মধু নামে খ্যাত হবেন। তাঁর দ্বারা কর্ণাট তিলঙ্গাদি দেশ দূষিত হবে। এই দুষ্টবুদ্ধি মধু গুরুর শাপগ্রস্ত বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করবে। সেই কাজের জন্য সে দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্য নামে খ্যাত হবে। কলিযুগে তার খুব প্রাধান্যও হবে। তার শিষ্য প্রশিষ্যরা আর্যাবর্ত উৎকল গৌড় গঙ্গা ও গোদাবরীর তীর অধুদারণ্য ছাড়া অন্যত্র প্রচার পারে। কলির প্রচার অনুসারে মহারাষ্ট্রেও তাদের প্রস্তার হতে থাকবে।

বলা বাহুল্য যে এই কাহিনী পড়েই সন্দেহ হয় যে সৌর পুরাণখানি দক্ষিণ ভারতেই কোন স্থানে রচিত হয়েছিল মধ্বাচার্যের পরবর্তীকালে। যিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের বিরোধী ছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

এই সারানুবাদে মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত সৌরপুরাণের মূল ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে এবং পুরাণ পরিচয়ের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে মুখ্যত নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত বিশ্বকোষ' দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত পৃথিবীর ইতিহাস এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ভারত কোষ থেকে। স্নেহাস্পদ সুহৃৎ বিপুলকান্তি চট্টোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম আগ্রহে বিষ্ণুপুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক মার্কণ্ডেয় পুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, দেবীভাগবতের সারানুবাদ ও কল্কিপুরাণের সম্পূর্ণ অনুবাদের পর শিবমাহাত্ম্য প্রকাশক সৌর-পুরাণের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। পুরাণগুলি বাঙালী পাঠকের নিকটে আদৃত হয়েছে দেখে শ্রম সার্থক বলে মনে করি।

রম্যাণি গ্রন্থাকার

বি. এফ. ৭৭. সল্ট্‌ লেক সিটি,

কলিকাতা-৭০০০৬৪

সূচীপত্র

পুরাণ পরিচয়

পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। পুরা ভবম্ ইতি পুরা-ট্যু বা তুট, নিপাতনে তুড় ভাব বা 'ত' লোপ পেয়ে পুরাণ হয়েছে। পুরাকালে প্রাচীন কাহিনীর এক বিশেষ গ্রন্থের নাম ছিল পুরাণ। বেদাদি গ্রন্থে এর উৎপত্তির কথা আছে। অথর্ব বেদে আছে যে যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট থেকে ঋক্ সাম ছন্দ ও পুরাণ উৎপন্ন হয়েছিল।—ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুসা সহ (অথর্ব ১১. ৭. ২৪)। এই রকমেরই কথা আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ (২. ৪ ১০) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪. ৬. ১০. ৬)।—ভিজে কাঠের আগুন থেকে যেমন পৃথক ধোঁয়া বার হয়, তেমনি সমস্ত বেদ ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সেই মহান ভূতের নিঃশ্বাস। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ।—ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম (৭. ১ ১)। বেদ যেমন আর্য ঋষিদের প্রার্থনায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল, কতকটা সেই ভাবেই ঋষিরা পুরাণও পেয়েছিলেন। তাই শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যে 'পুরাণ বেদ, এ সেই বেদ' এই কথা বলে অধ্বর্যু পুরাণ কথা বলেন।—অধ্বর্যুস্তাক্ষ্যো বৈ পশ্যতো রাজেত্যাহ··· পুরাণং বেদঃ সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত (১৩. ৪. ৩. ১৩)।

এখন যেমন পুরাণকে ইতিহাস মনে করা হয় না, সেকালেও তা হত না। ইতিহাস শব্দটিও প্রচলিত ছিল এবং তার একটি বিশেষ অর্থ ছিল। বেদের ভাষ্যে সায়নাচার্য লিখেছেন যে বেদে দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি ঘটনার নাম ইতিহাস।—দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। এবং আগে অসৎ ছিল, আর কিছু ছিল না, ইত্যাদি জগতের আদিম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির বিবরণের নাম পুরাণ।—ইদং বা অগ্রেনৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গ প্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্।

শঙ্করাচার্যও তাঁর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে একই কথা লিখেছেন —উর্বশী পুরূরবার সংবাদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভাগের নাম ইতিহাস এবং সর্বাগ্রে শুধু অসৎ ছিল ইত্যাদি বিবরণের নাম পুরাণ।

একালে অবশ্য পুরাণের এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেকালে যা ইতিহাস বলা হত, তাও এখন পুরাণের অন্তর্গত হয়েছে। অর্থাৎ সেকালের মানুষ যা ইতিহাস বলে মনে করতেন, একালের মানুষ তা আর ইতিহাস মনে করেন না। দেবাসুরের যুদ্ধ বা উর্বশী পুরূরবার কাহিনী এখন পুরাণেরই অন্তর্গত হয়েছে। সূর্য বংশের রাম বা চন্দ্র বংশের কৃষ্ণকে এখন আর ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টই মনে হয় যে পুরাকালে পুরাণ নামে একখানি পবিত্র গ্রন্থ ছিল। কিন্তু গৃহ্যসূত্র মনুসংহিতা ও মহাভারতে পাওয়া যায় যে পুরাণের সংখ্যা অনেক। শিব পুরাণের রেবা খণ্ডে আছে যে বেদব্যাস ছিলেন অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা।— অষ্টাদশ পুরাণানাং বক্তা সত্যবতী সুতঃ। পদ্ম পুরাণের সৃষ্টি খণ্ডেও ঠিক একই কথা আছে। কিন্তু মৎস্য পুরাণে স্পষ্টভাষায় আছে যে প্রথমে একখানি পুরাণই ছিল।—পুরাণমেকমেবাসীৎ (৫৩. ৪)। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও আছে যে সকল শাস্ত্রের আগে ব্রহ্মা পুরাণ প্রকাশ করেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে বেদ নিঃসৃত হয়।

প্রথমং সর্বশাস্ত্রানাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতা ॥ (১ ৫৮)

এই পুরাণে এ কথাও স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে বেদব্যাস একখানি মাত্র পুরাণ সংহিতা প্রচার করেন।

এই সব পৌরাণিক উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মহর্ষি বেদব্যাস যে পুরাণ সংহিতাটি প্রচার করেছিলেন, তাতে তিনি প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসকে একত্র করে তাকেই পুরাণ সংহিতা বলেছিলেন। সংহিতা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এই রকম। এই

গ্রন্থের প্রথম অংশে পুরাণ, তাতে এই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে প্রাচীন ঋষিদের বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার কথা ছিল। এই অংশের রচয়িতার নাম জানা যায় না বলেই তাকে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে যুক্ত হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাসের কথা, পূর্বে যা ইতিহাস নামেই প্রচলিত ছিল। এই একখানি গ্রন্থ থেকেই পরবর্তী কালে যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি রচিত ও প্রচলিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বেদব্যাস যদি নিজে এই মহাপুরাণগুলি রচনা করতেন, তাহলে একই বিষয়বস্তু সকল গ্রন্থে আলোচিত হত না এবং বিভিন্ন পূরাণে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হত না।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে বেদব্যাস আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্পশুদ্ধি দিয়ে পুরাণ সংহিতাটি রচনা করেন। নিজের চোখে দেখে যা লেখা হয় তার নাম আখ্যান, উপাখ্যান হল পরম্পরাশ্রুত কথা, পরলোক ও অন্যান্য বিষয়ে গীতের নাম গাথা এবং শ্রাদ্ধ কল্পাদি নির্ণয়কে কল্পশুদ্ধি বলা হয়। বেদব্যাস তাঁর সূত জাতীয় শিষ্য রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণকে এই পুরাণ সংহিতা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের অধিকাংশ পুরাণই এই সূতের মুখে বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে সূত নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই বলে যে সূত তাঁদের জাতীয় নাম এবং পুরাণ পাঠ তাঁদের জাতীয় ধর্ম। বেদব্যাসের শিষ্য সূতের বর্ণনায় শ্রোতাদের দেহ রোমাঞ্চিত হত বলেই তাঁর নাম রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণ হয়েছিল। সেদিন এই পুরাণ ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে বেদব্যাসের কাল পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এই পুরাণ সংহিতায় বিধৃত হয়েছিল।

সেকালে পুরাণ সংহিতা কোন ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত হত না। তা হলে বেদব্যাস সূতকে পুরাণ সংহিতা দিতেন না। সূতের পিতা

ব্রাহ্মণ ছিলেন না। পুরাণ সংহিতা ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত হলে বেদব্যাস নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যকে এই গ্রন্থ দিতেন, বেদের মতো পুরাণও ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত হত। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দ্বিতীয় ভাগে ঠিক এই কথাই লিখেছেন, 'পুরাণে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশ বিবরণ, মন্বন্তর এবং প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের চরিত্র বিষয়ের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। ধর্ম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ দেওয়া ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এখনকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথন, দেবার্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত নিয়মাদির বিবরণেতেই পরিপূর্ণ। তাহাতে পূর্বোক্ত পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র। যদি ধর্মোপদেশ দান ইদানীন্তন প্রচলিত পুরাণের ন্যায় পূর্বতন পুরাণেরও উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা সূত জাতির ব্যবসায় না হইয়া অধুনাতন ব্রাহ্মণ কথকের ন্যায় ষট্‌কর্মশালী ব্রাহ্মণ বর্ণেরই বৃত্তি বিশেষ বলিয়া ব্যবস্থিত হইত। ঋষি, মুনি ও অপর সাধারণ ব্রাহ্মণগণকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সূতাদি নিকৃষ্ট জাতির ব্যবসায় হওয়া কদাচ সম্ভব নয়।'

রোমহর্ষণের ছয়জন শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের মধ্যে তিনজন কশ্যপ বংশীয়ের নাম শাংসপায়ন অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। এঁরা তিনজন গুরুর কাছ থেকে পাওয়া মূল পুরাণ সংহিতা অবলম্বন করে এক একখানি নূতন পুরাণ রচনা করেন। এই ভাবেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রচয়িতা পুরাণগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। পুরাণগুলির ভাষা ভাব ও রচনাভঙ্গি বিশ্লেষণ করে এই কথাই প্রমাণ হয় যে একটি সুবিস্তৃত কালের মধ্যে পুরাণগুলি রচিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন, 'সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণু পুরাণের রচনা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন, যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত

পুরাণের এক এক অংশ পাঠ করিলে এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর। বিষ্ণু পুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণু পুরাণ কিম্বা ভাগবত, অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না।'

এই প্রসঙ্গেই পুরাণগুলির রচনা কালের কথা এসে পড়ে। সাধারণ ভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা এবং তিনি দ্বাপরের শেষে ও কলির প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। পুরাণেই এই হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু প্রফেসর এইচ. এইচ. উইলসন বলেছেন, 'And the testimony that establishes their existence three centuries before christianity, carries it back to a much more remote antiquity—to an antiquit that is probably not surpassed by any of the prevailing fictitious institutions or beliefs of the ancient world.' তাঁর মতে খ্রীষ্টের জন্মের তিন শো বছর আগে এই পুরাণগুলি যে বিদ্যমান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সব প্রমাণ দেখা যায় তাতে আরও অনেক প্রাচীনকালে—প্রাচীন পৃথিবীর কোন জাতির কল্পনায়ও যা আসতে পারে না, তেমন অতীতে—এই সব পুরাণ বিদ্যমান ছিল বলা যেতে পারে। এই সশ্রদ্ধ মন্তব্যে এ দেশের পণ্ডিতরা সুখী হতে পারেন না। পাঁচ হাজার বছরকে তিন শো বছর বলায় তাঁদের সংস্কারে বোধহয় আঘাত লেগেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন যে বিষ্ণু পুরাণে ভবিষ্যৎ রাজবংশের কথায় নন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুরুষের উল্লেখ দেখেই তাঁর মনে হয়েছে যে গ্রন্থখানি এই সময়ের পরে রচিত। ভবিষ্যৎ রাজবংশের কথা যে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে

পারে, সে কথা তাঁর মনে হয় নি ; বা হলেও সে সম্ভাবনার কথা তিনি মেনে নেন নি। সে যুগে ছাপাখানার সৃষ্টি হয় নি। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তখন হাতে লিখে রক্ষা করা হত এবং পণ্ডিতরা এই কাজ করবার সময়ে যে কিছু যোগ করতেন না, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক গ্রন্থেই অনেক শ্লোক অনায়াসে প্রক্ষিপ্ত হত।

যে পুরাণে শুধু সৃষ্টি রহস্যের বিবরণ ছিল, নিঃসন্দেহে তা বৈদিক যুগের। বেদ যেমন আর্য ঋষিদের কল্পনায় উদিত হয়েছিল, এই পুরাণও তেমনি তাঁদের তপস্যার ফল। বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণে পাওয়া যায় পুরাণেরই পঞ্চ লক্ষণ। সেগুলি হল সর্গ বা সৃষ্টি-তত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা লয় ও পুনর্সৃষ্টি, দেবতা ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। বংশানুচরিতে সূর্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদের বিবরণ। বৈদিক পুরাণে শুধু সৃষ্টি বিষয়ের বর্ণনা ছিল বলেই মেনে নিতে হয় যে পরবর্তী কালেই পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে। হতে পারে যে বেদব্যাস সঙ্কলিত প্রথম পুরাণ সংহিতার এই পঞ্চ লক্ষণ পরবর্তী কালে পুরাণ রচনার আদর্শ বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। বেদব্যাস সঙ্কলিত মূল পুরাণ সংহিতাও যে অতি প্রাচীন কালে রচিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন না হলেও নিঃসন্দেহে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি যে অনেক পরবর্তী কালের রচনা, তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম নিয়েও কিছু মতবিরোধ আছে। যেমন, কেউ বলেন যে বিষ্ণু পুরাণের পর শিব পুরাণ, কেউ বলেন বায়ু পুরাণ বিষ্ণু পুরাণের পর। কারও মতে শিব ও বায়ু পুরাণ একই, আবার অন্যের মতে এ দুটি পুরাণ ভিন্ন। শিব পুরাণও দুখানি আছে। ভাগবত নিয়েও এই রকম মতভেদ আছে। বৈষ্ণবরা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে মহাপুরাণ বলেন ; কিন্তু শাক্তরা বলেন দেবী ভাগবতই মহাপুরাণ।

কাজেই এই দুই পুরাণের একটিকে মহাপুরাণ ও অন্যটিকে উপপুরাণ বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণ ভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবতই মহাপুরাণ বলে স্বীকৃত।

এই সব পুরাণের ক্রম নিয়েও পুরাণে পুরাণে বিরোধ আছে। এই বিষয়ে বিষ্ণু পুরাণের মতই সর্বাধিক গ্রাহ্য। ক্রমানুসারে বিষ্ণু পুরাণ তৃতীয়। কাজেই তার পরে যে সব পুরাণ চচিত হয়েছে তার ক্রম নির্দেশ যে বিষ্ণু পুরাণে সম্ভব নয়, তাও স্বীকার করতে হয়। মোটামুটি ভাবে সমন্বয় করে যে ক্রম নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই ভাবেই পুরাণগুলির আলোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনায় উইলসন সাহেবের মতও অন্তর্ভুক্ত করা হল।

প্রথম ব্রহ্ম পুরাণ। এর পূর্ব ভাগে সৃষ্টি প্রসঙ্গে দেবাসুরের জন্ম বৃত্তান্ত এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনায় বিষ্ণু পুরাণের মিল অত্যন্ত বেশি। এতে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নেই। উড়িষ্যার মন্দিরের বর্ণনা দেখে মনে হয় যে এই পুরাণ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দের পরে রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ম পুরাণ। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত এই পুরাণ দ্বিতীয় বৃহত্তম। অথচ পুরাণের প্রকৃত লক্ষণ এতে নেই। সৃষ্টি খণ্ডে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা, ভূমি খণ্ডে পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল, স্বর্গ খণ্ডের প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরে তীর্থের মাহাত্ম্য ও ধর্মালোচনা, পাতাল খণ্ড রামায়ণের একটি অংশ এবং উত্তর খণ্ড ধর্মতত্ত্বের বিবৃতি। এই পুরাণে ভারতে ম্লেচ্ছের আগমন জৈন আচার ও আধুনিক বৈষ্ণবদের চিহ্ন ধারণের প্রসঙ্গ দেখে অনেকেই এটি দ্বাদশ শতাব্দের পরের রচনা মনে করেন এবং শেষ খণ্ডটি পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দে রচিত বলে অনুমান করেন।

তৃতীয় বিষ্ণু পুরাণ। এই পুরাণ ছয়টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সৃষ্টি বিবরণ ও ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি চরিত্র বর্ণনা, দ্বিতীয় অংশে ভরত বংশের বিবরণ ও জম্বু্দ্বীপ ও সপ্ত পাতাল প্রভৃতির বর্ণনা, তৃতীয় অংশে মন্বন্তর ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি, চতুর্থ অংশে সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, পঞ্চম অংশে কৃষ্ণের কথা ও ষষ্ঠ অংশে কলির বর্ণনা আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর থেকে ভবিষ্য রাজবংশের বিচার করে একাদশ শতাব্দের মধ্য ভাগ পাওয়া যায়। বৌদ্ধরাও এ দেশে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাব-শালী ছিল। কাজেই এই সময়ের মধ্যেই বিষ্ণু পুরাণ রচিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

চতুর্থ বায়ু বা শিব পুরাণ। বায়ু পুরাণ নামে যে পুরাণ এখন প্রচলিত আছে, তা সব চেয়ে প্রাচীন ও পুরাণের সমস্ত লক্ষ্মণ যুক্ত। ছটি সংহিতায় বিভক্ত শিব পুরাণের একটি সংহিতার নাম বায়বীয় সংহিতা, পূর্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ নামে তার দুটি ভাগ। শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। জগতের উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে শিবের বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম, কাশী মাহাত্ম্য ও শিবপূজার বিধি এই পুরাণে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম শ্রীমদ্‌ভাগবত। এটি শ্রেষ্ঠ পুবাণের অন্যতম। রচনার গুণ ও সাহিত্যিক মূল্যেই শ্রেষ্ঠ। অনেকের ধারণা যে এটি ব্যাসদেব বিরচিত এবং বিষ্ণু পুরাণের সমকালীন। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার এই পুরাণের উদ্দেশ্য বলে বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থের পূজা করেন। এই গ্রন্থে দ্বাদশটি স্কন্ধ আছে এবং অন্যান্য পুরাণের ন্যায় নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ চরিত্র বর্ণনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পুরাণের মতে সকলের উপরে ভক্তি এবং ভক্তি থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শাক্ত মতে দেবী ভাগবতই পঞ্চম পুরাণ। এই পুরাণটিও দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত এবং দুটি ভাগবতেই শ্লোকের সংখ্যা আঠারো

হাজার। দেবী ভাগবতে দেবী দুর্গার চরিত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ নারদ পুরাণ। চার পাদে বিভক্ত এই পুরাণে বিষ্ণুর প্রাধান্য কীর্তন করা হয়েছে। হরির উপাসনায় যে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় তা নানা উপাখ্যানে প্রমাণের চেষ্টা আছে। নারদীয় ও বৃহন্নারদীয় নামে একই রকমের দুখানি পুরাণ আছে। এই পুরাণের শেষাংশে আছে যে দেবনিন্দক ও গোঘাতকের নিকটে যেন এই পুরাণ পাঠ করা না হয়। এর থেকেই অনুমান করা হয় যে মুসলমান অধিকারের পর ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দে এই পুরাণ রচিত হয়েছে। এতে পুরাণের লক্ষণ নেই বলে একে পুরাণ না বলে ভক্তিগ্রন্থ বললেই ভাল হত।

সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এই পুরাণে সৃষ্টি রহস্য, দর্শন, তীর্থ মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ তো আছেই, তার উপরে নানা সুন্দর উপাখ্যানের মধ্যে আছে দেবী মাহাত্ম্য নামে দুর্গা স্তব। এই দুর্গা স্তব চণ্ডী নামে হিন্দুর গৃহে পূজার মতো শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করা হয়। পুরাকালে চণ্ডীমণ্ডপে নিত্য চণ্ডী পাঠের ব্যবস্থা ছিল। এই পুরাণটি অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন এবং নবম বা দশম শতাব্দীতে সংগৃহীত বলে অনুমান করা হয়।

অষ্টম অগ্নি পুরাণ। অগ্নির নিকট থেকে পাওয়া বলে এই পুরাণ অগ্নি পুরাণ নামে অভিহিত। এই পুরাণে অবতারের কথা, রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের কাহিনী এবং পূজা ও ব্রত পদ্ধতি, দেব দেবীর আকার বর্ণনা ও তীর্থ মাহাত্ম্যের সঙ্গে নানা শাস্ত্রের আলোচনা আছে। যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও পশু চিকিৎসা, সাহিত্য ব্যাকরণ ছন্দপ্রকরণ রাজধর্ম ও রত্ননিরূপণ এবং ব্যাকরণ অংশে ধাতু ও শব্দরূপও পাওয়া যায়। যুদ্ধপ্রণালী ও অস্ত্রাদি নির্মাণের পদ্ধতি, দুর্গ

ও নগর নির্মাণের কৌশল, এমন কি তন্ত্রের বীজ মন্ত্রও এই পুরাণে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকে কোন প্রাচীন পুরাণ বলে মনে হয় না, কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংকলন।

নবম ভবিষ্য পুরাণ। এই পুরাণের পাঁচটি পর্বে ব্রহ্মের প্রাধান্য প্রকাশের প্রয়াস আছে। প্রথম চারটি পর্বে সংক্ষেপে সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনার পরে বিষ্ণু শিব ও সূর্য পূজা ও এই দেবতাদের মাহাত্ম্যের বিশদ বর্ণনা আছে। পঞ্চম পর্বে স্বর্গের বর্ণনা। প্রাচীন রাজবংশের কাহিনীও এই পুরাণে আছে। এরই মধ্যে শাক দ্বীপের সূর্য উপাসক 'মগ' জাতির উল্লেখ দেখে উইলসন সাহেব মনে করেন যে এতে ইরাণের অগ্নি উপাসকদের কথা বলা হয়েছে। বম্বে থেকে প্রকাশিত ভবিষ্য পুরাণে মোগল বাদশাহ আকবরের কথা, কলকাতার বর্ণনা এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের নাম দেখে অনেকে একে পুরাণ না বলে আধুনিক গ্রন্থ কিংবা কতকগুলি বিষয়কে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

দশম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। এই পুরাণ চার খণ্ডে বিভক্ত। ব্রহ্ম খণ্ডে সৃষ্টির ব্যাপারে কৃষ্ণের দেহ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি দেখানো হয়েছে, প্রকৃতি খণ্ডে সৃষ্টি কার্যে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী ও রাধা এই পঞ্চ প্রকৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, গণেশ খণ্ডে গণেশের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ডে কৃষ্ণলীলার কথা। প্রকৃতি ও গণেশ খণ্ডে অনেক পৌরাণিক কাহিনীও স্থান পেয়েছে। রাধার প্রসঙ্গ আর কোন পুরাণে পাওয়া যায় না বলে অনেকেই মনে করেন যে এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকেই রাধা কৃষ্ণ লীলার কথা প্রচলিত হয়েছে।

একাদশ লিঙ্গ পুরাণ। দুই ভাগে বিভক্ত এই পুরাণের উদ্দেশ্য

শিব মাহাত্ম্য ও লিঙ্গ পূজার পদ্ধতি প্রচার। প্রথম ভাগে সৃষ্টি বিবরণের পর লিঙ্গের উদ্ভব ও পূজা, শিবের বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে বিষ্ণু ও শিব মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ আছে। এই পুরাণে আছে যে প্রলয়ের পরে যে অগ্নিময় লিঙ্গের উৎপত্তি হয়, তার জ্যোতিতেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জ্যোতির্ময় হয়েছেন। এই লিঙ্গ থেকেই বেদাদি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে পুরাণটি আধুনিক হলেও এই সময় থেকেই লিঙ্গ পূজার প্রচলন হয়েছে।

দ্বাদশ বরাহ পুরাণ। এই পুরাণে বরাহ অবতারের লীলা প্রসঙ্গ আছে। পুরাণের লক্ষণ, সৃষ্টি বিবরণ, দশাবতার তত্ত্ব, পূজাপার্বণ, ব্রত কথা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। অনেকে এটিকেও লিঙ্গ পুরাণের মতো পুরাণ না বলে একখানি ধর্মগ্রন্থ বলেন। রামানুজের কালের কথা দেখে এই পুরাণকে দ্বাদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়।

ত্রয়োদশ স্কন্দ পুরাণ। এই বৃহত্তম পুরাণটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। কাশী উৎকল ও প্রভাস খণ্ডে এই তিনটি তীর্থ ও দেবতার মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। মহেশ্বর খণ্ডে শিবের ও বৈষ্ণব খণ্ডে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন এবং ব্রহ্ম খণ্ডে রামেশ্বর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের অনেক তীর্থের কথা আছে। অনেকে বলেন যে অবন্তী খণ্ড নামে আর একটি খণ্ডে আরও অনেক তীর্থের বিবরণ আছে। এই খণ্ডগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত বলে মনে করা হয়। স্কন্ধ পুরাণে এত তীর্থের বিবরণ আছে যে এটিকে তীর্থের পুরাণ বললে অনুচিত হবে না।

চতুর্দশ বামন পুরাণ। এই পুরাণে বিষ্ণুর বামন অবতারের কাহিনীই প্রধান। অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী থাকলেও এই পুরাণে বিষ্ণুর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তিন চার শো বৎসর পূর্বে

কাশীবাসী কোন ব্রাহ্মণ এই পুরাণ সংগ্রহ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

পঞ্চদশ কূর্ম পুরাণ। এই পুরাণের চারটি সংহিতার মধ্যে এখন শুধু ব্রহ্ম সংহিতাই পাওয়া যায় এবং এই সংহিতাটিই কূর্ম পুরাণ নামে প্রচলিত। এতে সৃষ্টি ও বংশ বিবরণ থেকে শুরু করে নানা পৌরাণিক কাহিনী ও ক্রিয়া মাহাত্ম্য আছে। ঈশ্বর গীতায় দর্শন তত্ত্বের ভক্তি সাঙ্খ্য ও কালযোগ এবং ব্যাস গীতায় ব্রহ্মচারী ধর্মের কথা আছে। অনেকের মতে এই ঈশ্বর গীতা শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার সঙ্গে তুলনীয়। শিব ও দুর্গার মাহাত্ম্য এই পুরাণে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং এই পুরাণের মতে শিব পুরাণ ও বায়ু পুরাণ এই দুইটি মহাপুরাণ। এতে কয়েকটি তন্ত্র শাস্ত্রের উল্লেখ দেখে মনে করা হয় যে পুরাণখানি বেশি পুরাতন নয়।

ষোড়শ মৎস্য পুরাণ। এই পুরাণে বিষ্ণুর মৎস্য অবতারের কাহিনী প্রধান হলেও আরও অনেক পৌরাণিক কাহিনী, সূর্য ও চন্দ্র বংশ ও ভবিষ্য রাজ বংশের বিবরণ আছে। এতে মহাপুরাণের পঞ্চ লক্ষণ আছে ; কিন্তু এই পুরাণে উপপুরাণের বর্ণনা দেখে অনেকে একে বেশি প্রাচীন বলে স্বীকার করেন না।

সপ্তদশ গরুড় পুরাণ। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে দুই খণ্ডে বিভক্ত এই পুরাণে গরুড়ের কোন কথা নেই। এতে অনেক পূজা প্রায়শ্চিত্ত ব্রতকথাদি আছে ; রত্ন পরীক্ষা, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ, ছন্দ, স্ত্রীবশীকরণ, মশক নিবারণের কথাও আছে। এ ছাড়া সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ, নানা পৌরাণিক কাহিনী ও নরকের বর্ণনা আছে। এই পুরাণে অনেক নীতি কথা ও রাজ ধর্মের কথাও পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। স্কন্দ পুরাণের সব কয়টি খণ্ড যেমন একত্রে পাওয়া যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণও পাওয়া যায় না। বায়ু পুরাণের শেষ অংশের নাম ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হয়েছে কিনা বোঝা যায় না। এখন যা পাওয়া যায় তাতে অনেক পৌরাণিক কথা আছে। তার মধ্যে প্রধান হল সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত অধ্যাত্ম রামায়ণ। এই রামায়ণের অন্তর্গত রাম গীতায় অনেক দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আছে।

উপরে উক্ত পুরাণগুলির সংকলন কাল সম্বন্ধে বিদেশী পণ্ডিতেরা যে মত প্রকাশ করেছেন, আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত তা মেনে নিলেও অনেকে তা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেন যে প্রধান পুরাণগুলির সঙ্কলন কাল বৈদিক যুগের ঠিক পরেই। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের অনুবাদ করেছিলেন ডক্টর বুহ্‌লার। তিনি ঐ গ্রন্থখানি তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলে মনে করেন, এমন কি পাণিনির পূর্বেও তা রচিত হয়ে থাকতে পারে বলেছিলেন। এই গ্রন্থে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাবের কোন উল্লেখ না থাকায় এটি খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দে রচিত বলে মনে করা হয়। আর এই গ্রন্থে কোন পুরাণ ও ভবিষ্য পুরাণ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণের মতে ভবিষ্য পুরাণের ক্রম নবম বলে সে সময়ে এর পূর্বেকার আটখানি পুরাণ প্রচলিত ছিল ভাবলে অনুচিত হবে না। যবদ্বীপে যে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পাওয়া যায় তা এ দেশের পুরাণ থেকে অভিন্ন। পঞ্চম শতাব্দে হিন্দুরা এই গ্রন্থ যবদ্বীপে নিয়ে যান এবং সেখানকার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভবিষ্য রাজবংশের উল্লেখ নেই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণের শেষ পুরাণ এবং এর থেকেই প্রমাণ হয় যে পঞ্চম শতাব্দের পূর্বেই সমস্ত পুরাণগুলি রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্য রাজবংশ এর পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ভারতে তখন গুপ্ত যুগের শেষ অবস্থা। অনুমান করা যেতে পারে যে ষষ্ঠ শতাব্দে গুপ্ত যুগের শেষ রাজারাই নিজেদের

নাম পুরাণে প্রক্ষেপ করিয়েছেন। এই ভাবে বিচার করলে মেনে নিতে আপত্তি হবে না যে বিষ্ণু পুরাণ পরীক্ষিতের সময়, গরুড় পুরাণ জনমেজয়ের পর এবং জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ সংকলিত হয়েছিল।

বেদব্যাস যে পুরাণ সংহিতা সঙ্কলন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য কোথাও লিপিবদ্ধ করে না গেলেও অনুমান করা শক্ত নয় যে সেটি শিক্ষামূলক গ্রন্থ ছিল। কী ভাবে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, প্রাণীর জন্ম হয়েছে কী ভাবে এবং পুরাকালে যে ইতিহাস প্রচলিত ছিল তাই সযত্নে সঙ্কলন করে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য শ্রাদ্ধাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে পাঠ করে শোনাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায় যে পরবর্তী কালে এই পুরাণ প্রচারের উদ্দেশ্য হয়েছিল বিষ্ণু শিব ও শক্তির মহিমা প্রচার। অষ্টাদশ পুরাণে এই উদ্দেশ্যই উৎকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শৈব পুরাণকার শিবকে বলেছেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা, তেমনি বৈষ্ণব পুরাণকার বিষ্ণুকে এই সম্মান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে শাক্ত পুরাণকার ভগবতীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তির জননী রূপেও প্রচার করেছেন। আবার সৌরগণের বর্ণনায় সূর্যই সকলের প্রসবিতা। লিঙ্গ পুরাণে শিব বলছেন, তোমরা দুই মহাবলই আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ। তুমি লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার ডান পাশে ও তুমি হৃদয়োদ্ভব বিশ্বাত্মা বিষ্ণু আমার বাঁ পাশে উৎপন্ন হয়েছ। শিব তাই বিষ্ণুকে বৎস বলে সম্বোধন করেছেন। এই ভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্রহ্মা বলছেন, আমি বিষ্ণু কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করছি এবং শিব তাঁর বশে সংহার করছেন। এই ব্রহ্মাই আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যে বলছেন, হে দেবী, তুমি আমার বিষ্ণুর ও শিবের শরীর উৎপাদন করেছ। ভবিষ্য পুরাণে সূর্যকেই সকলের প্রসবিতা বলা হয়েছে।

স্কন্দ পুরাণের কেদার খণ্ডে স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে অষ্টাদশ

পুরাণের মধ্যে দশটিতে শিবের, চারটিতে ব্রহ্মের, দুটিতে বিষ্ণুর এবং দুটিতে ভগবতীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এই পুরাণেরই সম্ভব কাণ্ডে পাওয়া যায় যে শিব লিঙ্গ স্কন্দ ব্রহ্মাণ্ড ভবিষ্য মার্কণ্ডেয় মৎস্য কূর্ম বরাহ ও বামন এই দশটি পুরাণে শিবের, বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবত গরুড় ও নারদ এই চারখানি পুরাণে বিষ্ণুর, ব্রহ্ম ও পদ্ম এই দুটি পুরাণে ব্রহ্মার, অগ্নি পুরাণে অগ্নির ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সূর্যের মহিমা প্রচারিত হয়েছে। শাস্ত্রকাররা এই অষ্টাদশ পুরাণকে প্রধানত সাত্ত্বিক তামসিক ও রাজসিক অথবা বৈষ্ণব শৈব ও ব্রাহ্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। বিষ্ণু নারদ শ্রীমদ্ভাগবত গরুড় পদ্ম ও বরাহ এই ছয়খানি পুরাণ সাত্ত্বিক বা বৈষ্ণব পুরাণ, শিব লিঙ্গ মৎস্য কূর্ম স্কন্দ ও অগ্নি এই ছয়খানি পুরাণ তামসিক বা শৈব পুরাণ এবং ব্রহ্ম বামন মার্কণ্ডেয় ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত ও ব্রহ্মাণ্ড এই ছয়খানি রাজসিক বা ব্রাহ্মপুরাণ। শেষ পুরাণগুলিতে ব্রহ্মের প্রাধান্য কীর্তিত হয়েছে। এই বিভাগেও মতান্তর দেখা যায়। শুধু মতের বিরোধ নয়, সাম্প্রদায়িক বিরোধ। বিভিন্ন পুরাণে এই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যে বিরোধ, পুরাণকাররা নিজেরাই তার কারণ বলেছেন। বিরোধ ভঞ্জনের জন্য বলেছেন যে কল্প ভেদে রচনা ভেদ হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার কারণ কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায়। এ দেশে প্রাচীন কাল থেকেই দেবতা অনেক ও তাদের প্রত্যেকের উপাসনা প্রচলিত আছে। ঋষিরাও নিজেদের মনোমত দেবতার উপাসনা করতেন এবং সেই দেবতাকে সকলের প্রিয় করবার জন্য নানা ভাবে তাঁদের মহিমা কীর্তন করতেন। পরবর্তী কালে পুরাণ রচনার সময়ে এই মনোভাবের জন্যই পুরাণে সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে।

পুরাণ বা মহাপুরাণের মতো উপপুরাণের কোন সঠিক সংজ্ঞা ও সংখ্যা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ মহাপুরাণ নিয়ে যে বিতর্ক আছে, তার জন্য একাধিক মহাপুরাণকে উপপুরাণের অন্তর্গত

করা হয়। যেমন শিব ও বায়ু পুরাণের মধ্যে একখানি মহাপুরাণ, অপরটি উপপুরাণ। শ্রীমদ্‌ভাগবত ও দেবীভাগবতের মধ্যেও একখা ন মহাপুরাণ ও অপরটি উপপুরাণ। অনেক পণ্ডিতের মতে মহাভারতও একখানি মহাপুরাণ। সে ক্ষেত্রে অষ্টাদশ সংখ্যাকে না বাড়াতে চাইলে মহাপুরাণ বলে স্বীকৃত একখানি পুরাণকে উপপুরাণের পর্যায়ে ফেলতে হবে। পুরাণ উপপুরাণের কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দিষ্ট হয় নি বলে লক্ষণ দিয়েও গ্রন্থ বিচার সম্ভব নয়। তবে সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে বেদব্যাসের পরবর্তী ঋষিরা পুরাণের লক্ষণযুক্ত একই বিষয়বস্তু নিয়ে যে সব ছোট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেগুলিই উপপুরাণ। এর সংখ্যাও অষ্টাদশ বলে মনে করা হলেও উপপুরাণ নামে প্রচলিত আরও অনেক গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। বেদব্যাসের নামে প্রচলিত উপপুরাণও আছে।

কূর্ম পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে সতেরো থেকে কুড়ি এই চারটি শ্লোকে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়। এই মত অনুসারে প্রথম সনৎকুমারোক্ত আদ্য, দ্বিতীয় নারসিংহ, তৃতীয় কুমারোক্ত স্কন্দ, চতুর্থ নন্দীশপ্রোক্ত শিবধর্ম, পঞ্চম দুর্বাসাঃ, ষষ্ঠ নারদীয়, সপ্তম কাপিল, অষ্টম বামন, নবম উশনাঃ, দশম ব্রহ্মাণ্ড, একাদশ বারুণ, দ্বাদশ কালিকা, ত্রয়োদশ মাহেশ্বর, চতুর্দশ শাম্ব, পঞ্চদশ সর্বার্থ সঞ্চায়ক সৌর, ষোড়শ পরাশরোক্ত, সপ্তদশ মারীচ এবং অষ্টাদশ ভার্গব।

এই নামগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকাতেও স্কন্দ, নারদীয়, বামন ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের নাম আছে। কূর্ম পুরাণের এই বচন উদ্ধৃত করবার সময় হেমাদ্রি বামনের বদলে মানব ও ভার্গবের বদলে ভাগবত বলেছেন। ভাগবত দুখানি— শ্রীমদ্‌ভাগবত বা বিষ্ণুভাগবত ও দেবীভাগবত। এদের মধ্যে একখানি মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের দাবীই সর্বাধিক। বিস্ময়ের বিষয় এই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ও দেবীভাগবতের স্কন্দ ও শ্লোক সংখ্যা সমান এবং দুটি গ্রন্থই বিরাট আকারের। হেমাদ্রি প্রভৃতি শা -

কারদের মতে কালিকা পুরাণ দেবীভাগবতেরই উপপুরাণ।—ইদং যৎ কালিকাখ্যন্তু মূলং ভাগবতন্তু তৎ। কালিকা পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যেরই বর্ণনা এবং এই কারণেই দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলা উচিত। এ কথা মানতে হলে মহাভারতের মতো শ্রীমদ্‌ভাগবতকে পুরাণ আখ্যা না দিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। এই ভাবে মহাপুরাণ বলে স্বীকার না করলে শিব বা বায়ু পুরাণের'মধ্যে যে কোন একখানি উপপুরাণের পর্যায়ে পড়বে। নারদীয় পুরাণ শিব পুরাণকে মহাপুরাণ বলেছেন। আর পণ্ডিতরা বলেছেন যে কল্পভেদে কখনও বায়ু পুরাণ কখনও শিব পুরাণ মহাপুবাণ এবং অপরটি উপপুরাণ।

পুরাণ ও উপপুরাণ নিয়ে মতের যে বিরোধ তার সমন্বয়ের চেষ্টাও হয়েছে। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একখানি যে ভাগবত পুরাণ তাতে কোন সংশয় নেই। সেকালে একখানি গ্রন্থই ভাগবত নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ প্রভাবের সময়ে এই গ্রন্থ বোধ হয় অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব পুনরুদ্ধারেব পরে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুখানি ভাগবত প্রচারিত হয়। বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীমদ্‌ভাগবত বা বিষ্ণুভাগবত প্রচার করেন এবং শাক্তরা প্রচার করেন দেবীভাগবত। মূল ভাগবত পুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে যোল হাজার শ্লোক ছিল বলে দুখানি গ্রন্থেই সমান সংখ্যক স্কন্ধ ও শ্লোক রচনা করা হয়েছে। উভয় গ্রন্থেই মূল ভাগবতের অনেক লক্ষণ বিদ্যমান। পার্থক্য এই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতে বৈষ্ণব দর্শনের প্রাধান্য এবং তন্ত্রানুসারী দেবীভাগবতে তন্ত্রের প্রভাব পরিস্ফুট।

এই সব বিতর্ক থেকেই বোঝা যাবে যে অনেক উপপুরাণ মর্যাদায় মহাপুরাণেরই মতো এবং কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর মর্যাদার দাবীও রাখে। কালের বিচারে উপপুরাণগুলি যে অর্বাচীন সে কথাও ঠিক নয়। অনেক উপপুরাণ অতি প্রাচীন কালে সংগৃহীত হয়েছিল এবং প্রাচীন গ্রন্থে তাদের উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দার শেষের দিকে ষড়্‌ গুরুশিষ্য তাঁর বেদার্থ দীপিকায় নৃসিংহ উপপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত

করেছেন। এরও পূর্বে অলবেরুণী নন্দা আদিত্য সোম শাম্ব ও নরসিংহ প্রভৃতি উপপুরাণের উল্লেখ করেছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের নবম থেকে বিংশ শ্লোকে পুরাণ ও উপপুরাণের দশটি লক্ষণের কথা আছে। এই লক্ষণ-গুলি সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, অংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয়। এই দশের মধ্যে পাঁচটি লক্ষণ থাকলেও পুরাণবিদরা তাকে পুরাণ বলে স্বীকার করেন। অনেক পুরাণে পাঁচটি লক্ষণও বলা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে পুরাণ ও উপপুরাণের কোন ভিন্ন লক্ষণ নেই। একই বিষয় নিয়ে লেখা গ্রন্থ মহাপুরাণ বলে স্বীকৃত না হলেই তা উপপুরাণ বলে মনে করা হবে।

মহাপুরাণের মতো উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ বলে মেনে নেওয়া হলেও কূর্ম পুরাণে উল্লিখিত অষ্টাদশ পুরাণের নাম অবিসম্বাদিত নয়। বিভিন্ন গ্রন্থে এই নামের তালিকা এক নয় এবং মিলিয়ে দেখলে আরও অনেক নাম পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও আরও অনেক উপপুরাণের নাম নানা গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণ উপপুরাণগুলির মধ্যে মহাপুরাণের মতো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কালিকা পুরাণ দেবীভাগবতেরই অংশ। ধর্ম পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, বশিষ্ঠ পুরাণ, আদিত্য পুরাণ, বায়বীয় পুরাণ, ভাস্কর প্রভৃতি পুরাণের নামও উল্লেখ-যোগ্য। কল্কি পুরাণ বেদব্যাসেব রচনা বলে মনে করা হয়। শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত উপপুরাণ ছাড়াও আরও অনেক উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়—'সৌর' 'গাণপত্য' ও 'সঙ্কীর্ণ' উপপুরাণ। সব মিলিয়ে উপপুরাণের সংখ্যা একশোরও বেশি হতে পারে।

পুরাণের মতো উপপুরাণগুলিতেও ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি ও সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান কথা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য এই উপপুরাণগুলি থেকেও

বহু বিশ্বস্ত তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। কাজেই তথ্যানুসন্ধানীর নিকটে এদের মূল্য পুরাণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

হিন্দু পুরাণের মতো বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণও আছে। বৌদ্ধরা তাদের নখানি পুরাণকে নবধর্ম বলে। জৈনদের চব্বিশজন তীর্থঙ্করের নামে এক একখানি পুরাণ আছে। তার মধ্যে আদি পদ্ম উত্তর ও অরিষ্টনৈমি এই চারখানি পুরাণ প্রধান।

পুরাণের দেবতত্ত্ব বা অবতারবাদ আলোচনা করতে হলে বেদে এই দুটি প্রসঙ্গের সম্বন্ধে একটা ধারণা করা দরকার। প্রাচীন আর্য সমাজে ব্রহ্মাই ছিলেন উপাস্য দেবতা। কিন্তু বিষ্ণু শিব ও শক্তির উল্লেখও বেদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। চারটি বেদেই বিষ্ণুর বহু মন্ত্র আছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণুও যে একজন প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে যখন বেদের ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদগুলি রচিত হয় তখন অন্যান্য দেবতার চেয়ে ব্রহ্মার উপসানাই প্রবল হয়ে ওঠে। চার বেদেই আমরা রুদ্রের নাম পাই। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয় সংহিতায় রুদ্রাধ্যায় আছে। তাতে রুদ্রের শত নামের মধ্যে শিব ও মহাদেব আছে। সূর্যও প্রধান দেবতা, সমস্ত বেদেই তাঁর স্তব আছে। দুর্গা বা শক্তির উপাসনাও যে প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রচিত পুরাণে এই বৈদিক দেবতারা সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছেন।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ব্রহ্মের উপাসনাই সবচেয়ে প্রাচীন, অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা পরে প্রচলিত হয়েছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি প্রধান দেবতাদের উপাসনাও প্রচলিত ছিল না বলে বৈদিক গ্রন্থে তার বর্ণনা নেই। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বৈদিক গ্রন্থে দেবতত্ত্বের যেরূপ আভাস, পুরাণে তাহাই সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া বিপুল আয়তন

লাভ করিয়াছে। ফলতঃ পূর্বতন দেবতা বিশেষের অনেকানেক উপাখ্যান পশ্চাৎ রূপান্তরিত ও পরিবর্ধিত করিয়া পৌরাণিক বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহা হিন্দু শাস্ত্রের বহুতর স্থলে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তজনেরা অন্যদীয় সুশোভন অলঙ্কার অপহরণ করিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের মনোমত সজ্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে উদোর পিণ্ড বুধোর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া হিন্দু ধর্মের অভিনব রূপ উৎপাদন করা হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র ক্রমশঃ কতই পরিবর্তিত ও কি বিপর্যস্তই হইয়াছে!'

এই অভিযোগ সর্বতোভাবে অস্বীকার করা যায় না। বৈদিক গ্রন্থে আমরা অনেকগুলি অবতারের নাম দেখতে পাই। ঋগ্বেদে বামন অবতারের কথা, শতপথ ব্রাহ্মণে বামন, মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ অবতারের কথা, তৈত্তিরায় আরণ্যকে কুর্ম অবতারের কথা, তৈত্তিরায় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বরাহ অবতারের কথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরশুরাম এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে কৃষ্ণের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব বৈদিক গ্রন্থে অবতার ব্রহ্মের, বিষ্ণুর নয়। বৈষ্ণব পুরাণকার এই সব অবতার বিষ্ণুর নামে প্রচার করেছেন অনেক পরবর্তী কালে। ঠিক একই ভাবে শৈব পুরাণকার ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে শিবের-নানা অবতারের কথা বলেছেন। সূর্যের অবতারের কথা বলা হয়েছে ভবিষ্য প্রভৃতি সৌর পুরাণে। শাক্ত পুরাণকার মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে দেবীর অবতারের কথা বর্ণনা করেছেন।

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মনে হবে যে বৈদিক গ্রন্থে এই অবতার-বাদ পৃথিবীর সভ্যতার বিবর্তন প্রকাশে সহায়তা করেছিল। পৃথিবী যখন জলমগ্ন ছিল, তখন মৎস্য ছিল ব্রহ্মের অবতার, পৃথিবী কদমাক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হলে জন্ম হয় কূর্মের, তারপর ক্রমে ক্রমে বরাহ, বামন ও মনুষ্যের। এই ভাবেই পূর্ণাবয়ব মানুষ পৃথিবীতে এসেছে।

পুরাণে যে প্রাচীন ভারতের একটা বিশ্বস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে কোন সংশয় নেই। অন্তত এ দেশে লিখিত ইতিহাসের পূর্বে যে সব রাজবংশ রাজত্ব করেছিল, তার পরিচয় শুধু পুরাণেই আছে। এ কথা বলেছিলেন এ দেশের পণ্ডিত ডি. আর. ভাণ্ডারকর এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যেও অনেকে এ কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক ভি এ. স্মিথ বলেছিলেন যে মৎস্য পুরাণের অন্ধ্র রাজবংশ ও রাজাদের রাজত্ব কাল ভুল নয়। এ বি কীথ পুরাণের ইতিহাস সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলেও এফ. ই পার্জিটার ও এল. ডি. বার্নেট মনে করেন যে বেদের চেয়ে পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। সব কথা হয়তো সত্য নয়, কিংবা কিছু অসঙ্গতিও হয়তো আছে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি যে মুখ্যত এ দেশের ঐতিহাসিক দলিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সূর্য বংশের ইক্ষ্বাকু অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। তাঁর এক পুত্র নিমি ছিলেন বিদেহের রাজা। এই সূর্য বংশেরই এক রাজা বৈশালীতে রাজত্ব করতেন, আর একজন গুজরাতে। সূর্য বংশের কন্যা ইলা ও চন্দ্র বংশের পুরূরবা প্রতিষ্ঠান বা এলাহাবাদে রাজত্ব করেন। পুরূরবার পুত্র অমাবসু কনৌজে রাজা হয়েছিলেন, আর কাশীর রাজা হয়েছিলেন তাঁর পৌত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। আধুনিক পণ্ডিতরা হিসাব করে দেখেছেন যে এই সব রাজকুলের আদি পুরুষ ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় দু হাজার বছর আগের মানুষ। অর্জুনের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অধিসীমকৃষ্ণের কথাও পুরাণে আছে। তারপরে ভবিষ্য রাজবংশের কথাও অনেক পুরাণে আছে। এই সব রাজাদের নাম আমাদের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন শিশুনাগ নন্দ মৌর্য শুঙ্গ কন্ব অন্ধ্র ও গুপ্তরাজাদের কথা। কী ভাবে এই সব নাম পুরাণে এসেছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। শক, হূণ, যবন আভীর প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী জাতির কথাও পুরাণে পাওয়া যায়। পুরাণে আছে বলেই এদের কথা ইতিহাস নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সৃষ্টি রহস্য ও প্রাচীন ইতিহাস ছাড়াও আরও অনেক রকমের কথা পুরাণে আছে। শুধু পূজাপদ্ধতি, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, দর্শন তত্ত্ব, তীর্থ-মাহাত্ম্য নয়, রাজধর্ম, যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যা আয়ুর্বিদ্যা ও পশু চিকিৎসা-সাহিত্য, ব্যাকরণ ছন্দপ্রকরণ প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়ও আছে। যুদ্ধের অস্ত্রাদি নির্মাণ, দুর্গ নির্মাণ, নগর ও গ্রাম পত্তনের কথাও আলোচিত হয়েছে। এই সব আলোচনায় তৎকালীন উৎকর্ষের পরিচয় জানা যায়। এক কথায়, এই সব পুরাণ প্রাচীন হিন্দু জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রায় বিশ্বস্ত ইতিহাস। শ্রদ্ধা সহকারে এই পুরাণগুলি পাঠ না করলে ভারতবাসী তার প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা অবহিত হতে পারবে না। ইদানীং দুষ্প্রাপ্য বলেই পুরাণ তার মূল্য হারিয়েছে, কিন্তু তাই বলে তার সত্য মূল্য বিন্দুমাত্র কমে নি। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো পুরাণও ভারতের অমূল্য রত্ন।

শিব মাহাত্ম্য প্রকাশক

সৌর পুরাণ

সারানুবাদ

শিবের মহিমা বর্ণনা

যাঁর আজ্ঞায় ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং রুদ্র সংহারকর্তা, সেই পিনাকপাণিকে নমস্কার।

উত্তম তীর্থ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি শিবভক্ত ঋষিরা যখন দীর্ঘ-সূত্রে ব্যাপৃত আছেন, তখন পৌরাণিক শ্রেষ্ঠ সূত তাঁদের দর্শনের জন্য এসে উপস্থিত হলেন। নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মারা রোমহর্ষণকে দেখে আনন্দিত হয়ে বললেন, আদিত্য যে সৌর পুরাণ কীর্তন করেছেন, তা আমাদের বলুন। এই সৌর পুরাণ শিব ভক্তিতে পূর্ণ। শিব ভক্তি ব্যতীত যজ্ঞ তপস্যা দান এবং ব্রত কোন প্রকারেই মুক্তি হয় না, এই কথা আমরা শুনেছি। আপনি তো কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকটে এ সমস্তই শুনেছেন। আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরাণ বক্তা আর নেই। তাই আপনার কাছে সব শুনতে আমাদের শ্রদ্ধা জন্মেছে।

সূত বললেন, আমি ঋক যজুঃ সাম রূপী ত্রিসত্য ত্রিজগৎকারণ ত্রিমার্গ ত্রিতত্ত্বগ পরম তেজস্বরূপ সূর্যকে প্রণাম করে শিব কথাশ্রিত সৌর পুরাণ বলছি। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি শ্রদ্ধা সহকারে এই পুরাণের দু'একটি শ্লোক পাঠ করে তবে সে সূর্যলোকে যেতে পারে। যাঁরা এই পুরাণ আশ্রয় করে জীবন যাপন করেন, তাঁরা সূর্যমণ্ডল ভেদ করে সূর্যের সাযুজ্য লাভ করে থাকেন। যে পুরাণের বক্তা সূর্য ও শ্রোতা তাঁর পুত্র মনু এবং যাতে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত, সেই সৌর পুরাণের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু নেই।

বর্তমানে মনুরই অধিকার চলছে। তিনি কোন সময়ে কামিকারণ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে রাজা প্রতর্দনের যজ্ঞে মহর্ষিরা তত্ত্ববিচার করছিলেন। কিন্তু ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হলেন না। ব্রাহ্মণেরা যখন মায়ামোহিত ও সংশয়াকূল, তখন দৈববাণী হল, তপস্যা কর, তপস্যাই জ্ঞানের সম্পাদক এবং তপস্যা দিয়েই সব পাওয়া যায়। এই দৈববাণী শুনে ভৃগু প্রভৃতি নিষ্পাপ মুনিরা মনুকে নিয়ে আদিত্য ক্ষেত্রে গেলেন। সেই ক্ষেত্র দ্বাদশ আদিত্য নামে খ্যাত এবং সূর্য সেখানে সতত সন্নিহিত। মুনিরা তত্ত্বদর্শনের অভিলাষী হয়ে ঘোর তপস্যা করতে লাগলেন। সহস্র বৎসর পর সূর্য মনুর সামনে এসে বললেন, এই মহর্ষিরা কেন তপস্যা করছেন ? আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি যা চাও আমি তাই দেব। এই মুনিরা আমাকে বিশ্বের অন্তর্যামী পরম দেবতা রূপে দেখুন।

সূত বললেন, সূর্যকে সম্মুখে দেখে মনু কৃতার্থ বোধ করলেন। তিনি মুনিদের সঙ্গে সংযত চিত্তে সূর্যের স্তব করে জিজ্ঞাসা করলেন, বেদান্তে কোন্ শ্রেয়স্কর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে ? এই বিশ্ব কোথা থেকে উৎপন্ন হল এবং কোথায় লয় পাবে ? ব্রহ্মাদি দেবতারা কার বশবর্তী ? তিনি এক বা অনেক অথবা এক অনেক উভয়ই ? কী ভাবে তাঁকে অবগত হওয়া যায় ? তাঁকে জানতে পারলে কী রকম অবস্থা হয় এবং তাঁর স্বরূপই বা কী ? তাঁর চরিত্র কী রকম এবং কোন্ তীর্থে তিনি অধিষ্ঠিত ? তাঁর তীর্থবাসী কার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হয় ? আপনি আমাদের পুরাণ লক্ষণ, ব্রতক্রম, বর্ণাশ্রম আচার, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত বিধি —এ সবও বলুন।

সূর্য বললেন, পুত্র, সর্ব বেদার্থ-সংগ্রহাশ্রয় এই পুরাণে যে তত্ত্বকথা আছে তা শোন। শূলপাণি ঈশ্বরের যা স্বরূপ তাই তত্ত্ব। তিনিই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে আছেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, শ্রুতিতে এই কথা আছে। তিনিই সমস্ত প্রাণীর আত্মা। উমার

সঙ্গে ভগবান মহাদেব চৈতন্যরূপী। দেবদেব মহেশ্বর অদ্বিতীয় শিব। এক মাত্র হয়েও তিনি লীলাবশে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি নানা রূপে বিরাজ করছেন। ব্রহ্মাদি দেবতারা শিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে দেব, আপনি কে? এর উত্তরে শিব বলেছিলেন, একমাত্র আমিই আছি এবং আর কেউ নেই, এই হল বেদবাক্য। আদি সৃষ্টিতে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু লীলাদেহধারী আত্মস্বরূপ মহাদেব থেকেই উদ্ভূত হন। তত্ত্ববিদরা সেই আদিকর্তা পরমাত্মা অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই বহুবিধ রূপে নির্দেশ করেন। 'ইন্দ্রং মিত্রং' প্রভৃতি বেদ মন্ত্রেও এই কথা আছে। তাঁর চেয়ে বড় কিছু নেই, ছোটও কিছু নেই। সেই পরমাত্মা শঙ্করই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করে আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আর সব কিছু পরিত্যাগ করে সেই নিরঞ্জন শিবকেই সতত ধ্যান করবে। তাতেই জীবন্মুক্ত হয়ে নির্বাণ মুক্তি লাভ করবে। শিব ভক্তিই জগতে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ লাভের পরম কারণ। অন্য কিছু যে নয়, তা নিশ্চিত। ত্রিলোকে সুখের কামনা যার আছে, সে সদা শিবের পূজা করবে। শিব ভক্তি ছাড়া সুখলাভ কী করে হবে! বিদ্যা ধন যশ জয় শত্রুক্ষয়--এ সবই যে শিব ভক্তিতেই লাভ হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেদবাক্য আছে যে রোগক্ষয় রোগাভাব ও সমস্ত কাম্য বস্তুই শিব ভক্তির বলে পাওয়া যায়। বিধাতা যখন কপালে সুখলাভ লেখেন, তখনই লোকের মনে শিবভক্তি আসে। তা না হলে নয়।

মহেশ্বরের কর্তব্য অকর্তব্য নেই, বন্ধন বা মুক্তি নেই। তিনি আনন্দরূপা গৌরীর সঙ্গে নিত্য ক্রীড়া করেন। অবিকারী শৈবজ্যোতি অব্যয়, সর্বোৎকৃষ্ট ও আকাশের মতো। যে ব্রাহ্মণ তা জানেন না, বেদ তাঁর কাছে নিষ্ফল। স্বয়ংপ্রকাশ নিরঞ্জন রুদ্রই একমাত্র জ্ঞেয়। আর কিছু জানবার নেই। বেদবাদীরা বলেছেন, তাঁকে জানতে পারলেই সব জানা হয়। আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা তাঁর দর্শনের জন্য বিবিধ উপায়ে দিন যাপন করি। তপস্যা দান বা যজ্ঞ করে

শিবকে অবগত হওয়া যায় না। তদ্গত ভক্তি দিয়েই শুধু তাঁকে জানা যায়। গিরীন্দ্রনন্দিনী শিবা তাঁর জ্ঞানময়ী অব্যয় শক্তি। তাঁরই সহযোগে মহাদেব সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করে থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁদের ভেদের কথা বলেন। বাস্তবে কোনই ভেদ নেই। বহ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মতো শিব ও শিবার অভেদও প্রসিদ্ধ। সেই অক্ষয় অব্যয় পরমা শক্তি গিরিজা মায়া এবং রুদ্র মায়া বিশ্বাত্মক, এ কথা জানলেই মুক্তি লাভ হয়। নিজের আত্মায় অবস্থিত বিশ্বব্যাপী এই ঈশ্বরকে ভক্তিযোগে অবগত হলেই বন্ধন মুক্তি হয়। তাঁর দীপ্তিতেই সব উদ্দীপ্ত, অন্য কোন প্রভায় তা উদ্দীপ্ত হয় না। তাঁর প্রকাশ হলে অগ্নির প্রভাও থাকে না। সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা রূপী ক্ষর ও অক্ষরাত্মক, দুর্জ্ঞেয়, জগন্নাথ মহেশ্বরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাসিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের এই বস্তু সত্তা নেই। এই জগৎ যে মহেশ্বরেই ওতপ্রোত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁকে জানতে পারলেই অখিল বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা মুনি ও মনুরা সেই দেবদেব শূলপাণির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তিনি এক, কদাচ দুই বা বহু নন। বিশ্ব তাঁর নিয়ম তন্ত্রে অবস্থিত।

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে বিরূপাক্ষ মহাদেব সৃষ্টির জন্য লীলাবশে তাঁর দক্ষিণাঙ্গ থেকে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই প্রথম জাতককে বেদ পুরাণ দিয়েছিলেন। সত্ত্ব বহুল সনাতন বাসুদেবকে তিনি জগৎ পালনের জন্য বামাঙ্গ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যোগীদের ধ্যেয় জগৎ সংহারকারক নির্গুণ কালরুদ্রকে তিনি হৃদয় থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই বিশ্ব শিব থেকেই সম্ভূত, শিবেই স্থিত এবং শিবেই তা লীন হবে। শিবেরই লীলা বশে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়ে থাকে। তিনিই সর্ব প্রাণীর আত্মা। ভক্তিযুক্ত জ্ঞানেই তাঁকে জানতে হয়। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন দেবতা আমি দেখি না। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বেদেও এই কথা আছে।

বেদগণ বললেন, নিষ্কাম জ্ঞানী যোগীরা ইন্দ্রিয় সংযম করে যাঁকে দেখতে পান, সেই মহেশ্বরই আত্মা। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা যাঁর কিঙ্কর, যাঁর প্রসাদে সবাই জীবিত থাকে, সেই দেবতাই পার্বতীকান্ত। ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁর প্রকৃত ভাব জানতে অসমর্থ এবং আমরা আজও যাঁকে জানতে পারি নি, সেই দেবতাই ত্রিপুরান্তক। সমস্ত দেবতারা আমাদের এই পরম সত্য কথা শুনুন—মহাদেব রুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন দেবতা নেই। কূর্মের রোম, শশকের শৃঙ্গ ও আকাশ কুসুম যেমন অলীক, তেমনি শিবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতাও অলীক। মহেশ্বরই সর্ব ভূতের জনক। কেশের অগ্রভাগের মতো সূক্ষ্ম আকারে হৃৎপদ্মে স্থিত উমাপতিকে যে জ্ঞানী দেখতে পান, তাঁর অক্ষয় শান্তি লাভ হয়, যে প্রভু পৃথিবীতে অবস্থিত অথচ পৃথিবী তাঁকে অবগত নয়, পৃথিবী যাঁর মূর্তিভেদ, সেই ভূমিরূপী শিবকে প্রণাম। যিনি জলে অবস্থিত অথচ জল তাঁকে অবগত নয়, জল যাঁর স্বরূপ, সেই জলময় শরীর শিবকে নমস্কার। যে অমেয়াত্মা অগ্নিতে অবস্থিত অথচ অগ্নি তাঁকে কদাচ জানেন না, অগ্নি যাঁর স্বরূপ, সেই বৈশ্বানরাত্মা শিবকে নমস্কার। যিনি বায়ুতে সতত বিরাজ করেন, অথচ বায়ু তাঁকে জানেন না, বায়ু যাঁর স্বরূপ, সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি সর্বদা আকাশে অবস্থিত অথচ আকাশ তাঁকে জানে না, আকাশ যাঁর স্বরূপ, সেই আকাশাত্মাকে নমস্কার। যে দেব সূর্যে অবস্থিত অথচ সূর্য তাঁকে জানতে পারেন না, সূর্য যাঁর স্বরূপ, সেই সূর্যরূপী শিবকে নমস্কার। যে প্রভু শঙ্কর চন্দ্রে অবস্থিত অথচ চন্দ্র তাঁকে জানতে পারেন না, চন্দ্র যাঁর রূপ বিশেষ, সেই চন্দ্রাত্মা শিবকে নমস্কার। যিনি যজমানে অবস্থিত অথচ যজমান কখনই তাঁকে জানে না, যজমান যাঁর স্বরূপ, সেই যজমান মূর্তি শিবকে নমস্কার। হে বৃষধ্বজ, আমরা আপনা হতেই উদ্ভূত হয়ে আপনারই প্রসাদে প্রমাণ পদ পেয়েছি এবং পরিণামে আপনাতেই বিলীন হয়ে থাকব।

সূর্য বললেন, বেদগণের এই স্তব শুনে পার্বতীকান্ত তাঁদের প্রত্যক্ষগোচর হলেন। কোটিসূর্যসঙ্কাশ, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ, সহস্র মস্তক, সোমসূর্য বহ্নি-নেত্র, স্থূল হতে স্থূলতর, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, স্থূল-সূক্ষ্ম দেবাদেব মহেশ্বর বেদগণকে বললেন, আমার প্রসাদে তোমরা সর্বলোক পূজিত হবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠরা তোমাদের আশ্রয় করেই ধর্ম করবেন, অন্য ভাবে তাঁদের কর্ম হবে না। তোমাদের অতিক্রম বা অবজ্ঞা করে কোন কর্ম করলে তা নিষ্ফল হবে। নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম এবং মুক্তির উপযোগী যা কিছু আছে, সে সমস্তই তোমাদের বাক্য—এইরূপ বিবেচক ধীর ব্যক্তি দুঃখপীড়িত হন না। তোমাদের অতিক্রম করে যারা শাস্ত্র প্রণয়ন করে, তারা চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্যন্ত নরক ভোগ করে। ত্রিলোকে বেদ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছু নেই, এ বিষয়ে সংশয়াভাব, তোমাদের আমি এই বর দিলাম। যে দ্বিজরা তোমাদের এই স্তব পাঠ করবে, আমার প্রসাদে তাদের বেদাধ্যয়নের পুণ্য হবে। পার্বতীনাথ বেদগণকে এই বর দিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

সুদ্যুম্নের আখ্যান

সূর্য বললেন, যদি পরম পদ পেতে চাও তো এই যে ঐশ্বরিক তেজ প্রতিভাত হচ্ছে তারই শরণ নাও। এ তমোতীত, চিন্মাত্র ও সর্ব-ভূতস্থ ; এ অক্ষয়, অব্যয়, নির্গুণ, শুদ্ধ ও পরম আনন্দ স্বরূপ ; এ সর্ব ভূতেরই প্রত্যক্ষ গোচর। বিশ্বমায়া বিধাতা ছত্রিশ প্রকারে অবস্থিত, ভক্তিগ্রাহ্য মহাদেব আত্মাতেই বর্তমান বলে জানবে। যোগীদের ধ্যেয় আত্মভূত সনাতন মহাদেবের প্রতি পরম ভক্তি অর্পণ করে নির্বাণ লাভ কর। যারা বহু সহস্র জন্মে বহুবিধ তীর্থ যাত্রা ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছে, তাদেরই শিব ভক্তি হয়। লেশ মাত্র এই ভক্তিতে অক্ষয় পরম ধর্ম হয়। বেদবাদীরা বলেন যে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নেই। যজ্ঞ তীর্থ জপ ও দান এর জন্য যে ধর্ম, তার সাধন অনেক, তার আয়োজনও দুঃসাধ্য। কিন্তু শিবধর্ম সাধনার

অপেক্ষা করে না। বহু সহস্র জন্মে অর্জিত মেরুপ্রমাণ পাপও অমিততেজ শিবের প্রতি ভক্তিতে ভস্মসাৎ হয়। সর্বদা পাপানুষ্ঠান করেও একবার মাত্র শিবপূজা করলেই সে আর পাপলিপ্ত হয় না, সে শিবপদই লাভ করে। পাপরত লোকও যদি শিবকে স্মরণ করে তো তাকে মহাত্মা বলে জানবে, এ আমি সত্য বলছি। অজ্ঞানতা-বশতও যে শিবের নামকীর্তন করে, শিব তাকেও মুক্তি দান করেন। এর চেয়ে বড় আর কী আছে!

এই সম্বন্ধে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মা যে পাপপ্রণাশিনী কথা বলেছিলেন, তা বলছি, শ্রদ্ধা সহকারে শোন। আদি সত্য যুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক পরম ধার্মিক সপ্ত দ্বীপের রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র সুদ্যুম্ন স্বর্গের ইন্দ্রের মতো ঐশ্বর্যশালী হয়ে মনোহর গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠানপুর নামে রমণীয় স্থানে বিরাজ করছিলেন। তিনি যখন পৃথিবী পালন করছেন, তখন একদিন তৃণবিন্দু নামে এক মহামুনি তাঁকে দর্শন করবার জন্য সেখানে এলেন। রাজা শিবের পূজা করছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে পূজা সমাধা করে উঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে আসন দিলেন এবং মধুপর্কাদি দিয়ে বললেন, আমি ধন্য ও কৃতার্থ হলাম। আপনি আমার কাছে এসেছেন বলে আমার জীবন সার্থক হল। আপনি কেন এসেছেন, বলতে আজ্ঞা হয়। এখানে আপনার দুর্লভ কিছু নেই।

সূর্য বললেন, সুদ্যুম্নের কথা শুনে শিবভক্তির অমৃত আস্বাদে আনন্দিত মুনি তৃণবিন্দু বললেন, তুমি যা বললে তাতে সংশয় নেই। আমি তোমার জন্ম গৌরব শোনবার অভিলাষ নিয়ে এসেছি। সেই কথা শোনবারই আমার কৌতূহল, তুমি তাই বল।

সুদ্যুম্ন বললেন, অতীত জন্মে আমি গোমতী তটে দেবতা ও প্রাণী-বিদ্বেষী ব্যাধ ছিলাম। আমার নাম ছিল সুব্যাড়ি এবং আমি ব্যাধদের অধিপতি ছিলাম। আমার লেশমাত্র ধর্ম জ্ঞান ছিল না এবং আমি পাপ কর্মেই লিপ্ত ছিলাম। আমি পথে বহু লোকের

প্রাণ নাশ করেছিলাম এবং এত পরস্বাপহরণ করেছিলাম যে আমার সেই পাপ যমপর্বতোপম হয়েছিল। এই ভাবে বহুকাল অতীত হবার পর আমার মৃত্যু হল এবং কিঙ্করেরা আমাকে যমপুরে নিয়ে গেল। ধর্মরাজ আমাকে দেখে বিচারক চিত্রগুপ্তকে বললেন, সুব্রত, এ কি লেশমাত্র ধর্ম করে নি? চিত্রগুপ্ত বললেন, এ যত পুণ্য করেছে তা বলতে আমি অক্ষম, একমাত্র মহেশ্বরই তা জানেন। তবে এ পুণ্য কাজ করছি এ কথা জেনে পুণ্য করে নি। এ 'আহর' 'প্রহর' অর্থাৎ 'আহরণ কর' 'প্রহার কর' এই রকম উক্তিতে হর বা শিবের নাম করেছে এবং সেই পুণ্যে এর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়েছে। এর আর কোন পাপ নেই, এই আমার সিদ্ধান্ত।

সুদ্যুম্ন বললেন, ধীমান চিত্রগুপ্তের এই কথা শুনে ধর্মরাজ বিধি মতো আমার পূজা করলেন। এমন সময়ে দেবদূতেরা সেখানে অযুত সূর্য সঙ্কাশ, দিব্য স্ত্রী বিরাজিত, সর্ব কামনাপূরক বিমান আনয়ন করল। ধর্মরাজের নিকটে বিদায় নিয়ে আমি তাতে আরোহণ করে অমরাবতীতে গেলাম। সেখানে অযুত যুগ মহাভোগ্য ভোগ করে ব্রহ্মলোকে গেলাম। ব্রহ্মা আমার পূজা করলেন। সেখানে আমি এক কল্প যথেচ্ছ ভোগ করে কর্মশেষ ভোগের জন্য এই ভূমণ্ডলে এসে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশে জন্মেছি। শিবের প্রসাদে আমি পূর্ব জন্মের বিবরণ বিস্মৃত হই নি। পরমাত্মা মহেশ্বরের এই রকমই মাহাত্ম্য। তাঁর নাম অজ্ঞানে উচ্চারণ করেই এই ফল লাভ হয়েছে। মুনিরা বলেছেন যে অমিত তেজ শিবের নাম যে স্বজ্ঞানে উচ্চারণ করে, মুক্তি তার করতলগত হয়।

সূর্য বললেন, তৃণবিন্দু মুনি সুদ্যুম্নের এই পূর্ব জন্মের কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি রাজা সুদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করে বললেন, রাজা, আমি নিজের আশ্রমে যাই। এই বলে প্রস্থান করলেন। মনু, আমি তোমাকে মহাত্মা সুদ্যুম্নের চরিত বললাম। যে ভক্তি ভরে এই কথা পাঠ করে, তার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

বেদব্যাসের বারাণসী দর্শন

মনু বললেন, তৃণবিন্দু মুনি রাজার নিকট থেকে গিয়ে কী করলেন এবং কোথায় তাঁর আশ্রম, সেই কথা বলুন।

সূর্য বললেন, নর্মদার তীরে মুনি সিদ্ধ সেবিত তৃণবিন্দুর আশ্রম জালেশ্বর নামে বিখ্যাত। শিবের ভক্ত মুনি সেখানে গিয়ে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন, তারপর তীর্থ যাত্রায় বেরোলেন।

মনু বললেন, কোন্ কোন্ গুপ্ত তীর্থে শিব সন্নিহিত আছেন, সেই সব তীর্থ ও তীর্থান্তরের তত্ত্ব আমাকে বলুন।

সূর্য বললেন, তীর্থ ও ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বোত্তম বারাণসী শিবের প্রিয় নগরী। সেখানে সর্বেশ্বর দেবতা সমস্ত প্রাণীকেই সংসার থেকে মুক্তির জন্য তারক জ্ঞান প্রদান করছেন। সেখানে ব্রহ্মময়ী গঙ্গামূর্তি দর্শন স্পর্শ ও নমস্কারে সমস্ত পাপ হরণ করেন এবং তাঁর মণিকর্ণিকা তীর্থ ই বিশ্বেশ্বরের প্রিয়। সেই তীর্থে স্নান করে বিশ্বেশ্বর দর্শন করলে পাতকী বা অপাতকী দুইই মুক্তি লাভ করবে। ব্রহ্মনন্দন অমিততেজা সনৎকুমার ব্যাসের নিকটে বিশ্বেশ্বরের যে মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, আমি তা বলছি। সনৎকুমার হিমালয় পর্বতের যেখানে অবস্থান করেন, সে জায়গা নানা দেবতায় আকীর্ণ, যক্ষ-গন্ধর্ব সেবিত, সিদ্ধ চারণ কুষ্মাণ্ড ও অপ্সরা পরিবৃত। সুবর্ণ পদ্ম ও নানাবিধ পুষ্প-শোভিত দুঃখহারিণী মন্দাকিনী গঙ্গা সেখানে বিরাজ করছেন। মহামুনি পরাশর নন্দন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঘোর কলিযুগে শ্রেয়স্কর কী তা জানবার জন্য তাঁর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর নিকটে উপবেশন করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, পুণ্য মার্গ থেকে বহিষ্কৃত পাষণ্ডাচারে রত ম্লেচ্ছ ও অন্ধজনে পূর্ণ ঘোর কলিযুগ এখন উপস্থিত। এই যুগে লোকে অধার্মিক, ক্রূরচিত্ত অনাচারা ও অল্পমেধা হবে এবং ব্রাহ্মণেরা হবে শূদ্রের যাজক। তারা স্নান দান হোম দেবতার পূজা পিতৃতর্পণ ও স্বাধ্যায় পালন করবে না। ব্রাহ্মণাধমেরা আর আগের মতো ধর্মের জন্য বেদ পাঠ করবে না, বেদ পাঠ করবে প্রতিগ্রহের

জন্য দ্বিজেরা পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে শিবনিন্দা পরায়ণ হবে। কিন্তু মাধব তাদের ত্রাতা নন। কলিযুগের সম্পূর্ণ অধিকারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চার বর্ণই নিজেদের বৃত্তি ত্যাগ করে পরের বৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করবে। তাদের পাপিষ্ঠ দেখে রাজারাও অবিচারক ও বৃথা জাতের অভিমানী হবে। উচ্চাসনে আসীন অল্পবুদ্ধি শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের দেখেও নড়বে না। কলিযুগে কাষায়ী, নির্গ্রন্থ, নগ্ন, কাপালিক, বৌদ্ধ, বৈশেষিক ও জৈন সম্প্রদায় হবে। দ্বিজাধমরা তপস্যা ও যজ্ঞের ফল বিক্রয় করবে, শত সহস্র যতি হবে। তারা সংসারের মোচন কর্তা পরমদেব মহাদেবের ও শিব ভক্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণদের নিন্দা করবে। দুরাত্মা রাজভৃত্যেরা ব্রাহ্মণদেরও তাড়না করবে। রাজা তা দেখেও তাদের নিবারণ করবেন না। এই ঘোর কলিযুগে এমন শ্রেয়স্কর কর্ম কী আছে যা দিয়ে সংসার মুক্ত হওয়া যায়, আপনি আমাকে তাই বলুন।

সনৎকুমার বললেন, ব্যাস, তুমি বারাণসীতে যাও। সেখানে বিশ্বেশ্বর শিব বিরাজ করছেন বলে যুগধর্ম নেই এবং পৃথিবীর সম্পর্ক নেই। বিশ্বেশ্বরের যে লিঙ্গ, তার নাম জ্যোতির্লিঙ্গ। তা দর্শন করলে জীবকে আর সংসারে প্রবেশ করতে হয় না, তুমি সেখানে গিয়ে তা দর্শন কর। তোমার দেবদুর্লভ মোক্ষ লাভ হবে। গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে পরাৎপর বিশ্বেশ্বরকে দর্শন কর। তোমার মুক্তির জন্য তিনিই তোমাকে জ্ঞান দান করবেন। মুনিরাও সেখানে তোমাকে দেখবার জন্য আসবেন এবং তোমাকেই বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করবেন। আমার আদেশে তুমি তাঁদের শৈব জ্ঞান উপদেশ দিও।

শৈবশ্রেষ্ঠ সত্যবতীনন্দন ব্যাস নিজের গুরু সনৎকুমারের নিকটে বিশ্বেশ্বরের এই মাহাত্ম্য শুনে ব্রহ্মাদি সেবিত রুদ্রকে প্রণাম করে শিষ্য সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রা করলেন।

মনু বললেন, সিদ্ধ মুনিজন সেবিত বারাণসীতে এসে ব্যাস কী করলেন, আমাকে তা বলুন।

সূর্য বললেন, ধর্মাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কাশীতে এসে গঙ্গাস্নান করে দেবতা ও পিতৃ তর্পণের পর বিশ্বেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের জন্য গেলেন। তিনি তাঁর পূজা করে দণ্ডবৎ প্রণামের পর দক্ষিণ দিকে উপবেশন করে তাঁর দিকে চেয়ে শতরুদ্রিয় জপ করতে লাগলেন। ক্ষণকাল মধ্যে লিঙ্গ থেকে নিরঞ্জন পরম জ্যোতি আবির্ভূত হল। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম, পরমানন্দ স্বরূপ, আদি-মধ্য-অন্ত-বিরহিত, কোটি-সূর্য-সমপ্রভ, তমের অতীত ও বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত সেই মাহেশ্বর জোতি দেখে ধীমান পরাশরনন্দনের মাহেশ্বর জ্ঞান উদ্ভূত হল। তিনি অদ্বয় নির্গুণ শান্ত দুঃখত্রয় বিবর্জিত হয়ে জীবন্মুক্ত হয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করলেন। ভাবলেন, কেন লোকে এই বিশ্বেশ্বরেব সেবা করে না! এঁকে দেখা মাত্রই আমার নির্মল জ্ঞানের উদয় হয়েছে। হে বিশ্বেশ্বর, আমার মতো লোক কি তোমাকে যথার্থ রূপে জানতে পারে!

সূর্য বললেন, তারপর সেই জ্যোতির মধ্যে শূলপাণি বৃষধ্বজ আবির্ভূত হলেন, তিনি শুভ বাক্যে বেদব্যাসকে বললেন, যে বরে তোমার রুচি, তাই প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে সেই বরই দেব।

বেদব্যাস বললেন, তোমার দর্শনেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। যে জ্ঞান দেবদুর্লভ, তা আমার হয়েছে। তুমি পরাৎপর ভগবান। তোমার প্রতি ভক্তি আমার অবিচলিত হোক, এ ছাড়া অন্য বর আমি চাই না।

সূর্য বললেন, বেদব্যাসকে তথাস্তু বলে দেবদেব ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্হিত হলেন। বেদব্যাসের চেয়ে বড় শিবভক্ত ত্রিলোকে আর নেই। এমনকি দেবকীনন্দন কৃষ্ণ বা মহামতি অর্জুনও নন। শিবের বর পাবার পর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বারাণসীর অন্যান্য লিঙ্গ দর্শনের জন্য গমন করলেন।

ঋষিরা বললেন, সূত, বেদব্যাস আর কোন্ কোন্ দিব্য লিঙ্গ দর্শন করতে গেলেন, তা আমাদের বলুন।

সূত বললেন, সূর্য মনুকে যা বলেছিলেন, আমি তাই আপনাদের

বলছি, শুনুন। অবিমুক্তেশ্বরের অগ্নিকোণে ত্রিলোক বিখ্যাত বাপী। বিশ্বেশ্বর শিব সেখানে নিত্য সন্নিহিত। সেখানে স্নান দেবতাদেরও দুর্লভ। ভক্তি ভরে যাঁরা সেই বাপীর জল পান করেন, ভূতলে তাঁরাই সাক্ষাৎ শিব। তাঁদের হৃদয়ে লিঙ্গত্রয়ের আবির্ভাব হয়। তাই সেই জল দুর্লভ এবং মুদ্রিত অবস্থায় বর্তমান। সত্যবতীনন্দন সেই বাপীতে যথাবিধি স্নান করে অবিমুক্তেশ্বর দর্শনের পর লাঙ্গলীশ ক্ষেত্রে গমন করলেন। ব্রহ্মাদি দেবতারা সেখানে শিবের সেবা করে থাকেন। তাঁর দর্শন মাত্রই পাশুপত জ্ঞান লাভ হয়। তারপর তিনি তারকেশ্বর দর্শনের জন্য গমন করলেন। শিব সেখানে অন্তকাল তারক-জ্ঞান দান করেন। বেদব্যাস সেখানে উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করলেন। যাঁর দর্শন মাত্র ব্রহ্ম হত্যার পাপ বিনষ্ট হয়, সেই পরম লিঙ্গ দর্শনের পর তিনি সর্বসিদ্ধিদাতা শুক্রেশ্বর দর্শনের জন্য গেলেন। অমিততেজা শুক্র সেখানে শিবের নিকটে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেছিলেন। শুক্রেশ্বর শিবের অগ্নিকোণে একটি শোভন কূপ আছে। তাতে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। মুনি সেই কূপে স্নান করে শুক্রেশ্বর শিবের দর্শনের পর ব্রহ্মেশ্বর দর্শনে গেলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা সেখানে পার্বতী পতির প্রীতির জন্য ঘোরতর তপস্যা করে ব্রহ্মপদ লাভ করে-ছিলেন এবং অন্যান্য মহর্ষিরাও যোগ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সেই লিঙ্গের দর্শনে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সেখান থেকে ব্যাস অব্যয় ওঙ্কারেশ্বর ক্ষেত্রে গেলেন। ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গের স্মরণ মাত্রেই সমস্ত পাপ মুক্ত হওয়া যায়। সেখানে পশুপাশ বিমোচক সূক্ষ্মরূপী মহেশ্বর লোকানুগ্রহের জন্য বিরাজ করেন। সিদ্ধ পাশুপতরা সেখানে এঁর পূজা করেই সিদ্ধিলাভ করেছেন। সেই লিঙ্গের নিকটে কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশীতে উপবাসী থেকে রাত্রি জাগরণ করলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়। তারপর তিনি ব্রহ্মাদি দেবতা ও শংসিতাত্মা রুদ্রজপ নিরত মুনিরা যেখানে মহাদেবের উপাসনা করেন, সেই কৃত্তিবাসেশ্বর ক্ষেত্রে গেলেন। এই লিঙ্গে বহু দ্বিজ লীন হয়েছেন। এর পূর্ব দিকে হংস তীর্থ নামে

মহা সরোবর আছে। তাতে স্নান করে যে মহাত্মারা শিব দর্শন করেন, তাঁরা ব্রহ্মাদি দেবগণ বন্দিত হন। একবার তাঁর দর্শন হলে সংসারে আর আসতে হয় না। তিনি নিশ্চয়ই রুদ্র। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন হংস তীর্থে স্নান করে ভক্তি সহকারে কৃত্তিবাসেশ্বর শিবের পূজা করলেন। তার পর রত্নেশ্বর লিঙ্গ দর্শনের জন্য মুক্তি স্থান রত্নেশ্বর ক্ষেত্রে গেলেন। সেই লিঙ্গ দর্শনের ফল বলা যায় না। বেদবিদরা যে যোগকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সেবা করেন, বারো বৎসরে সেই যোগ সম্পূর্ণ রূপে করলে অথবা এই রত্নেশ্বর ক্ষেত্রে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করলে মানুষ শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। মহামুনি রত্নেশ্বরের পূজা করে বৃদ্ধকালেশ্বর দর্শনে গেলেন। লোকানুগ্রহের জন্য বিশ্বপালক মহাদেব সেই লিঙ্গে উমার সঙ্গে লীলার বশে সতত বিরাজ করেন। তাই এই লিঙ্গ দর্শনে পৃথিবীর সমস্ত দিব্য লিঙ্গ দর্শনের পুণ্য যে হবে, তাতে সংশয় নেই। এর পূর্ব দিকে এক মুনিজন সেবিত কূপ আছে। দেবদেব শম্ভু পবিত্র জলে তা পূর্ণ করেন। তা থেকে তিন চুমুক জল পান করলেই সংসারী লোকের প্রকৃতি পাশ বিচ্ছিন্ন হয় এবং তারা মুক্তাত্মা হয়। দ্বৈপায়ন সমাহিত ভাবে সেখানে স্নান ও বৃদ্ধকালেশ্বরের পূজা করলেন। তারপর সেখান থেকে মুনিসিদ্ধ নিষেবিত রমণীয় মন্দাকিনীর তীরে শিবের দর্শনের অভিলাষী ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও সনকাদি মুনিগণ কর্তৃক পূজিত মধ্যমেশ্বর নামে মোক্ষ লিঙ্গের নিকটে গেলেন। তিনি মন্দাকিনীতে স্নান করে মধ্যমেশ্বর দর্শন করলেন। তারপর ঘণ্টাকর্ণ হ্রদে স্নান করে নির্মল শিব প্রতিষ্ঠা করলেন। তাতে তাঁর উত্তম জ্ঞান লাভ হল। এই হ্রদের সমীপে ব্যাসেশ্বর শিব দর্শন করে যে কোন স্থানে মরলেও কাশীতে মৃত্যুর সমান ফল হয়। তার পর তিনি কপর্দীশ্বর নামে পরমেশ্বর লিঙ্গ দর্শনের জন্য গেলেন। সেখানে পিশাচ মোচন নামে অত্যুৎকৃষ্ট তীর্থ আছে। মহামুনি বলেছেন যে তা রুদ্রলোকের সোপান। যাঁরা কপর্দীশ দর্শন করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কৃতার্থ হয়েছেন। তাঁরা যে মানুষের দেহে সাক্ষাৎ রুদ্র, তাতে সংশয় নেই। মুনি সেই পিশাচ

মোচন তীর্থে স্নান ও দেবতা ও পিতৃ তর্পণের পর কপর্দীশ্বর লিঙ্গ পূজা করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

সূত বললেন, তিনি গেলেন ভক্তের সিদ্ধিদাতা দক্ষেশ্বর লিঙ্গ দর্শনের জন্য। শিবকে অবজ্ঞা করার জন্য দক্ষ প্রজাপতির যে পাপ হয়, তার মোচনের জন্য তিনি বহু শত বৎসর সেই লিঙ্গে শিবের আরাধনা করেন। তাতে দেবদেব উমার সঙ্গে প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধিমান দক্ষকে মাহেশ্বর যোগ প্রদান করেন। তা লাভের পর দক্ষ সেই লিঙ্গেই লীন হন। তার পর থেকেই যোগীরা সেই লিঙ্গের সেবা করে আসছেন। দক্ষেশ্বর শিব সকলকে যোগ প্রদান করেন। দ্বৈপায়ন বলেছেন যে পবিত্র ভাবে গঙ্গাস্নান করে দক্ষেশ্বর শিব দর্শন করলে পরম যোগ প্রাপ্তি হয়। তিনি তাই করে ত্রিলোচন ক্ষেত্রে গমন করলেন।

ঋষিরা বললেন, সূত, পুরাকালে দক্ষ কী জন্য শিবের নিন্দা করে-ছিলেন, তা বলুন। আমরা তা শুনতে চাই।

সূত বললেন, দক্ষ ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র। শিবকে অবজ্ঞা করাতে তাঁর অভিশাপে তিনি প্রচেতাদের পুত্র হন। প্রাচেতস দক্ষ তাঁদের পূর্বের বৈরাতা স্মরণ করে গঙ্গার তীরে এক যজ্ঞ করলেন। দক্ষ সেই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতা ঋষি মুনি প্রথিততেজা রাজা ও বিষ্ণুর সঙ্গে ব্রহ্মাকে আহ্বান করলেন। শিব ভিন্ন সমস্ত দেবতা যজ্ঞের ভাগ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন দেখে কমলযোনি ব্রহ্মা দক্ষকে বললেন, এ তুমি কী করেছ দক্ষ? তুমি মহামূঢ় ও দুর্বুদ্ধি! সমস্ত দেবতাকে তুমি ডেকেছ, কিন্তু শঙ্করকে ডাক নি কেন? তিনি বিশ্বেশ্বর, সমস্ত প্রাণীরই অন্তর্যামী। বস্তুত তিনিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। তোমার সাহায্যকারী এই সব মুনি শূলপাণি মহাদেবের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নন। এই যে ইন্দ্রাদি দেবতারা তোমার যজ্ঞ ভাগের জন্য এসেছেন, এঁরাও শিবের মায়ায় মোহিত বলে তাঁকে প্রকৃত রূপে জানেন না। যাঁর চরণের রেণুর স্পর্শে আমি ব্রহ্মপদ লাভ করেছি,

বিষ্ণুও যাঁর পদধূলি মাথায় ধারণ করেন, সেই শিবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে! বিষ্ণু যাঁর বাম অঙ্গ সম্ভূত ও আমি দক্ষিণ অঙ্গ সম্ভূত, যাঁর আদেশে সূর্য চন্দ্র তারকামণ্ডল ও গ্রহরা অখিল বিশ্ব পরিভ্রমণ করছেন, তাঁর শাসনেই তো ধর্মাধর্ম ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। সমস্ত জগৎটাই তো তাঁরই শাসনে চলছে! তাঁর পরমা শক্তি গৌরী স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করেছেন। তুমি দুর্মতি, তাই অজ্ঞানতা বশেই তাঁকে তোমার কন্যা বলে মনে করছ। ঈশ্বরের অর্ধ শরীররূপা সেই বিশ্বেশ্বরীকে কে জানতে পারে! আমি ও বিষ্ণু আজও তাঁর তত্ত্ব অবগত নই, ইন্দ্রের তো কথাই নেই। গৌরীর সঙ্গে পিনাক-পাণি যে এই অখিল বিশ্বচক্র ঘোরাচ্ছেন, তাতে সংশয় নেই। বেদেই আছে যে সেই মহাদেব আমাদের মতো পশুদের বদ্ধ করে থাকেন, আবার তিনিই আমাদের মোচন করেন। দক্ষ, তুমি দুর্মতি। তাই যার নাম সঙ্কীর্তনে পাপ পঞ্জর ভাঙে, তুমি সেই দেবতারই পূজা করছ না! শিবের অবজ্ঞা যেখানে হয়, পণ্ডিতরা সেখানে অবস্থান করবেন না। বলে ব্রহ্মা মহর্ষিদের স্তব স্তুতি অগ্রাহ্য করে চলে গেলেন।

সূত বললেন, সর্বলোক পিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা চলে গেলে মুনিদের অগ্রগণ্য দধীচি স্বয়ং দক্ষকে বলতে লাগলেন, দেবাদিদেবেশ্বর কর্মসাক্ষী সনাতন বিশ্বেশ্বর মহাদেবের পূজা করছ না কেন? জ্ঞান-বিগ্রহ উমাপতির বাচক প্রণবের অনুগ্রহ ছাড়া তাকে জানবে কী ভাবে? সমস্ত বেদে যে রুদ্র একমাত্র বলে কথিত, তাঁর প্রসাদে মুক্তি দাসী হয়ে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে, কৌতুকের বশে, লোভে, ভয়ে বা অজ্ঞানে, যে কোন সময়ে মানুষ হর এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণ করলে সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। আমার মনে হচ্ছে যে তোমার অজ্ঞানতাই কোন কারণে তোমার নাশের হেতু হয়ে উঠল।

দধীচির এই কথা শুনে বিচক্ষণ দক্ষ ইন্দ্রাদি দেবতার সামনেই বলতে লাগলেন, নারায়ণ ছাড়া আর কাউকে আমি সব কিছুর কারণ বলে মনে করি না। দধীচি বললেন, উমার সঙ্গে বর্তমান বলে জ্ঞানীরা

যাকে সোম বলে, তিনি বিষ্ণুরও কারণ, অন্য কেউ নয়—এ কথ শ্রুতিতেও আছে। তাই যে চন্দ্রশেখর সমস্ত দেবতার বড় ও সমস যজ্ঞে অর্চিত, তুমি তাঁর পূজা করছ না কেন? তুমি যে ভাবছ যে বিষ্ণু যজ্ঞের পালক, বিষ্ণুর সামনেই তার অন্যথা হবে। এই যে ব্রাহ্মণের শিবের দ্বেষ করছে, এরা তমোপহত-চেতা, এরা বেদবহিষ্কৃত হোক কলিযুগে এরা পাষণ্ডাচারে রত দরিদ্র ও শূদ্রের যাজক হয়ে নরকগামী হবে। রুদ্রই দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পশুপাশ বিমোচক। তিনি যখন বিমুখ তখন তোমাদের যাজ্ঞিকের গতিলাভ হবে না। দধীচি এই অভিশাপ দিয়ে নর্মদার তীরে নিজের ওঙ্কার লিঙ্গ বিরাজিত ও মুনি সেবিত আশ্রমে চলে গেলেন।

এমন সময় মহাকাশের মতো সূক্ষ্ম নির্লেপ সবত্রগ দেবেশী গৌরী শিবা দেবর্ষির মুখে দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্ত শুনে শরণাগতের রক্ষক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরমানন্দরূপী রুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, পূর্বজন্মে যিনি আমার পিতা ছিলেন, এ জন্মে যিনি প্রচেতার পুত্র, সেই দক্ষ আমাদের অবজ্ঞা করে যজ্ঞ করছেন কেন? বিষ্ণুর সঙ্গে সমস্ত দেবতা আদিত্য বসু রুদ্র সিদ্ধ সাধ্য ও মরুদগণ, মুনি ঋষি দৈত্য দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও রাজারা সকলেই আহূত হয়েছেন। আজ্ঞাকারীর এই যজ্ঞ শীঘ্র নষ্ট কর। এতে আমার অতুলনীয় প্রীতি হবে। দেবীর এই কথা শুনে দেবদেব পিনাকপাণি শম্ভু সহস্র সিংহের মতো ভীষণাস্য প্রলয়ানন সন্নিভ সূর্য চন্দ্র অনলাত্মক ত্রিলোচনধারী মহাবল বীরভদ্রকে সৃষ্টি করলেন। ভয়ঙ্করা দেবী ভদ্রকালী দাক্ষায়ণীর ক্রোধ থেকে উদ্ভূত হলেন এবং আরও শত শত রুদ্র ও দেবী রোম থেকে উৎপন্ন হলেন। দেবদেব শিব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের অভিলাষে ভদ্রকালীর সঙ্গে বীরভদ্রকে প্রেরণ করলেন। তিনি গিয়ে দক্ষ যজ্ঞ ভস্মসাৎ করলেন। দক্ষ বীরভদ্রের অদ্ভুত কর্ম দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। দয়ামৃতসাগর বীরভদ্র প্রাচেতস দক্ষকে তাঁর পাপ মোচনের জন্য বললেন, দক্ষ লোকানুগ্রহের জন্য শঙ্কর যেখানে অবস্থিত,

সেই সর্বপাপনাশিনী বারাণসীতে যাও। সেখানে তুমি এই শরীরেই মুক্তি লাভ করবে।

বীরভদ্রের কথা শুনে দক্ষ, সমস্ত সঙ্গ বিবর্জিত হয়ে বারাণসীতে গেলেন এবং গঙ্গার মনোরম তীরে শিবের মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তি সহকারে তাঁর আরাধনা করে সেখানেই লয় প্রাপ্ত হলেন। এই হল দক্ষেশ্বরের মাহাত্ম্য।

সূত বললেন, ত্রিলোচনের চেয়ে উৎকৃষ্ট শিবলিঙ্গ বারাণসীতে দেখা যায় না। সাক্ষাৎ মহেশ্বর সেই লিঙ্গে সতত সন্নিহিত। তাই ত্রিলোচন দর্শনে সমস্ত লিঙ্গ দর্শনের ফল হয়। তাঁর দর্শনে জ্ঞান ও অজ্ঞান-কৃত পাপ বিনষ্ট হয়। মায়াপাশ বদ্ধ সমস্ত প্রাণীকে তিনি পরম মুক্তি দান করেন। এই লিঙ্গ পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত ও সর্পমেখলা মণ্ডিত। তাঁকে দর্শন করতেই কোটি লিঙ্গ পূজার ফল পাওয়া যায়। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর পূজা করে কামেশ্বর সিদ্ধ লিঙ্গ দর্শনের জন্য গেলেন। শিব সেখানে প্রসন্ন হয়ে দুর্লভ সিদ্ধি প্রদান করেন এবং এই বর দেন যে সর্ববিধ তপস্যানাশকারী ক্রোধ জয় করবে। এর দক্ষিণে কাম-কূপ। সেখানে স্নান করে কামেশ্বর শিব দর্শন করলে ব্রহ্মহত্যার মত পাপ থেকেও মুক্ত হয়ে পরম গতি লাভ হয়। বারাণসীতে এত লিঙ্গ আছে যে স্বয়ং ব্রহ্মাও তার সংখ্যা অবগত নন। মহেশ্বর ছাড়া আর কে এই সব লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে সমর্থ! তবে শিবের প্রসাদে নন্দীশ্বর এ সমস্তই অবগত আছেন।

এর পর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিশালাক্ষীর মূর্তি দেখবার জন্য গেলেন। দুর্গা সেখানে সতত বিরাজ করেন। মহামুনি ভক্তি সহকারে সেই আনন্দরূপিণী গৌরীর পূজা করে স্তব করলেন, পরম ব্রহ্মরূপিণী বিশালাক্ষী, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মাদি দেবতাদের মাতা, তুমিই ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। তুমিই যোগসিদ্ধি প্রদায়িনী, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী সরস্বতী, সর্বশক্তিময়ী শিবা। এইভাবে বিশা-লাক্ষীর স্তব করে ব্যাস কৃতার্থ হলেন।

কাশীতে বিশালাক্ষী, গঙ্গা, বিশ্বেশ্বর শিব ও শিবভক্তি এই চারটি দুর্লভ। গঙ্গাজলে স্নান করে বিশালাক্ষী দর্শন করলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। কাশীর মাহাত্ম্য আমি কিঞ্চিৎ কীর্তন করলাম। যিনি এই মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁর শিবপদ প্রাপ্তি হয়।

পুরাণের লক্ষণ ও পুরাণ দানের ফল

ঋষিরা বললেন, সূত, পুরাণের লক্ষণ কী? পুরাণ দানের ফল কি? অন্য দান বা ব্রতেরই বা কী বিশেষ ফল আছে? বর্ণাশ্রম, তার লক্ষণ, শ্রাদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্তের বিধি—এ সবও আমাদের বলুন।

সূত বললেন, সূর্য তাঁর পুত্র মনুকে যা বলেছিলেন, আমি তাই আপনাদের বলছি, শুনুন। সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ ও মন্বন্তর বর্ণনা এবং বংশানুচরিত কীর্তন—পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ। ব্রহ্মাদি পুরাণের লক্ষণ এই এবং পুরাণের খিল অর্থাৎ পরিশিষ্ট বলে উপপুরাণের লক্ষণও এই। ব্রহ্ম পুরাণই প্রথম পুরাণ। এতে দশ হাজার শ্লোক আছে, নানাবিধ পবিত্র কথা আছে এবং সংহিতার শোভা আছে। দ্বিতীয় পদ্ম পুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণু পুরাণ, চতুর্থ বায়ুপ্রোক্ত বায়ু পুরাণ, বার পর্বে কথিত ভাগবত (দেবী ভাগবত) পঞ্চম পুরাণ। তারপর ভবিষ্য পুরাণ, নারদীয়, আগ্নেয় ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ। দশম পুরাণ ব্রহ্ম বৈবর্ত এবং দুই ভাগে কথিত লিঙ্গ পুরাণ একাদশ। তারপর বরাহ পুরাণ ও আট খণ্ডে বিভক্ত অতি বিস্তৃত স্কন্দ পুরাণ। তারপর বামন পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ ও দুই ভাগে বিভক্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। উপপুরাণগুলি খিল নামে পরিচিত। সৌর পুরাণ ব্রহ্ম পুরাণের খিল। শিব কথাশ্রিত এই পবিত্র পুরাণের দুটি সংহিতা আছে—প্রথমটি সনৎকুমার কথিত ও দ্বিতীয়টি সূর্য কথিত। এই পাপনাশিনী সংহিতা পুরাকালে সূর্য মনুকে বলেছিলেন।

পুরাণ দান সমস্ত দানের মধ্যে উত্তম। চতুর্দশী তিথিতে শিবভক্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে এই পুরাণ দান করলে সর্ববিধ দানের ফল পাওয়া

যায়। শ্রদ্ধা সহকারে যে প্রথম পুরাণ ব্রহ্ম পুরাণ দান করে, সে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে সসম্মানে ব্রহ্মলোকে বাস করে। এই ভাবে সমস্ত পুরাণ দানেই নানাবিধ ফল লাভ হয়। সূর্যের কথা মতো আমি পুরাণ দানের ফল সংক্ষেপে বললাম। শিব সন্নিধানে যে এই অধ্যায়টি পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে।

বিভিন্ন প্রকার দান ও দানের মাহাত্ম্য

সূত বললেন, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল—দান এই চার প্রকার। সং পাত্রে দান করবে, অপাত্রে অণুমাত্র দান করবে না। দেবদেব সূর্য মনুকে যে সব সৎ পাত্রের কথা বলেছেন, আমি আপনাদের তা বলছি শুনুন। ত্রিভুবনে দানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। দানেই স্বর্গ ও ঐশ্বর্য লাভ হয়। দানেই সুখ, রূপ, কান্তি, যশ ও বল লাভ হয়। দানে জয় ও মুক্তিও হয়। দানে শত্রু জয়, রোগ নাশ, বিদ্যা লাভ ও তরুণী লাভ হয়। দানই ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের পরম সাধন, অন্য কিছু নয়। সূর্য এই কথা বলেছেন। তাই সযত্নে সৎ পাত্র নির্ণয় করে দান করা কর্তব্য। তা না করলে সমস্তই ভস্মে আহুতির মতো হবে। যাঁরা বেদ বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞ, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, শ্রৌত-স্মার্ত ক্রিয়ানিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, বহু কুটুম্বসম্পন্ন, তপস্বী, তীর্থ নিরত, কৃতজ্ঞ, মিতভাষী, গুরু শুশ্রূষারত, স্বাধ্যায়শীল, শিব পূজারত, ভূতি শাসন ভূষিত, বৈষ্ণব বা সূর্যভক্ত, দ্বিজদের মধ্যে তাঁরাই সৎ পাত্র। দানের ফলে অভিলাষ থাকলে এদেরই দান করতে হয়। আপৎ কালেও অন্যকে দান করতে নেই। আর ব্রাহ্মণ যদি শৈব হন তো তিনি সর্ববিধ সৎ পাত্রের চেয়েও উত্তম পাত্র। তাঁকে দান করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। 'শিবভক্তকে অতিক্রম করে যে অন্যকে দান করে, তার সেই দান নিষ্ফল হয় এবং তার নরক ভোগ হয়। তাই যিনি অক্ষয় ফলের অভিলাষী, তিনি নিষ্পাপ শিব ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ পাত্র বিবেচনা করে তাঁকেই সব কিছু দান করবেন।

ফলের আশা না করে যা সর্বদা দান করা হয়, দেবদেব সূর্য তা
নিত্য দান বলেছেন। পাপ ক্ষয়ের জন্য শ্রদ্ধা সহকারে যা দান ক
হয়, বেদবাদী ঋষিরা তাকে নৈমিত্তিক দান বলেছেন। পুত্র, ধ
স্বর্গ বা অন্য কোন ফল লাভের জন্য যে দান তার নাম কাম্য দান
আর শিবের প্রীতির জন্য শিবভক্তকে যে দান করা হয়, তা বিমল দা
নামে অভিহিত। বিমল দান কেবল মুক্তির সাধন। নিজের পোষ্য
দের ভরণ-পোষণে ক্লেশ না দিয়ে বিশেষ দরিদ্রকে যে দান করা হয়
তাকে অধিক দান বলে। শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে অল্পমাত্র ভূমিও দা
করে, সে ব্রহ্মলোকে স্বয়ং বিরাটের নিকটে যায়। দরিদ্রকে ইক্ষু
গোধূম, অরহর ও যবের সঙ্গে ভূমি দান করলে সূর্যলোক প্রাপ্তি হয়
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে গোচর্ম মাত্র ভূমিও শান্ত শিবভক্তকে দান করলে সম
পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়। ভূমণ্ডলে ভূমিদানের চেয়ে বড় দা
নেই। দরিদ্রকে ভূমি দানে অক্ষয় ফল লাভ হয়।
কদাচ বিশেষ ভাবে ভূমি দান করতে নেই। ভয়ে বা স্নেহের বশে
তা করবে, তার অক্ষয় নরক ভোগ হবে।' ধার্মিকরা ব্রাহ্মণকে
গ্রাম দান করেন, লোভান্ধ ও পাপিষ্ঠ রাজারা তার কর গ্রহণ করে
তিন অযুত কল্প নরকে পচে। তারপর মক্ষিকাদি জীব ও
হয়ে সহস্র যুগ জন্মের পর ম্লেচ্ছ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। বহু
প্রায়শ্চিত্তেও তাদের নিষ্কৃতি হয় না। ব্রহ্মহত্যাকারীও কালক্রমে
শুদ্ধ হয়, কিন্তু বিপ্রলব্ধ গ্রামের কর যে গ্রহণ করে, তার শুদ্ধি নেই
সুতরাং বুদ্ধিমান রাজা সে গ্রামের কর ত্যাগ করবেন। ব্রাহ্মণে
গ্রামের কর গ্রহণের চেয়ে বড় পাতক আর নেই।

পণ্ডিতরা মনে কবেন যে সব দানের চেয়ে বিদ্যা দানই উত্তম
কিন্তু বিনয়ী ও বর্ণাশ্রমরত শান্ত সেবক ব্রাহ্মণকেই সেই দান করবে
বলা হয়ে থাকে যে বিদ্যাদানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

বেদবাদীরা অন্নদানের প্রশংসা করেন। অন্নই প্রাণ বলে অ
দান ও প্রাণ দান সমান। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ব্রহ্মার আদেশে

পরীক্ষা না করে প্রত্যহ সকলকে অন্ন দান করবে। অন্নেব দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও ইন্দ্র সকলেই প্রীত হন। এই জন্যই বেদবিদ্ পণ্ডিতরা অন্নদানকে বিশিষ্ট দান বলেছেন। গৃহস্থকে আমান্ন দান করা উচিত, কিন্তু পথিককে পক্বান্ন দান করা নিষিদ্ধ নয়। সূর্য এই কথা বলেছেন।

জলই সর্বভূতের জীবন। তাই জল দানকেও অন্ন দানের তুল্য বলা হয়েছে। তিল দান করলে পুত্র লাভ, বস্ত্র দান করলে শান্তি লাভ, দীপ দানে নির্মল দৃষ্টি লাভ, ফল দানে স্ত্রী লাভ, শয্যা ও ধান্য দানে সুখ লাভ এবং অশ্ব দানে সৌন্দর্য লাভ ও অশ্বিনীকুমার লোক প্রাপ্তি হয়।

বেদবিদ্‌রা বেদ দানকে মহাদান বলে স্থির করেছেন। তাতে ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি বেতন নিয়ে বেদের অধ্যাপনা করে অথবা যে বেতন দিয়ে তা অধ্যয়ন করে, তারা উভয়েই পাপী। সুরা ভাণ্ডের জলের মতো তাদের মুখের উচ্চারিত বেদও সব কাজে নিন্দিত।

গোগ্রাম প্রদান করে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বিবিধ ফল মূল ও ভোজ্য শাক প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে দান করলে সুখ হয়। ইন্ধন দানে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়, ছত্র দানে মৃত ব্যক্তির সুখ হয়। রোগ নিরাময়ের জন্য রোগীকে যে ঔষধ দেয়, সে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয় এবং সর্বদা সুখে থাকে। যে শ্রদ্ধা সহকারে সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী অলঙ্কৃত করে দক্ষিণাসহ সৎ ব্রাহ্মণকে দান করে, তার নানা ভোগ সমন্বিত অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হয়। কপিলা দানের অসীম পুণ্য। সংসার, মৃগচর্ম, মহিষী, মেষী, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির জন্য দশ ধেনু, তুলা পুরুষ দান, ষোড়শ যজ্ঞ ও তীর্থে দান অক্ষয় ফলজনক হয়। যোগীদের এই দান করলে আরও ভাল ফল হয়। চন্দ্র সূর্য গ্রহণ, অয়ন সংক্রান্তি, বিষুব সংক্রান্তি ও অন্যান্য সংক্রান্তিতে দান করলে তা অক্ষয় হয়। শিবের উদ্দেশ্যে যা দান করা হয়, অল্প বা বেশি হলেও তা অক্ষয়। প্রসিদ্ধ শিবতিথি মাঘ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যে ভক্তি

সহকারে শিবের উদ্দেশে সুবর্ণ বস্ত্র ফল বা ধান দান করে, তা তাকে অক্ষয় ফল দেবে।

সর্ব ভূতের প্রতি যে অভয় দান, তাও পরম দান। ধন দান ছাড় সম্পাদনীয় সেই দানের চেয়ে উৎকৃষ্ট দান আর নেই। এই ভাবেই বিভিন্ন দানের ফল বলা হল। যে এই কথা পাঠ বা শ্রবণ করবে তার গো দানের ফল হবে।

শিব-কার্তিকেয় সংবাদ

সূত বললেন, এবারে অন্য তপস্যার বিষয়ে বলছি। কার্তিকেয়র প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষাৎ শিব এই ব্রতের কথা বলেছিলেন। কার্তিকেয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কার প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হন? কে আপনাকে অবগত হতে পারে? আপনার বিষয়ে যোগ ও জ্ঞান কী রকম, পুত্রস্নেহে আমাকে তা বলুন।

ঈশ্বর বললেন, সতত আমার যে ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয় গুণের আধিক্য আমার প্রীতির কারণ নয়। যারা সব কিছু খায় ও পান করে এবং সমস্ত আচারও বিলোপ করে, তারাও যদি কায় মন ও বাক্যে আমাকে আশ্রয় করে তো তাদেরও মুক্তি হয়। তপস্যা দান বা যজ্ঞে আমার সন্তোষ হয় না, হয় লেশ মাত্র ভক্তিতেই। তাতেই আমি তাকে পরম পদ দান করি। সতত শান্ত, ত্রিপুণ্ড্রধারী, রুদ্রাক্ষ মালা-করভূষণ, দম্ভহীন, সত্যসংকল্প পুরুষই আমার উত্তম ভক্ত সূর্য অগ্নি বা চন্দ্রের ভক্ত অপেক্ষা বিষ্ণুর ভক্ত শ্রেষ্ঠ। আবার সহস্র বৈষ্ণবের চেয়ে শিবভক্তই শ্রেষ্ঠ। বর্ণাশ্রমাচারবিহীন পাপ-নিরত ক্রুর ব্যক্তিও যদি আমার ভক্ত হয় তো সেও মান্য ও পূজ্য। সৎ বা অসৎ যে পথস্থই হোক, মূর্খ বা পণ্ডিত যাই হোক, আমার ভক্ত হলেই সে শ্রেষ্ঠ হয়। সে তোমারই মতো আমার প্রিয় পাত্র আমার ভক্তের পূজা করলে আমারই পূজা করা হয়। যে আমার ভক্তকে দ্বেষ করে, সে আমারই বিদ্বেষক।

কার্তিকেয়, সমস্ত শাস্ত্রে অষ্টবিধ ভক্তির কথা বলা হয়েছে। আমি তোমাকে সেই ভক্তির কথা বলছি। আমার ভক্তের প্রতি বাৎসল্য, আমার পূজার অনুমোদন, ভক্তি সহকারে আমার পূজা, আমার উদ্দেশে প্রদক্ষিণ, আমার কথা শ্রবণে অনুরাগ, স্বর নেত্র ও অন্যান্য অঙ্গের বিকার, সর্বদা আমার অনুস্মরণ এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য আমাকে উপকরণ না করাই এই অষ্টবিধ ভক্তি। যাঁতে এই ভক্তির লেশমাত্র থাকে, তিনিই মুনি, যতি ও পণ্ডিত। তাঁকেই সতত দান করতে হয়, তাঁর নিকটেই প্রতিগ্রহও করতে হয়। যে ভক্তিভরে একবার আমার পূজা করে, সে মহাপাতক থেকেও মুক্তি লাভ করে আমার ধামে সংক্রান্ত হয়ে থাকে। স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করে আমার উদ্দেশে অর্পণ করা সমস্ত দানের চেয়েও উত্তম। আমার প্রতি ভক্তি রাখবে। তাতে সংসারপাশ বিচ্ছিন্ন হবে। আমি ভক্তিলভ্য। আমার যে যোগ, তা অতি দুর্লভ। যোগ থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আমার প্রতি একাগ্রতাই যোগ। জ্ঞানই স্বরূপ। নিত্য নির্বিকার শুদ্ধ চিদানন্দ রূপ অজ্ঞানে আবৃত। বেদান্তবাক্যজ্ঞান হলে এই অজ্ঞানতা দূর হয়। জ্ঞান আত্মার ধর্ম নয়, কোন রকম গুণও নয়। নিত্য সর্বগত শিব স্বরূপ আত্মাই জ্ঞান স্বরূপ। আমিই সর্ব ভূতের আত্মা এবং আমিই এক পরমেশ্বর। যা কিছু পদার্থ, তা আমাতেই কল্পিত। এক অদ্বিতীয় জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাতেই মায়ামোহিত ব্যক্তিরা নানা রূপ দেখে। মায়া সৎ বা অসৎ স্বরূপ নয়, উভয় স্বরূপাও নয়। সদসদাতিরিক্ত মিথ্যা স্বরূপ, অথচ নিত্য। অজ্ঞ ব্যক্তিরা একমাত্র জ্ঞানকেই অখিল জগৎ বলে বিবেচনা করে এবং জ্ঞানীরা এই জগৎকেই একমাত্র আত্ম স্বরূপ মনে করেন। আমি স্ফটিক মণির মতো শুদ্ধ, নিরুপাধি, শান্ত স্বপ্রকাশ ও সর্বব্যাপী-আত্মা। শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, তেমনি আত্মাতেই অখিল বিশ্ব ভ্রম হচ্ছে। শুক্তি জ্ঞানে যেমন রজত ভ্রম দূর হয় তেমনি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে বিশ্ব ভ্রমও অপনীত হয়। আত্মার কখনও কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নেই।

অহঙ্কারজনিত অবিবেকই কর্তৃত্বাভিমানের কারণ। বেদজ্ঞরা বলেন যে নিত্য মুক্ত অখণ্ড আত্মার কর্তব্য কিছুই নেই। সেই জন্য আত্মা কখনও পাপ পুণ্যে লিপ্ত হয় না। বুদ্ধি প্রভৃতি সবই গুণ। বুদ্ধি থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়রা উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র থেকেই স্থূল পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত থেকেই স্থূল জগৎ। অব্যক্ত অর্থাৎ বুদ্ধির যা উপাদান তা চতুর্বিংশ তত্ত্ব, পুরুষ পঞ্চবিংশ। কার্য করণ ও ক্রিয়া, পুরুষের কিছুই নেই। শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে নিজের অজ্ঞানতা বশতই আত্মাতে এই সবের অস্তিত্ব মানা হয়। পুত্র কার্তিকেয়, আমার জ্ঞান এই তোমাকে বললাম।

ঈশ্বর বললেন, আমার প্রতি একাগ্রচিত্ততাই যোগ এবং তার সাধন অষ্টবিধ। এবারে তাই বলছি, শোন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আট যোগের অঙ্গ এবং একেই অষ্টবিধ সাধন বলে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখতাকে সংক্ষেপে যম বলে। নিয়ম হল তপস্যা, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ এবং ঈশ্বরের পূজা। এই নিয়ম যোগসিদ্ধির হেতু। কোন প্রাণীকে ক্লেশ না দেবার নাম যোগসিদ্ধি-দায়িনী অহিংসা। যথার্থ কথাই সত্য। চৌর্য বা সবলে পরস্বহরণ বর্জনকে অস্তেয় বলে। ব্রহ্মচর্য মৈথুন বর্জনের নাম। আপৎ কালেও স্বেচ্ছায় দ্রব্য গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। এই সব যোগ সিদ্ধির হেতু। চান্দ্রায়ণাদির দ্বারা শরীর শোষণকে তপস্যা বলে। প্রণবাদি বেদমন্ত্রের জপ স্বাধ্যায়। সন্তোষ যদৃচ্ছা লাভে তৃপ্তি। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শুদ্ধিকে শৌচ বলে। স্তব, স্মরণ, পূজা ও কায় মনোবাক্যে আমার প্রতি ভক্তির নাম ঈশ্বর পূজন। যম নিয়ম যুক্ত যোগী মোক্ষের জন্য উদ্যত হয়ে প্রথমে আসনবন্ধ অভ্যাস করবে। সাতাশটি আসন আছে। এর মধ্যে যে কোন একটি আসনবন্ধ হয়ে প্রাণায়াম করবে। অগর্ভ বা জপশূন্য সগর্ভ বা সজপ

এই দু রকম প্রাণায়াম। রেচক, শূন্যক, পূরক ও কুম্ভক—এই হল প্রাণায়ামের ভেদ। যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে 'ধারণা' করলে এক বৎসরের মধ্যে যোগৈশ্বর্য সমন্বিত ও জরামরণ বর্জিত হবে। নিরালম্বে মন স্থাপন করলে ক্ষণ মধ্যে প্রাণ জয়ী হবে। স্বভাবত বিষয়সঞ্চারী ইন্দ্রিয়ের যে নিগ্রহ, তাকেই প্রত্যাহার বলে। প্রত্যাহার উত্তম যোগ সাধন। এতে দৃষ্টিগোচর বস্তু আত্মায় অবলোকন করা যায়। আত্মায় সদাশিবকে স্মরণের নাম ধ্যান। আমিই পরমানন্দরূপী শিব—এই চিন্তায় যোগী জরামরণবর্জিত শিবস্বরূপ হন। গমনাগমন বর্জিত বিষয়সম্পর্কহীন একাগ্রচিত্ততার নাম সমাধি। এতে বৃহৎ বা সূক্ষ্ম বস্তুর চিন্তা থাকে না। নির্গুণ 'জ্যোতিঃ স্বরূপ আমাতে মুহূর্তকাল আত্ম স্থাপন করতে পারলে যোগীর 'ব্রহ্মানুভব হয়। আমার প্রসাদে তিনি সর্বজ্ঞ নিস্পৃহ ও জরামরণবর্জিত হন। অন্য কোন রূপে তা হয় না। জগতের প্রলয় হলে, এমনকি ব্রহ্মার প্রলয় হলেও আমার ভক্তরা বিনষ্ট হয় না। যোগী, কর্মী ও সংযতচিত্ত তপস্বী—সবারই গতি আমি, অন্য গতি নেই বলে নিশ্চয় জেনো।

কার্তিকেয় বললেন, এই দৃশ্যমান দেহ পঞ্চভূতের কার্য এবং বিপত্তি ও রোগে আকুল। সুখ দুঃখে একে সতত পীড়িত হতে হয়। তাই যোগী যখন আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক দুঃখে অভিভূত হয়, তখন যোগসিদ্ধির উপায় কী বলুন।

ঈশ্বর বললেন, যোগীদের এমন কি তোমাদেরও সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক বিঘ্ন হয়। এই সব বিঘ্ন যোগের ত্রাসকর। প্রতিভা, শ্রবণ, বার্তাজ্ঞান, দর্শন, আস্বাদ ও অনুভবের আতিশয্য—এই ছয় উপসর্গ সাত্ত্বিক। আমি ও আমার থেকে উৎপন্ন অহঙ্কারময় জল্পনা রাজস বিঘ্ন। অন্ধতা, বধিরতা, পঙ্গুতা, রোগ, মূর্ছা ও ভ্রমাদি ব্যাধি অজ্ঞান ও অহঙ্কার মিশ্রিত এবং এই সব রাজস তামস বিঘ্ন মিশ্রিত ভাবে দেহীকে পীড়িত করে। কেবল জড় ভাবের জন্য মূঢ়তা, অজ্ঞতা ও মূকতা প্রভৃতি তামস বিঘ্ন। যক্ষ, যাতুধান, কিন্নর, সর্প, রাক্ষস,

দেব, দানব, রুদ্রগণ, দৈত্য, মাতৃগণ, তামস গ্রহ ও ভূতগণ বায়ু স্বরূপ হয়ে যোগাভ্যাস রত মানুষকে সতত পীড়িত করে। যোগীদের সিদ্ধির জন্য এই সব উপসর্গ বারণের জন্য বিবিধ ধারণার কথা বলছি, শোন। কণ্ঠ ও নাসার অগ্রভাগে প্রণব চিন্তা করবে এবং সুরেশ্বর পরমেশ্বরকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করবে। এই ধ্যান যোগে সর্ব বিঘ্ন নিবারণ ও সর্ব লোক বশীকরণে সমর্থ হবে। আপদেও তার মহৈশ্বর্য দূর হবে না। তিনি সম্যক্‌দর্শী হন ও কর্মে অভিভূত হন না। সেই যোগযুক্ত যোগবিদ্‌ পরম নির্বাণ লাভ করেন। বায়ুর বহির্দ্বার নিরোধ করে কর্তৃত্বাভিমানের প্রযোজক চিত্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোপ করে সেখানেই লক্ষ্য স্থির করে তদ্‌গত হবে এবং সেইখানেই আমাতে আত্মযোজনা করবে। ঘৃত যেমন ঘৃতে মিশ্রিত হলে ঐক্য ভাবের জন্য তার আর বিশেষ ভাব থাকে না, তেমনি এই যোগ বা যুক্তি বলে সেই জীব তুরীয় ব্রহ্মে লীন হয়। তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত

সূত বললেন, এর পর ব্রতের কথা বলছি, শুনুন। ব্রতের মধ্যে কৃষ্ণাষ্টমী পুণ্যজনিকা ও সর্বপাপবিনাশিনী। এর চেয়ে বড় বিভূতি-প্রদ ব্রত আর নেই। এই ব্রত করেই ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ, বিষ্ণু বিষ্ণুপদ, ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য, কুবের যক্ষ রাজত্ব, যম নিয়ন্তৃত্ব, চন্দ্র চন্দ্রপদ, গণেশ গাণপত্য ও কার্তিকেয় সেনাপতিত্ব পেয়েছিলেন। অন্যান্য গণশ্রেষ্ঠ-গণও এই ব্রত করে ঐশ্বর্য সৌভাগ্য ও দেবপ্রিয়ত্ব লাভ করেছিলেন। এই ব্রতের প্রভাবেই বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি হয়েছেন এবং যযাতি সার্বভৌমত্ব পেয়েছিলেন। অন্য রাজারা, ঋষি মুনি সিদ্ধ ও গন্ধর্ব কন্যারা এই ব্রত করে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই সব কামপ্রদ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাষ্টমী ব্রতের কথা নন্দীশ্বর মহাত্মা নারদের নিকটে কীর্তন করেছিলেন।

নারদ মুনি সুমেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে নন্দীশ্বরকে বিবিধ স্তব করে

বলেছিলেন, হে সর্ব-তত্ত্বজ্ঞ, কোন্ ব্রত অনুষ্ঠান করলে তপোবৃত্তি হয়? কোন্ ব্রতে সৌভাগ্য, কান্তি, ঐশ্বর্য, অপত্য, যশ ও অন্তে নির্বাণ-মুক্তি লাভ হয়? কৃপা করে শিবের সেই প্রিয় ব্রতের কথা আমাকে বলুন।

নন্দীশ্বর বললেন, দেবর্ষি, কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত নামে শ্রেষ্ঠ ব্রতের কথা শুনুন। আমি এই ব্রত করে গণেশত্ব লাভ করেছি। এই ব্রতী জিতেন্দ্রিয় হয়ে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে অশ্বত্থ কাঠে দন্ত ধাবন ও যথাবিধি স্নান তর্পণ করে গৃহে এসে শঙ্কর নাম উল্লেখ করে শিব পূজা করবে। রাত্রে শুধু গোমূত্র পান করে উপবাসী থাকবে। এতে অতিরাত্র যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ হবে। পৌষ মাসে একই কাঠে দন্ত ধাবন করে শম্ভু নাম উল্লেখ করে শিব পূজা করবে। রাতে ঘৃত মাত্র ভোজন করে উপবাস করলে আট বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হবে। মাঘ মাসে বটের কাঠে দন্ত ধাবন করে মহেশ্বর নামে শিব পূজা ও রাত্রে গব্য দুগ্ধ পান করে উপবাস, তাতে আটটি গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হবে। ফাল্গুন মাসে দন্ত ধাবন ও পানীয় একই, শিব পূজা মহাদেব নাম উল্লেখ করে। এতে আটটি রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হবে। চৈত্র মাসে উড়ুম্বর কাঠে দন্তধাবন, নির্জনে ভোজন এবং স্থাণু নামে শিব পূজা। তাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হবে। বৈশাখ মাসে শুধু কুশোদক পান করে থাকবে এবং শিব নামে শিব পূজা করবে। তাতে আটটি নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্লক্ষ কাঠে দন্ত ধাবন এবং পশুপতি নামে শিব পূজা। গো শৃঙ্গ প্রক্ষালনের জল পান করে শিবের নিকটে নিদ্রা যাবে। তাতে কোটি গো দানের পুণ্য হবে। আষাঢ়ে উগ্র নামে শিবের পূজা ও শুধু গোময় ভোজন করবে। এতে সৌত্রামণী যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ হবে। শ্রাবণ মাসে পলাশ কাঠে দন্ত ধাবন, শর্ব নামে শিবের পূজা, আর শুধু অর্ক পত্র অর্থাৎ আকন্দের পাতা খেয়ে থাকবে। তাতে এক কল্প শিবের পুরবাস হবে। ভাদ্র মাসের

অষ্টমীতে ত্র্যম্বক নাম উল্লেখ করে শিব পূজা করবে, আর সেদিন শুধু বিল্বপত্র ভোজন করবে। তাতে সমস্ত দীক্ষার ফল লাভ হবে। আশ্বিন মাসে জম্বু কাষ্ঠে দন্ত ধাবন, ঈশ্বর নামে শিব পূজা এবং শুধু তণ্ডুলের জল আহার। এতে পৌণ্ডরীক যজ্ঞের আট-গুণ ফল লাভ হবে। কার্তিক মাসের অষ্টমীতে ঈশান নাম উল্লেখ করে শিব পূজা এবং শুধু পঞ্চগব্য পান। এতে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল। এক বৎসর শেষ হলে শিবভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণদের ঘৃতপ্লুত মধু-যুক্ত পায়স ভোজন করিয়ে যথাশক্তি সোনা ও বস্ত্র দান করতে হবে। শিবের উদ্দেশে দধ্যন্ন, চন্দ্রাতপ, ধ্বজ, চামর, ঘণ্টা, কালো পয়স্বিনী গরু, কঞ্চুক বস্ত্র, তামার কলস, অলঙ্কৃত বৃষ, বস্ত্র ও অলঙ্কার দক্ষিণা দিতে হবে। এর ফলে শত-কোটি কল্পেরও কিছু বেশি শিবলোকে বাস করা যায়। পুরাকালে বিশ্বস্রষ্টা শিব ভগবতীর নিকটে এই কৃষ্ণাষ্টমী ব্রতের কথা বলেছিলেন। আমি তা সম্যক জানি।

সূত বললেন, নন্দীশ্বরের নিকটে নারদ এই ব্রতের কথা শুনে বদরিকাশ্রমে গেলেন। এই ব্রত-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করলে তার অতিসত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

শ্রবণ দ্বাদশী ব্রত

সূত বললেন, দেবদেব বিষ্ণুর এক পাপ নাশক যজ্ঞের কথা সূর্য যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে কীর্তন করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, কশ্যপনন্দন, জয়া ও বিজয়া ব্রতের ফল স্বরূপ ও পুণ্যের কথা বলুন।

সূর্য বললেন, দ্বাদশী বিষ্ণুর প্রিয়। সেই দ্বাদশী শুক্লপক্ষে শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত হলে বিজয়া এবং ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত হলে তা জয়া দ্বাদশী নামে অভিহিত হয়। দ্বাদশীতে উপবাস করলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। স্নান করে বস্ত্র ও পুষ্পাদি দিয়ে বিষ্ণু পূজা করলে যে কোন ফল লাভ হয়। একবার জপ করলে দশ হাজার জপের ফল পাওয়া যায়। একটি ঋক মন্ত্র পাঠ করলে সমগ্র ঋগ্বেদ

পাঠের ফল লাভ হয়। দান হোম উপবাস ও ব্রাহ্মণ ভোজনেরও সহস্র গুণ ফল। এই তিথিতে স্নান ও উপবাস করে বিষ্ণু পূজা করলে সাত জন্মের পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে বাসের অধিকারী হওয়া যায়। বিষ্ণুর পাদদ্বয় মৎস্য মন্ত্রে, কটি কূর্ম মন্ত্রে, উদর বরাহ মন্ত্রে, বক্ষস্থল নরসিংহ মন্ত্রে, কণ্ঠ বামন মন্ত্রে, ভুজদ্বয় রাম ও ভৃগুরাম মন্ত্রে, মুখ বলরাম মন্ত্রে, নাসিকা প্রদ্যুম্ন মন্ত্রে, নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ নামে, মস্তক বুদ্ধ নামে, কেশ কল্কী নামে এবং সর্বাঙ্গ বামন নামে পূজা করবে। দিনে গোবিন্দ ও রাতে গোপাল নামে আরাধনা করবে। দশাবতার মন্ত্রে নৈবেদ্য দিয়ে নারায়ণের পূজা করবে। পূজার পর গীত বাদ্য করে রাত্রি জাগরণ করবে। প্রভাত হলে শাস্ত্রজ্ঞ কুটুম্বভরণাসক্ত ব্রাহ্মণকে দান করবে। আচার্য থাকলে অন্য কাউকে দান করবার প্রয়োজন নেই। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দান করলে সমফল, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করলে দ্বিগুণ ফল ও আচার্যকে দান করলে সহস্র গুণ ফল লাভ হয়। আচার্য থাকতে যে অপরকে দান করে তার দানের ফল হয় না ও দুর্গতি লাভ হয়। বিদ্যাহীন বা বিদ্যাসম্পন্ন যাই হোন, গুরুই জনার্দন। তিনি সৎ পথস্থ বা অসৎ পথস্থ যাই হোন, গুরুই সর্বকালের গতি। গুরু নিকটে এলে যে পুরুষাধম তাঁর প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করে, তার কোটি জন্ম নরক ভোগ হয়। এই ভাবে ভক্তি সহকারে পৌরাণিক মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করবে এবং ব্রাহ্মণও মন্ত্র পড়ে দান প্রতিগ্রহ করবে। তারপর ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে যথাশক্তি দক্ষিণা দেবার পর ঘৃত বিন্দু খেয়ে ভোজন করবে। এই ব্রতের ফলে ব্রহ্মার প্রলয় কাল পর্যন্ত স্বর্গে পূজা পাওয়া যায়। স্বর্গ ভোগের পর মহৎকুলে তার পুনর্জন্ম হয়। যে এই শ্রবণ দ্বাদশীর ব্রত কথা পাঠ করে বা শোনে, সেও পাপমুক্ত হয়।

অনঙ্গ ত্রয়োদশী ব্রত

সূত বললেন, আর একটি মহাপাতকানাশক সমস্ত দুষ্টের উপসমকারক মঙ্গলজনক ও সর্বৈশ্বর্যপ্রদ ব্রতের কথা বলছি, শুনুন। এই ব্রতের প্রভাবে মানুষ যা কামনা করবে, তাই পাবে। পুরাকালে রুদ্র কামকে এই তিথিতে দগ্ধ করেন বলে এর নাম অনঙ্গ ত্রয়োদশী। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশীতে বিধিমতো স্নান ও উপবাস করে নানা-বিধি পুষ্প ধূপ নৈবেদ্য ও ফল দিয়ে দেবদেব চন্দ্রশেখরের পূজা করবে। পৌষ মাসে শিবের যোগেশ্বর নামে পূজা করে শুধু চন্দন আহার করে থাকলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। মাঘ মাসে নাটেশ্বর নামে শিবের পূজা করে শুধু মুক্তাচূর্ণ আহার করে থাকলে বহু সুবর্ণ যজ্ঞের শত গুণ ফল লাভ হয়। ফাল্গুন মাসে বীর নামে শিবের পূজা করে রাত্রে শুধু কট বা তৃণবিশেষের ফল আহার করে থাকলে গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং দেবরাজের মতো আনন্দ ভোগ করা যায়। চৈত্র মাসে রত্নে নির্মিত প্রতিমায় শিবের সুরূপ নামে পূজা করে রাত্রে শুধু কর্পূর খেয়ে থাকলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বৈশাখ মাসে দেবদেবের মহারূপ নামে পূজা করে শুধু জাতী ফল আহার করে থাকলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রদ্যুম্ন নামে শিবের পূজা করে রাতে শুধু লবঙ্গ খেয়ে থাকলে বাজপেয় যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ হয়। আষাঢ় মাসে শিবের উমাভর্তা নামে পূজা করে শুধু তিলোদক খেয়ে থাকলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। শ্রাবণ মাসে পরমেশ্বরকে শূলপাণি নামে পূজা করে শুধু গন্ধ জল পান করে থাকলে অগ্নি-ষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ভাদ্র মাসে শিবকে সদ্যোজাত নামে পূজা করে শুধু অগুরু খেয়ে থাকলে সর্ব যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আশ্বিন মাসে শিবের ত্রিদশাধিপতি নামে পূজা করে সুবর্ণ জল পান করে থাকলে কোটি স্বর্ণ দানের ফল লাভ হয়। কার্তিক মাসে শিবকে বিশ্বেশ্বর নামে পূজা করে শুধু মদন ফল আহার করে

থাকলে কামের ন্যায় দ্যুতি সম্পন্ন হয়। প্রতি মাসের দন্ত কাষ্ঠ মল্লিকা, খদির, প্লক্ষ, অপামার্গ, জম্বু, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, মালতী, বট, কদম্ব, দূর্বা ও শিরীষ। প্রথম মাসে মালতী পুষ্প, তারপর মরুবক, করবীর, কুন্দ, অর্কপত্র, মন্দার, মল্লিকা, কদম্ব, যূথী, ধুস্তুর, পদ্ম ও দূর্বাঙ্কুর। ওদন, কৃশর, শর্করা, মোদক, কংসার, যাবক, সোহালিকা, পঞ্চখাদ্য, ঘৃতপুর, শালিভক্ত ও গুণক এইগুলি ক্রমিক নৈবেদ্য। কার্তিক মাসে নানাবিধ অন্ন নৈবেদ্য দেবে। এর পর পূজা-নাম কার্তন করছি। শঙ্করায় নমঃ মন্ত্রে পাদ পূজা, গৌর্যৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, শিবায় মন্ত্রে গুল্‌ফ পূজা, শিবায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, শম্ভবায় উদ্ভবায় মন্ত্রে জানু পূজা, শিবায়ৈ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, মন্মথনাশায় মন্ত্রে কাটপূজা, মদনায়ৈ মন্ত্রে সুরেশ্বরীর পূজা, ভবায় মন্ত্রে নাভি পূজা, ভবান্যৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, দেবাধিদেবায় মন্ত্রে বক্ষ পূজা, অপর্ণায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, বিশ্বেশ্বরায় মন্ত্রে স্তন পূজা, সুরকান্ত্যৈ নমো নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, ভীমোগ্ররূপায় মন্ত্রে কণ্ঠ পূজা, গিরিজায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, ত্রিদশবন্দ্যায় মন্ত্রে স্কন্ধ পূজা, ত্রিশূলিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, ধূর্জটয়ে মন্ত্রে বাহুপূজা, ধূসরায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, শূলধরায় মন্ত্রে হস্ত-পূজা, শূলিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, বামদেব মন্ত্রে দেবদেবের মুখ পূজা করে তার বাম ভাগে বামায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা। কপালিনে মন্ত্রে নাসা পূজা, মৃড়ান্যৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, ইন্দুধারিণে মন্ত্রে ললাট পূজা, অলকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, ত্রিনেত্রায় নমঃ মন্ত্রে নেত্র পূজা, ত্র্যক্ষ্যৈ মন্ত্রে দুর্গা পূজা, গঙ্গাধরায় মন্ত্রে শিব পূজা, কাত্যায়নী মন্ত্রে দুর্গা পূজা, ব্যোমকেশায় নমঃ মন্ত্রে কেশ পূজা ও কেশিন্যৈ নমো নমঃ মন্ত্রে দুর্গা পূজা করবে। এই ভাবে সংবৎসর পূর্ণ হলে সোনার শিব নির্মাণ করিয়ে শুক্ল বস্ত্রে আচ্ছাদিত কলসের উপর তাম্রপাত্রে সেই সোনার শিব স্থাপন করে যথাবিধি পূজা করবে। তারপর আচার্যকে তা দান করবে, ব্রাহ্মণকে দেবে দক্ষিণার সঙ্গে জলপূর্ণ কুম্ভ। ভক্তি সহকারে তাদের ভোজন করাবে। এই ভাবে অনঙ্গ ত্রয়োদশী ব্রত করলে রাজ্য-

সৌভাগ্য ও চিরজীবী পুত্র লাভ হয় এবং অন্তে শিবলোক প্রাপ্তি হয়।

বর্ণাশ্রম আচার বিধি

ঋষিরা বললেন, সূত, আপনার জ্ঞানের কথায় সনাতন শিবের প্রতি আমাদের নিত্য ভক্তি জন্মেছে। এবারে আপনি বর্ণাশ্রম আচার বিধি বলুন।

সূত বললেন, সুব্রতগণ, পূর্বে সূর্য মনুকে যা বলেছিলেন সেই ভাবেই আমি চতুর্বর্ণের আচার বলছি। এই আচার অনুসারেই কর্মযোগরত হলে শিবের আরাধনা করা যায়, অন্যভাবে নয়— বেদে এই রকমের উপদেশ আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ। এদের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ দ্বিজ। গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস দ্বিজদের এই চার আশ্রম। এর অতিরিক্ত আশ্রম নেই। সব আশ্রমেই দণ্ড ধারণ বিহিত, দণ্ড না থাকলে তাকে আশ্রমী বলা যায় না। ব্রহ্মচারী দণ্ড কৃষ্ণাজিন ও মেখলা ধারণ করবে, মুণ্ডিত কেশ শিখাধারী অথবা জটাধারী হবে। ভিক্ষায় জীবিকা নির্বাহ তার কর্তব্য। সায়াহ্নে ও প্রাতে নিত্য অগ্নিকার্য করবে। তা না করলে পতিত হতে হয়। স্নান তর্পণ দেবপূজা এবং বৃদ্ধ পরম্পরায় অভিবাদন ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। যিনি অভিবাদনের উত্তর দেন না, তাঁকে অভিবাদন করতে নেই, তিনি শূদ্রবৎ। যে গুরুর নিকটে আধ্যাত্মিক, বৈদিক ও জ্ঞান লাভ করা যায়, তাঁকেই সর্বাগ্রে অভিবাদন করবে। উপদেষ্টা বয়সে ছোট হলে তিনি আসবা-মাত্র উঠে 'এই আমি' এই কথা বলবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে কোন প্রকারে অভিবাদন করবে না।

ব্রহ্মচর্য পরায়ণ ব্যক্তি শিষ্ট ব্যক্তির গৃহে নিত্য ভিক্ষা আহরণ করে গুরুকে নিবেদন করে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে মৌন হয়ে ভোজন করবে। নিত্য ভিক্ষা লব্ধ বস্তু দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করা ব্রহ্মচারীর

কর্তব্য। কোন এক জনের অন্ন ভোজন ব্রহ্মচারীর অনুচিত এবং ভিক্ষা তার উপবাসের তুল্য বলে বিবেচিত। অতিভোজন রোগকর, আয়ুর হানিকর, অস্বর্গ্য, অপুণ্য ও লোক-বিদ্বিষ্ট। তাই অতিভোজন পরিত্যাগ করবে। যে দিকে সূর্য উদিত হয়, সেই দিকে মুখ করেই অন্ন ভোজন করবে। উত্তর মুখে ভোজন করা নিয়ম নয়। পা ধুয়ে আচমনের পর সদাশিবকে স্মরণ করে মৌন হয়ে ভোজন করবে।

সর্বদা জিতেন্দ্রিয়, অক্রোধ, পবিত্র ও সংযতাত্মা হবে এবং মধুর ও হিতবাক্য বলবে। পরের অনিষ্ট, ক্রূরতা, কাম, লোভ, দ্যূতক্রীড়া, জনাপবাদ, স্ত্রীবিলাস, হিংসা, গন্ধ, মালা, রস, ছত্র ও দন্তধাবন ব্রহ্মচারীর বর্জনীয়। ব্রহ্মচারী নিত্য অধ্যয়ন করবে। তার পূর্বে গুরুর পাদ গ্রহণ করবে এবং অধ্যয়নের সময়ে গুরুর মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। বেদই সকল প্রাণীর সনাতন চক্ষু এবং পুরুষের শ্রেয়স্কর, সূর্য এই কথা বলেছেন। যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করে অন্য বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে ব্রাহ্মণ নয় এবং তার নরক প্রাপ্তি হয়। যে বিদ্যাধ্যয়ন না করেই আচারপ্রবৃত্ত হয়, তার আচারে ফল লাভ হয় না। সে বিপ্র হয়েও শূদ্রের তুল্য। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও অন্য বৈদিক কর্ম যা কিছু আছে, তা অধ্যয়ন-হীন ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়। তার পুত্র অধ্যয়ন সম্পন্ন হলেও তাকে শূদ্র পুত্র বলে জানবে।

দ্বিজরা একবেদ দ্বিবেদ ত্রিবেদ বা চতুর্বেদ অধ্যয়ন করে গুরু-দক্ষিণা দিয়ে গৃহী হবে। তখন সেই ব্যক্তি রূপ লক্ষণ সম্পন্ন এমন কন্যাকে বিবাহ করবে যে সগোত্র সমান প্রবর ও মাতামহ গোত্র নয়। মাতৃপক্ষের পঞ্চম ও পিতৃপক্ষের সপ্তম পরিত্যাগ করে সৎকুল সম্ভূত নীরোগ ও সুরূপা কন্যা বিবাহ করবে। যে মাতৃপক্ষের পঞ্চমের মধ্যে ও পিতৃপক্ষের সপ্তমের মধ্যে বিবাহ করে, সে গুরুতল্প গমন পাপে পাপী। ব্রাহ্ম বা দৈব বিবাহই কর্তব্য। অনেকে আর্য বিবাহকেও ধর্ম বিগর্হিত মনে করেন। গৃহী বাঁশের লাঠি, অন্তর্বাস, বস্ত্র, উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত দ্বয়, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা যুগল বা উপানৎ,

সোনার কুণ্ডল নিত্য ধারণ করবে। ছিন্নকেশ, ছিন্ননখ, শুচি, শুক্ল-বস্ত্রধারী, সুগন্ধ-যুক্ত ও প্রিয়দর্শন হবে। বিভব থাকলে জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিধান করবে না। নিষিদ্ধ তিথি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ পত্নীর ঋতুকালে উপগত হবে। ষষ্ঠী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দশীতে, বিশেষভাবে জন্ম নক্ষত্রে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে। আবসথ্য অগ্নি গ্রহণ করবে, নিত্য হোম করবে এবং বেদোক্ত নিত্য কর্ম অনলস ভাবে করবে। তা না করলে ভীষণ নরকে আশু নিপাতিত হবে। গৃহকর্ম ও সন্ধ্যা উপাসনা করবে, তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে সখ্য করবে। সর্বদা ধনীকেই আশ্রয় করবে। বিদ্বান ব্যক্তি পাপ গোপন বা ধর্ম খ্যাপন অর্থাৎ প্রচার করবে না। বয়স কর্ম অর্থ শাস্ত্রজ্ঞান ও বংশের অনুরূপ হয়ে বুদ্ধিযোগ্য আচরণ করে সর্বদা বিচরণ করবে। যা শ্রুতি স্মৃতি সম্মত ও সাধুজন সেবিত, সেই আচারই পালন করবে।

এইবারে সাধু কাকে বলে তাই বলছি। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থান মধ্য দেশ নামে অভিহিত। সেখানে উৎপন্ন দ্বিজরাই সাধু। তাঁদের অনুষ্ঠিত ও শ্রুতি স্মৃতি সম্মত যে আচার, দেবদেব সূর্য তাকেই সদাচার বলেছেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন দেশ পবিত্র, অন্য সব দেশ নিন্দিত। এই কটি পবিত্র দেশেই বাস করা উচিত। ধর্মাভিলাষী ব্রাহ্মণেরা এইখানেই ধর্ম সভা নির্ণয় করেছেন এবং অন্যত্র নয়, সূর্য এই কথা বলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, গুর্জর, আভীর, কোঙ্কন, দ্রাবিড়, দক্ষিণাপথ, অন্ধ্র ও মগধ দেশ বর্জনীয়। নিত্য স্বাধ্যায়শীল, পঞ্চযজ্ঞ পরায়ণ, শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, লোভ মোহ বর্জিত, গায়ত্রীজপরত, শিবভক্তি পরায়ণ, শ্রাদ্ধকৃৎ, দানরত, ক্ষমাযুক্ত ও দয়ালু গৃহস্থই প্রকৃত গৃহস্থ। গৃহ থাকলেই গৃহস্থ হওয়া যায় না। শরীর না থাকলে পূজা করা যায় না, এই জন্যই ভগবান গিরিজাপতির রূপ ধারণ করেছেন। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী অথবা যতি শিবভক্তি কর্ম করলেই তার বন্ধন মুক্তি হয়।

সূত বললেন, অপ্রিয় অনৃত বা মর্মভেদী বাক্য বলবে না। প্রাণী হিংসা ও বেদ নিন্দা করবে না। যিনি সর্ব ভূতেশ্বর, সর্ব কর্মের সাক্ষী ও স্মৃতিমাত্রে মোক্ষদাতা, সেই শিবের নিন্দা করবে না। শাস্ত্রে মহাপাতকীরও প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু যে শিবের নিন্দা করে তার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। পরের জল, তৃণ, শাক, মাটি বা কাঠ অপহরণ করলেও মানুষের নরক ভোগ হয়। নিত্য যাচক হবে না, পর যাচিত বস্তু যাচ্ঞা করবে না। কারণ এই দুর্মতি যাচককে দাতার প্রাণ অপহারী বলা যায়। দেবতার পূজার জন্য বিনা অনুমতিতে শুধু পুষ্প চয়ন করা যায়, কিন্তু নিত্য একজনের বাড়িতে ঐ ভাবে পুষ্প চয়ন করা যায় না। বিষয়জ্ঞ বিপ্র তৃণ, কাষ্ঠ ফল ও পুষ্প প্রকাশ্যে হরণ করতে পারে, কিন্তু তা শুধু ধর্মার্থে। অন্যথায় সে পতিত হবে। ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত হলে তিল মুদ্গ ও যবাদি মুষ্টিমাত্র গ্রহণ করতে পারে, অন্য সময়ে ধার্মিক ব্রাহ্মণেরা তা গ্রহণ করবেন না। মিথ্যা ভাষণ, পরদার গমন ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করলে এবং বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান না করলে বংশ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ তপোবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ এই তিন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব পূর্ব ব্যক্তি অভিবাদনের যোগ্য, অভাবে উত্তরোত্তর অভিবাদনীয়। অর্থাৎ সর্বাগ্রে জ্ঞানবৃদ্ধ, তারপর তপোবৃদ্ধ এবং সবার শেষে বয়োবৃদ্ধকে অভিবাদন করতে হয়। অগ্নিহোত্রের ভস্ম বা শিবাগ্নিজনিত ভস্ম দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ ব্রাহ্মণের সব কাজেই করা কর্তব্য। মূর্খ, পতিত ও যারা বেদ ও ঈশ্বরের নিন্দা করে, তাদের সঙ্গে বাস করা কদাচ উচিত নয়। ক্রূরতা, শুষ্ক বৈর ও বিবাদ সতত বর্জনীয়। বৎস গরুর দুগ্ধ পান করছে বা পরের ক্ষেত্রে গরু বিচরণ করছে, নিবারণের অভিপ্রায়ে কাউকে তা বলবে না। অনেকের সঙ্গে বা কৃতিদের সঙ্গে বিরোধ করবে না। পক্ষ তিথি কীর্তন করবে না, নক্ষত্র নির্দেশ করবে না, পাপী বা নিষ্পাপ কারও পাপের কথা বলবে না। সত্য নিন্দায় নিন্দার সমান

দোষী হয়, অসত্য নিন্দায় দ্বিগুণ দোষী হয়। মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির রোদনে যত অশ্রুপাত হয়, তার সমস্ত মিথ্যা অপবাদকারীর পুত্র ও পশু বিনষ্ট করে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় বা গুরুপত্নী গমন, এই সব পাপের বিশুদ্ধি জ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন, কিন্তু মিথ্যা-অপবাদকারীর কোন বিশুদ্ধি নির্ণীত হয় নি। অভিমান, মদ, শোক ও দ্বেষ বর্জনীয়। ধনাভিলাষী ব্যক্তি রবিবারে ভাজা কিছু খাবে না, লবণ ও তৈলমর্দনও ত্যাগ করবে। কাউকে পীড়া দেবে না, পুত্র ও শিষ্যকে তাড়ন করতে পারবে। নদীতে নদী বলবে না, পর্বতে পর্বত বলবে না, প্রবাসে ও ভোজনে সহযাত্রীকে পরিত্যাগ করবে না। মাথায় তেল মেখে অবশিষ্ট তেল অন্য অঙ্গে মাখবে না। সর্প ও শস্ত্র নিয়ে খেলা করবে না। নিজের ইন্দ্রিয় স্পর্শ করবে না। দুই হাতে শির কণ্ডূয়ন করবে না। সাধারণ লোকের রচিত স্তবে দেবতার সন্তোষ বিধানে উদ্যত হবে না। নূতন রৌদ্র ও চিতাধূম অসেব্য। অশুচি অবস্থায় অগ্নি স্পর্শ বা দেবতা ও ঋষিদের নামোচ্চারণ উচিত নয়। বিশ্বেশ্বরকে ব্রহ্মাদির সমান এবং পার্বতীকে অপর শক্তির সমান বলবে না। এ কাজ করলে অস্পৃশ্য হতে হবে। মঙ্গল প্রার্থী দ্বিজরা শিব ও পার্বতীকে সব সময়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে। পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্ভাষণ ও অযাজ্য যাজন উচিত নয়। প্রদক্ষিণ না করে দেবালয়ে যাবে না। যোগী, সিদ্ধ, ব্রতী ও যতিদের নিন্দা কদাচ করবে না। গুরুর ছায়া বা আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করবে না।

প্রত্যহ স্নান করবে। জলে অবগাহনকে বারুণ স্নান ও মন্ত্র পাঠ করে চিত্ত শুদ্ধিকে মন্ত্র স্নান বলে। ভস্ম দিয়ে যে স্নান, তা আগ্নেয়। গোখুরোদ্ধত ধূলিতে স্নান বায়ব্য। আতপ ও বৃষ্টি যোগে স্নানকে দিব্য স্নান বলে। অন্যবিধ স্নানও আছে, যা আর্দ্র বস্ত্রে সম্পাদন করতে হয়। শিব চিন্তা মানস স্নান। এই সমস্ত স্নানের মধ্যে মানস স্নানই উত্তম। যথা বিধি স্নান আচমন ও তর্পণ করে রুদ্ররূপী সূর্যকে অঞ্জলি দেবে, তারপর গায়ত্রী জপ করবে। গায়ত্রীই ত্রিবর্ণের পরম

গতি। দেবদেব মহেশ্বরই গায়ত্রীর পরম তত্ত্ব, এই বিবেচনা করে জপ করলে গায়ত্রীর ফল লাভ হয়। শিবরূপী গায়ত্রীকে যে অন্য প্রকার মনে করে, তার কল্প সংখ্যায় নরক ভোগ হয়। গায়ত্রীর পাদ চতুষ্টয়ই চতুর্বেদ, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও ঈশ্বর এদের দেবতা। এই ভাবে জেনে বেদমাতা গায়ত্রী জপ করলে নিত্য শেব জ্যোতি প্রতিভাত হয়। বেদ-ইতিহাস সম্ভূত স্তব ও মন্ত্রে রুদ্ররূপী আদিত্যের উপাসনা করবে। ব্রহ্ম যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য পাবমান সূক্ত জপ, বিশেষভাবে শতরুদ্রিয় জপ সমাহিত চিত্তে করবে। তারপর মৌনী হয়ে গৃহে ফিরে মানস্তোক মন্ত্র ও ষড়ক্ষর মন্ত্রে শিবের পূজা করবে। ষড়ক্ষর মন্ত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট মন্ত্র যে চতুর্বেদে নেই, তা সূর্যই বলেছেন। শিব পূজা না করে ব্রাহ্মণ ভোজন করবে না। ভবদেব বিশ্বেশ্বরই সকলের একমাত্র গতি, অন্য কেউ নয়, ইহাই বেদবাক্য।

শ্রদ্ধা সহকারে গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবে। পঞ্চযজ্ঞ পরিত্যাগ করলে আশ্রম ভ্রষ্ট হতে হয়। দেব যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ, পিতৃ যজ্ঞ, মানুষ যজ্ঞ ও ব্রহ্ম যজ্ঞ এই হল পঞ্চ যজ্ঞ। দেবযজ্ঞের বৈশ্ব-দেবাবশিষ্ট বলি সব ভূতের উদ্দেশ্যে দেবে, তারই নাম ভূত যজ্ঞ। পিতৃগণের উদ্দেশে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে, এই নিত্য শ্রাদ্ধই পিতৃ যজ্ঞ। যথাশক্তি অন্ন ব্রাহ্মণকে দেবে, অতিথি পূজা করবে। সূর্য বলেছেন, অতিথিই স্বর্গের সোপান। শিব ভাবান্বিত হয়ে ব্রতের অনুষ্ঠান বা ভিক্ষা দান করলে তার অক্ষয় ফল লাভ হয়। বেদাভ্যাস ও বেদ বিষয় রত হবে। তারই নাম ব্রহ্ম যজ্ঞ। ব্রহ্ম যজ্ঞে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। আশ্রম ধর্মানুসারে এই সব অনুষ্ঠান করে আহার করতে হয়। তা না করে অন্ন ভোজন করলে পরলোকে শূকর যোনি প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি থাকলে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বা অন্য কোন যজ্ঞের প্রয়োজন নেই।

শ্রাদ্ধবিধি

সূত বললেন, অমাবস্যা, অষ্টকা, দুই অয়ন সংক্রান্তি, বিষুব সংক্রান্তি ও ব্যতীপাত যোগে, বিশেষত তীর্থে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। পরীক্ষা করে বেদ বেদাঙ্গ পারগ শিবজপ-নিরত শিবভক্ত ব্রাহ্মণদের এবং তাঁদের অভাবে সদাচার রত ব্রাহ্মণদের শিববোধে শ্রদ্ধা সহকারে ভোজন করাবে। অথবা শিব ভক্তি পরায়ণ একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। শ্রাদ্ধ বাসরে শ্রাদ্ধ কর্তা ও শ্রাদ্ধ ভোক্তা স্ত্রী গমন করলে ব্রহ্মহত্যার পাপী হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন করবে, সে সেদিন কলহ ক্রোধ ও পুত্র ভার্যাদি তাড়ন করবে না। ব্রাহ্মণ এলে তার পাদ প্রক্ষালন করবে। ব্রাহ্মণের চতুরস্র মণ্ডল, ক্ষত্রিয়ের ত্রিকোণ মণ্ডল, বৈশ্যের বর্তুল মণ্ডল ও শূদ্রের অভ্যুক্ষণ মাত্রই মণ্ডল। সেই শুভ মণ্ডলে উপবেশন করিয়ে শ্রাদ্ধ করবে। অগ্নি না থাকলে ব্রাহ্মণের হাতেই হোম করবে। শিব সমীপে বা গোষ্ঠে পিণ্ড দান করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে, অনেকেরই এই অভিপ্রায়। কিন্তু ইহা সূর্য সম্মত নয়। পূর্বে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ ভোজন ও তার পর পিণ্ড দানই সূর্যের অভিপ্রেত। পিতৃলোকের প্রীতির উদ্দেশে শ্রাদ্ধে বিবিধ মাংস দান অক্ষয় ফলজনক হয়। শ্রাদ্ধে মাংস দান নিষিদ্ধ নয়। যে দ্বিজ পিতৃ কার্যে নিযুক্ত হয়ে মাংস ভোজন করে না, পরলোকে তার নরক প্রাপ্তি হয় এবং পরজন্মে সে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। এর পর ধর্ম-শাস্ত্র, পুরাণ, অথর্ব-শিব নামে বেদের অংশ বিশেষ, শতরুদ্র ও পুরুষ সূক্ত ব্রাহ্মণদের শোনাবে। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রাদ্ধ করলে বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর হব্যকব্যভোজী নীললোহিত প্রীত হয়ে থাকেন।

বাণপ্রস্থাদি ধর্ম

সূত বললেন, এইবারে বাণপ্রস্থ ধর্মের কথা বলছি। নিজের দেহ পলিতাদি দূষিত দেখে পত্নীকে পুত্রদের নিকটে রেখে বনগমন করবে। ফলমূল আহার, নিত্য পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও শিবভক্তিকে

অতিথি পূজাই তাঁর কর্তব্য, এই হল বেদবাক্য। মাত্র আট গ্রাস ভোজন, চীর বস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, ত্রৈকালিক স্নান ও স্বাধ্যায় বাণ-প্রস্থধর্মীর কর্তব্য। সর্বভূতে দয়া, রাত্রে অনাহার, ও গ্রাম্য ফলমূল বর্জনও তাঁর কর্তব্য। পত্নীর সঙ্গে বাণপ্রস্থে গেলে সর্বদা ব্রহ্মচারী থাকবে, বনস্থ দ্বিজ পত্নী গমন করলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় এবং পত্নীর গর্ভ সঞ্চার হলে চণ্ডাল তুল্য হয়। বাণপ্রস্থধর্মী খাদ্য বণ্টন করে সর্বভূতে দয়া প্রকাশ করবে। নিন্দা, নিদ্রা, মিথ্যা কথা ও আলস্য ত্যাগ করবে। প্রয়োজন হলে গলিত পত্র মাত্র ভোজন করে বা প্রাজাপত্যাদি ব্রতাবলম্বী হয়ে জীবন রক্ষা করবে। নিত্য শিব পূজা করবে ও শিবের ধ্যান পরায়ণ হবে। এই ভাবে বাণপ্রস্থ ধর্ম পালন করলে দেহান্তে পরম গতি ও নিত্যপদ লাভ হয়।

যখন সব কিছুর প্রতি বৈরাগ্য জন্মাবে, তখন বিজ্ঞ ব্যক্তির সন্ন্যাস গ্রহণ কর্ত্তব্য। নতুবা নয়। মনে বৈরাগ্য না এলে সন্ন্যাস গ্রহণ করে পতিত হতে হয়। সন্ন্যাসী বেদান্ত অভ্যাসরত। শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্মম, নিত্য নির্ভয়, দ্বন্দ্বাতীত ও নিঃসঙ্গ হবেন। তিনি মুণ্ডিতকেশ ও জীর্ণ কৌপীনধারী বা বিবস্ত্র হবেন। একদণ্ড বা ত্রিদণ্ড ধারণ করবেন, এই বেদবাক্য। সন্ন্যাসী শত্রু মিত্রে সমদর্শী ও মান-অপমানে সমভাবাপন্ন হবেন। ভিক্ষা করে জীবন রক্ষা করবেন, এক জনের অন্ন ভোজনে কদাচ নিরত হবেন না। যে যতি একজনের অন্ন ভোজন করেন অথবা লম্পট হন, ধর্ম শাস্ত্রে তাঁর কোন নিষ্কৃতি নেই। তিনি ত্রিকাল স্নান করবেন, সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখবেন, নিত্য প্রণব জপ করবেন এবং মোক্ষ শাস্ত্র চিন্তা করবেন। তিনি নিত্য বেদান্ত পাঠ করবেন এবং বেদান্তের অর্থ চিন্তা করবেন। নিজেকে সনাতন মহেশ্বর ব্রহ্ম রূপ বলে ভাববেন। সেই যোগযুক্ত মহামুনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্ম-স্বরূপ হয়ে অচিরে পরম ব্রহ্ম লাভ করবেন। দ্বিজ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই পাপ মুক্ত হন এবং বিরাট পদযজ্ঞ নিরত সেই জ্ঞানী মুক্তি লাভ করেন।

চার আশ্রমের সম্পূর্ণ বিধি আমি আপনাদের অশেষ প্রকারে বললাম। এই আশ্রম ধর্ম সযত্নে পালন করলে শিব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন।

সৃষ্টির কথা

ঋষিরা বললেন, সূর্য যে ভাবে সৃষ্টি, মন্বন্তর, বংশ ও বংশানুচরিত বলেছিলেন এবং প্রলয় কী ভাবে হয়, তা আমাদের বলুন। ব্যাসের কাছে আপনি তো সবই শুনেছেন।

সূত বললেন, আপনারা সকলেই মহেশ্বরের স্বেচ্ছা লীলার কথা শুনুন। এই চরাচর সমস্তই মহাদেবের স্বরূপ। বিশ্ব বিবর্তনায় ও শিবই বিবর্তন কর্তা। তিনিই প্রকৃতি রূপে সঙ্কোচ বিকাশ শালী। পুরুষরূপী শিবের সংসর্গে বিবর্তমান প্রকৃতি থেকেই মহতত্ত্বের উৎপত্তি। মহতত্ত্ব বিস্তৃত বীজ, তা প্রকৃতি পুরুষাত্মক। মহতত্ত্বের নামান্তর বুদ্ধি-তত্ত্ব। বুদ্ধি থেকেই স্থূলভূত পর্যন্ত সব কিছুই পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় উৎপন্ন। মহতত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের উৎপত্তি, অহঙ্কার থেকে পঞ্চ তন্মাত্রের এবং শিবের ইচ্ছায় প্রেরিত পঞ্চ স্থূলভূত পঞ্চ তন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মন অব্যক্ত এবং অহঙ্কার থেকে সম্ভূত। মন জ্ঞান ও কর্ম এই উভয় ইন্দ্রিয় স্বরূপ। সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে সত্ত্বপ্রধান দশ দেবতার সৃষ্টি এবং রাজস অহঙ্কার থেকে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। তাই তত্ত্ব চিন্তকেরা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের কথা বলেছেন। তামস অহঙ্কার থেকেই পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি। বিকৃত তামস অহঙ্কার শব্দ তন্মাত্র সৃষ্টি করে। শব্দ তন্মাত্র থেকে আকাশের উৎপত্তি। আকাশের গুণ শব্দ। বিকৃত আকাশ-সহকৃত তামস অহঙ্কার থেকে স্পর্শ তন্মাত্রের সৃষ্টি। স্পর্শ তন্মাত্র থেকে বায়ুর উৎপত্তি। বায়ুর গুণ স্পর্শ। বিকৃত পবন সহকৃত অহঙ্কার থেকে রূপ তন্মাত্রের উৎপত্তি। তা থেকেই তেজের উৎপত্তি। তেজের গুণ রূপ। বিকৃত তেজ সহকৃত অহঙ্কাব থেকে রস তন্মাত্রের উৎপত্তি। তা থেকে জলের উৎপত্তি। জলের গুণ রস।

বিকৃত জলসহকৃত অহঙ্কার থেকে গন্ধ তন্মাত্রের উৎপত্তি। তা থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি। তাই পৃথিবীর গুণ গন্ধ। শব্দ মাত্র আকাশ স্পর্শমাত্রকে আবরণ করাতে বায়ু শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণে আক্রান্ত। শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণ সমন্বিত তন্মাত্রকে আবরণ করার জন্য তেজ ত্রিগুণাত্মক। এই তিন গুণ ও রসমাত্রকে আবরণ করার জন্য জল রস রূপাদি গুণ চতুষ্টয় সমন্বিত। এই গুণ চতুষ্টয় গন্ধ মাত্রে আবিষ্ট হওয়াতে পৃথিবীতে পঞ্চতন্মাত্রই বিদ্যমান। এই জন্য পঞ্চভূতে এরা প্রবল।

পুরুষের অধিষ্ঠান ও প্রকৃতির অনুগ্রহে মহতত্ত্ব থেকে বিশেষ অর্থাৎ স্থূল পর্যন্ত সমস্ত তত্ত্বই অণ্ড সৃষ্টির উপাদান। সেই অণ্ডেই ব্রহ্মার কার্য ও করণ সংসিদ্ধ হয়। সেই প্রকৃত অণ্ডে ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই পুরুষই সর্ব-শরীর অবচ্ছেদে প্রথম বলে অভিহিত। সেই ব্রহ্মাই সর্ব ভূতের আদি কর্তা। ব্রহ্মার উৎপত্তি বিষয়ে সুমেরু গর্ভাশয়, পর্বতরা জরায়ু ও সমুদ্র গর্ভজল স্বরূপ। সুরাসুর নর-সঙ্কুল বিশ্ব তাঁর থেকেই উৎপন্ন। অণ্ডের বহির্ভাগে দশ গুণ জল এই অণ্ডকেই বেষ্টন করে আছে। সেই জল তার চেয়ে দশ গুণ বেশি তেজে আবৃত। এই তেজ তার দশ গুণ বেশি বায়ুতে আবৃত। বায়ু আকাশে আবৃত। আকাশ তামস অন্ধকারে আবৃত। অহঙ্কার বুদ্ধি তত্ত্বে আবৃত। বুদ্ধি তত্ত্ব প্রকৃতির দ্বারা আবৃত। এই সপ্তবিধ প্রাকৃত আবরণে সেই অণ্ড আবৃত। অতএব সমস্তই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এবং অনুলোম ক্রমে সবই তাতে লীন হয়। সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ কাল বিশেষে সাম্য ও বৈষম্য প্রাপ্ত হয়। সাম্যাবস্থায় প্রলয় ও বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মার ক্ষেত্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত। তির্যক ও ঊর্ধ্ব ভাগে বহু সহস্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেখানেও ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। দেবদেব মহাদেব শূলপাণির আজ্ঞায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সংহারে মহাদেবই কর্তা, এই কথা বেদে আছে। তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য, শক্তি

ও মহিমা সম্পন্ন। তাঁর কার্যকরণ বা ক্রিয়া নেই। তিনি স্বেচ্ছায় পার্বতীর সঙ্গে ক্রীড়া করেন। মুনিগণ, প্রাকৃত সৃষ্টির কথা আমি সংক্ষেপে বললাম। ইহা অবুদ্ধি অর্থাৎ অবিদ্যাখ্য প্রকৃতি থেকে সম্ভূত। এইবারে আমি ব্রহ্মোঁর সৃষ্টির কথা বলছি।

সূত বললেন, ব্রহ্মার অসংখ্য কল্প অতীত হয়েছে এবং সম্প্রতি বরাহ কল্প চলছে। আমি তার বিস্তৃত তত্ত্ব বলছি। শ্রদ্ধা সহকারে এই কথা শুনলে সকলের পাপ নাশ হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন, ব্রহ্মার এক রাত্রির পরিমাণও তাই। চার হাজার যুগে এক কল্প হয়। তিনশো ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর। ব্রহ্মার শত বর্ষের নাম পর। এই সময়েব পর সব কিছুই প্রকৃতিতে লয় হয়। এই জন্যই কালজ্ঞ ব্যক্তিরা একে প্রাকৃত প্রলয় বলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতাই প্রকৃতিতে লয় হন, এবং কালবশে পুনরায় তাঁরা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হন। এই কালই যে মহাদেব তা বেদবাক্য। দেবাদি-দেব শম্ভু অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আবার তাঁদের সংহার কর্তা হন। ব্রহ্মার পরার্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর অতীত হয়েছে এবং বর্তমান কল্প বারাহ নামে খ্যাত। এই কল্পে ব্রহ্মা বরাহ মূর্তি ধারণ করেন।

এই জগৎ বিভাগ শূন্য, তমোময় ও ঘোর একার্ণব রূপ ছিল। স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হবার পর জগৎ একার্ণব হলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্রহ্মা নারায়ণ রূপে যোগনিদ্রা আশ্রয় করে সেই সলিলে সুপ্ত হন। সত্য লোকস্থিত মুনিরা বললেন, জল নর অর্থাৎ পুরুষোত্তম থেকে সম্ভূত বলে নার শব্দের অর্থ জল এবং জলই তাঁর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলে তিনি নারায়ণ। এইভাবে সহস্র যুগ অতীত হবার পর নারায়ণ যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করে সৃষ্টি করবার জন্য ব্রহ্মা হলেন। সেই চতুর্মুখ দেবতা পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখে তাঁকে উদ্ধারের জন্য বরাহ রূপ ধারণ করলেন। ক্ষণকাল মধ্যে তিনি দংষ্ট্রা দিয়ে পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন। সনকাদি ঋষিরা তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ভগবান পৃথিবীকে ও প্রলয়-

দগ্ধ শৈলদের পূর্বের মতো স্থাপন করলেন। তারপর কল্পারম্ভে তিনি সৃষ্টির চিন্তা করলে অবুদ্ধি পূর্বক তমোময় সৃষ্টি হল। তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধ তামিস্র পঞ্চ পর্বের এই অবিদ্যা পরমাত্মা থেকে প্রাদুর্ভূত হলেন।

চিন্তাপরায়ণ অভিমানে অধিষ্ঠিত সেই দেবতা থেকে ত্বক্-সংবৃত বীজের ন্যায় সর্বতোভাবে তম-সংবৃত বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বীরুৎ ও তৃণ এই পাঁচ প্রকার সৃষ্টি হল। এরা সংজ্ঞাহীন, স্তব্ধ এবং অন্তর ও বহির্বিষয়ে জ্ঞানশূন্য। স্থাবর সৃষ্টিই মুখ্য অর্থাৎ প্রথম বলে ইহা মুখ্য সর্গ নামে অভিহিত। এই সৃষ্টিকে অনুপযোগী দেখে ব্রহ্মা অন্য সৃষ্টি করা কর্তব্য বলে মনে করলেন। এর পর তিনি তির্যক স্রোতা সৃষ্টি করলেন। বক্র পথে আহার সঞ্চরণের দ্বারা জীবিত থাকে বলে তাদের নাম তির্যক্ স্রোতা। এই হল পশু প্রভৃতি সৃষ্টি। এই জীবেরা উৎপথগামী। পিতামহ একেও অনুপযোগী মনে করে অন্য সাত্ত্বিক সৃষ্টি করলেন। এঁদের আহার সঞ্চার উর্ধ্বে, অর্থাৎ দেহের বহির্ভাগে। এ হল দেবসৃষ্টি। সৃষ্ট দেবতারা সত্ত্বপ্রকৃতি বলে সুখবহুল। তিনি পুনরায় সৃষ্টির চিন্তা করলে অব্যক্ত থেকে তমোযুক্ত রজোধিক ও সত্ত্বগুণান্বিত জ্ঞান দুঃখাদি সম্পন্ন মনুষ্য উৎপন্ন হল। মানুষের আহার সঞ্চার অধোগত হওয়াতে জীবিত থাকে। এই জন্য তারা অর্বাক স্রোতা নামে অভিহিত। ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টির চিন্তা করলে ভূত সৃষ্টি হল। এই দেবযোনি বিশেষেরা সংবিভাগ রত ক্রূর ও জ্ঞানবহুল।

এই পঞ্চসৃষ্টির কথা সূর্য কীর্তন করেছেন। ব্রহ্মা থেকে যে মহতত্ত্ব সৃষ্টি হয়, তাই প্রথম। দ্বিতীয় তন্মাত্র সৃষ্টি। ভূত সৃষ্টি এর নামান্তর। তৃতীয় ইন্দ্রিয় সৃষ্টি, ইহা বৈকারিক নামে অভিহিত। প্রাকৃত সৃষ্টি অবুদ্ধি অর্থাৎ অবিদ্যাখ্য প্রকৃতি থেকে সম্ভূত। মুখ্য অর্থাৎ স্থাবর সৃষ্টি চতুর্থ। তির্যক্ স্রোত নামে অভিহিত তির্যক্‌যোনির সৃষ্টি পঞ্চম। উর্ধ্ব স্রোত সৃষ্টি অর্থাৎ দেবসর্গ ষষ্ঠ এবং অর্বাক স্রোত বা

মনুষ্য সৃষ্টি সপ্তম। অষ্টম হল ভূত সর্গ অর্থাৎ ভূতাদি দেবযোনির সৃষ্টি। কৌমার অর্থাৎ রুদ্র ও সনৎ কুমার প্রভৃতির সৃষ্টি নবম। ইহা প্রাকৃত এবং বৈকৃত।

রুদ্রের উৎপত্তি

সূত বললেন, তারপর পদ্মযোনি ব্রহ্মা সনাতন, সনক, সনন্দন, শম্ভু ও সনৎ কুমার এই পাঁচ পুত্রকে মন থেকে উৎপাদন করলেন। শিবধ্যান পরায়ণ সেই ব্রহ্মনন্দনেরা সৃষ্টির কাজে মনোযোগ দিলেন না। তাঁরা সৃষ্টি নিরপেক্ষ হলে প্রজাপতি মোহাবিষ্ট হয়ে পরম তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারলেন না। বহুকাল অতীত হবার পর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হলেন। তখন কোন কারণ বশতঃ কোটি সূর্য সমপ্রভ প্রাণ স্বরূপ হর ব্রহ্মার ললাট থেকে উদ্ভূত হলেন। কমল-যোনিকে রোদন করিয়ে তাঁর ললাট ভেদ করে নির্গত হওয়ায় হরের নাম হল রুদ্র। তাঁর আর সাতটি নাম ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। অবনি, সলিল, অনল, অনিল, গগন, তরণি, শশী ও যজমান শূলপাণির এই অষ্ট মূর্ত। নিখিল জগৎ এই অষ্ট মূর্তির দ্বারা ব্যাপ্ত। এই জন্যই বিশ্বের মঙ্গলবিধাতা রুদ্র জগন্ময় ও বিশ্বেশ্বর নামে আখ্যাত হন। ব্রহ্মা মহেশ্বর চন্দ্রশেখরকে প্রজা সৃষ্টি করতে বললে তিনি মনের দ্বারা আত্মতুল্য শতকোটি রুদ্র সৃষ্টি করলেন। তাঁরা সকলেই নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটামুকুট ধারী, বৃষধ্বজ, বীতরাগ, জরা মরণ বর্জিত, সর্বজ্ঞ ও সর্বজনের অনুগ্রাহক। তাঁদের দেখে ব্রহ্মা শিবকে বললেন, জরা মরণ বর্জিত এই রকম প্রজা সৃষ্টি করবেন না, মৃত্যু সমন্বিত প্রজা সৃষ্টি করুন।

শম্ভু ব্রহ্মাকে বললেন, সেরকম প্রজা আমার নেই।

এর পর বিশ্বাত্মা শিব আর সে রকম প্রজা সৃষ্টি করলেন না এবং আত্মসমুদ্ভূত রুদ্রদের সঙ্গে ক্রীড়ারত হলেন। স্থাণুর মতো নিশ্চল হওয়ায় তার নাম হল স্থাণু। বৈরাগ্য ঐশ্বর্য তপস্যা সত্য ক্ষমা ধৈর্য

দ্রষ্টৃতা, আত্মজ্ঞান ও সর্বাধিষ্ঠাতৃতা এই দশ অক্ষয় ধর্ম শঙ্করে নিত্য বর্তমান। নীললোহিত ঈশ্বরই বিশ্বেশ্বর। ব্রহ্মা তাঁকে নিরীক্ষণ করে বললেন, আপনি আমার পুত্রত্ব স্বীকার করবেন বলে অনুগ্রহ করে বর দিয়েছিলেন। আমার সেই অভিলাষ সফল হল। তারপর তিনি মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করে শিবের স্তব করলেন এবং বেদ উচ্চারণের পর প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহাদেব তাঁকে নিত্য যোগ, ঐশ্বর্য, ব্রহ্ম সদ্ভাব ও বৈরাগ্য দান করলেন। তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, তুমি যা প্রার্থনা করেছিলে, তোমার পুত্র হওয়াতে তোমার সেই প্রার্থনা সিদ্ধ হয়েছে। এই বারে তুমি আমার আদেশে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি কর। বস্তুত আমি নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টি স্থিতি সংহার রূপ গুণের ভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হর এই তিন মূর্তি পরিগ্রহ করেছি। সৃষ্টির জন্য আমি তোমাকে আমার দক্ষিণ অঙ্গ থেকে উৎপাদন করেছি, তুমিই আমার পুত্র। আর পুরুষোত্তমকে উৎপাদন করেছি বাম অঙ্গ থেকে। কামরূপধারী রুদ্র আমার হৃদয় থেকে উদ্ভূত। জ্ঞানীরা আমাকেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হরের পরমেশ্বর মহাদেব বলে জানেন।

এর পর তিনি ব্রহ্মাকে বিবিধ বর দিয়ে তাঁর সামনেই অন্তর্হিত হলেন। শিবের অনুগ্রহেই শিবজ্ঞান হয়, পাশ ছেদ হয় এবং শিব-রূপতা প্রাপ্তি হয়। শিবের অনুগৃহীত ব্যক্তির গলগণ্ড গ্রহাদি ব্যাধি থাকে না। তাদের ঐহিক সিদ্ধি ও চিরজীবিতা লাভ হয়। পাপ মুক্ত হয়ে শিবলোকে বাসের যোগ্য হয়।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উপাখ্যান

ঋষিরা বললেন, সূত, শম্ভু সবার আদি হলেও কী কারণে তিনি ব্রহ্মার পুত্র রূপে উৎপন্ন হলেন? ব্রহ্মা শূলপাণি মহাদেবের দক্ষিণাঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয়েও পদ্মযোনি হলেন কী রূপে? আপনি আমাদের তাই বলুন।

সূত বললেন, তখন ঘোর একার্ণব প্রলয় উপস্থিত হয়েছে, স্থাবর

জঙ্গম সবই বিনষ্ট। দেব দানব মুনি ও মনুরা তখন কেউই ছিলেন না। সেই তমোময় অবস্থায় মহাযোগী নারায়ণ যোগনিদ্রা অবলম্বন করে অনন্ত শয্যায় শয়ান ছিলেন। হরির নাভিদেশে শতযোজন বিস্তৃত দিব্যগন্ধযুক্ত এক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হল। দৈব পরিমাণে শত বৎসর অতীত হবার পর পুরুষোত্তমের নিকটে ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন। মায়া মোহিত ব্রহ্মা হাত ধরে মধুসূদনকে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ঘোর একার্ণবে কে তুমি এখানে শয়ন করে আছ?

বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বললেন, মূঢ়, আমি অন্তর্যামী প্রভু, তুমি আমাকে জানো না! বিশ্ববীজ সুরশ্রেষ্ঠ বলে আমাকে জানবে।

চক্রপাণি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বললেন, আমি সর্বভূতের আদি, সর্বজগৎপতি। পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে ব্রহ্মা বলে জানবে। চরাচরাত্মক বিশ্ব আমাতেই সতত অবস্থিত, অন্তকালে আমাতেই তা লয় হয়। এই বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

ব্রহ্মা এই কথা বললে কমলাপতি ব্রহ্মার দেহে প্রবিষ্ট হয়ে সেখানে সর্বলোক দর্শন করলেন। তারপর সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষ বিস্ময়ান্বিত হয়ে ব্রহ্মার মুখ দিয়ে নির্গত হলেন এবং বললেন, তুমিও আমার দেহে প্রবিষ্ট হয়ে দেব দানব মানবাদি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত লোক দেখ।

তারপর ব্রহ্মা কমলাপতির উদরে প্রবিষ্ট হয়ে নিখিল জগৎ দর্শন করে বিস্ময়াপন্ন হলেন। কিন্তু চক্রপাণির মাথায় রুদ্ধ থেকে নির্গমনের পথ দেখতে পেলেন না। তিনি তাঁর নাভিপদ্মের নালমার্গ দেখতে পেয়ে সেই পথ দিয়ে নির্গত হয়ে পদ্মের মধ্যে বিরাজ করতে লাগলেন। অমিতদ্যুতি গদাধর ব্রহ্মাকে বললেন, পিতামহ, এ সমস্তই আমি লীলার জন্য করেছি, মাৎসর্যবশত দ্বার রোধ আমি করি নি। তুমি জগতের মান্য, সর্বকারণ ও পিতামহ, আমি তোমাকে পুত্রত্বে প্রার্থনা করছি, এই বর আমাকে দাও। আমার প্রীতির জন্য তুমি পদ্মযোনি এই আখ্যা গ্রহণ কর।

সর্বভূতের আত্মা বিশ্বাদ্য প্রভু বিষ্ণুকে এই বর দিয়ে অনিন্দিত হলেন। তারপর তিনি বিষ্ণুকে বললেন, আমাদের উভয়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু নেই, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার ও আমার স্বরূপ। এক মূর্তিই দুই রূপে বিদ্যমান।

বিষ্ণু বললেন, তোমার এ কথা যথার্থ নয়। সবাত্মক, অনাদি, অনন্ত, স্বপ্রকাশ, সনাতন, বিশ্বেশ্বর উমাপতিকে কি দেখতে পাচ্ছ না? আমাদের উভয়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট সেই দেবদেবের শরণ নিন।

ব্রহ্মা বললেন, আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট কেউ আছেন, এ কথা মিথ্যা। নিদ্রার আবেশে তুমি এই রকম কথা বলছ। মোহ পরি-ত্যাগ কর।

বিষ্ণু বললেন, মহেশ্বরের পরম ভাব না জেনে এইরূপ বলা উচিত নয়। তিনি আছেন, আমি মিথ্যা বলছি না। নিশ্চয়ই তুমি পরমেষ্ঠী শিবের মায়ায় মোহিত। বিশ্বাত্মক রুদ্র মায়ী এবং শাঙ্করা শক্তিই মায়া। বিষ্ণু, রুদ্র, মহাভূত ও ইন্দ্রিয়রা যাঁর থেকে প্রথমে উৎপন্ন, সেই সর্বৈশ্বর্য সম্পন্ন শম্ভুই মুমুক্ষুদের ধ্যেয়। যিনি প্রথমে তোমাকে উৎপাদন করে বেদ দিয়েছিলেন, যাঁর প্রসাদে তুমি প্রাজাপত্য পদ পেয়েছ, যিনি এক এবং যাঁর থেকে সমস্ত নিষ্ক্রিয় প্রাণীর ক্রিয়া-শক্তি হয়, এক বীজকে যিনি বহু প্রকারে বিভক্ত করেন, তিনিই মহেশ্বর। যিনি সমগ্র জগতের উপরে আধিপত্য করছেন, যে রুদ্রই একমাত্র বর্তমান ও দ্বিতীয় কিছু নেই, যিনি জনগণের হৃদয়ে সতত সন্নিবিষ্ট থেকেও পরের অলক্ষ্য, অথচ বিশ্বের সাক্ষী হয়ে সর্বদাই অধিষ্ঠিত, যে একাত্মা অনন্ত শক্তি লীলা বশে কাল ও আত্ম সমেত সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতা, যে শম্ভুর পরম শক্তি ভাবগম্য মনোহর নির্গুণ স্বগুণগুপ্ত নিষ্ফল ও শিব, সেই দেবতাকেই মহাদেব বলে জানবে। তাঁর পরম পদ কিছুই বোঝা যায় না। এই মহাদেবই সকলের আদি, অথচ স্বয়ং অনাদি, অনন্ত, নির্মল, অসীম ও পরিপূর্ণ।

চরাচর তাঁরই ইচ্ছাধীন। তিনি ভূতগণেরও পরবর্তী, অথচ তাঁর পরবর্তী কেউ নেই। তাঁর মহিমা অনন্ত, বৈভবের পরিচ্ছেদ নেই। এই বিচিত্রকর্মা দেবদের জগৎ সৃষ্টি প্রথমে করেন এবং অন্তকালে এই জগৎ তাঁতেই লয় হয়। পতিত মূঢ় দুর্জন ও কুৎসিত ব্যক্তিও যদি ভক্ত হয়ে অন্তরে ও বাহিরে তাঁর পূজা ও সম্মাননা করে তো তাঁকে দেখতে পায়। তাঁর রূপ তিন প্রকার—স্থূল সূক্ষ্ম ও তদতীত। দেবতারা তাঁর স্থূল রূপ দেখেন। আর যোগীরা দেখেন সূক্ষ্ম রূপ। তাঁর যে নিত্যজ্ঞান অব্যয় আনন্দ রূপ, তা শুধু শিবনিষ্ঠ শিবের ব্রতাবলম্বী ভক্তেরাই দেখতে পান। এ বিষয়ে অধিক আর কী বলব! শিবের প্রতি সতত ভক্তি রাখবে, শিবে ভক্তি থাকলেই মুক্তি হবে। শিবের প্রসাদেই শিবভক্তি হয়। আবার শিবভক্তিতেই শিবের প্রসাদ লাভ হয়। এ যেন অঙ্কুর থেকে বীজ ও বীজ থেকে অঙ্কুর। শিবের সামান্য প্রসাদেই পশুদের পাশ ছেদ হয় বলে তিনি পশুপতি। পশু শব্দে আমাদেরই বোঝায়। ভাব অনুসারে শিবই সকলের মুক্তি দান করেন। কেউ মাতৃগর্ভে, কেউ ভূমিষ্ঠ হবার পর, কেউ বাল্যে, কেউ যৌবনে, কেউ বা বার্ধক্যে মুক্তি লাভ করে। নারকী তির্যক যোনিতে থেকেও মুক্তি পেতে পারে। ভগবানের এক মূর্তি তুমি, অন্য মূর্তি আমি এবং তৃতীয় রৌদ্র মূর্তি জগৎসংহারকারী। যিনি নির্গুণ হয়েও গুণদ্রষ্টা, সেই স্বাধীন ঐশ্বর্যশরীরসম্পন্ন শম্ভুই এই তিন মূর্তিকে নিজ নিজ কাজে প্রেরণ করেন। সেই ঈশ্বর মহাদেবকে কেন দেখছ না? আমি তোমায় দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, তা দিয়ে তুমি শিবকে দেখতে পাবে।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকটে দিব্য চক্ষু পেয়ে শিবকে সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন করলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে পরম জ্ঞান লাভ করে তিনি সেই নির্গুণ শিবেরই শরণাপন্ন হয়ে তাঁর স্তব করলেন। তাতে মহাদেব প্রীত হয়ে বললেন, তুমি বিবিধ ভক্তিপূর্ণ স্তবে আমাকে সন্তুষ্ট করেছ, তুমি যে শীঘ্রই মুক্ত হয়ে আমার সদৃশ হবে তাতে সন্দেহ নেই। সৃষ্টির জন্য

আমি তোমাকে ও বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেছি। তুমি অভিলাষ অনুসারে বর নাও।

শিবের এই কথা শুনে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে একবার দেখে মহাদেবকে বললেন, দেব দেবেশ পার্বতীকান্ত, আপনাকেই আমি পুত্র রূপে কামনা করছি। আমি আপনার মতো পুত্র চাই। আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে আমি পরাৎপর শিব আপনাকেই জানতে পারি নি। আপনার পাদপদ্মে আমি প্রণাম করছি।

পুত্র ব্রহ্মার কথা শুনে পিনাকপাণি দেবদেব পুত্র নারায়ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, তুমি যা প্রার্থনা করলে আমি তাই করব। পিতামহ. অংশ রূপে আমি তোমার পুত্র হব। শীঘ্রই আমাকে জানতে পারবে। আমার প্রসাদে তুমি চরাচর জগৎ সৃষ্টি কর। যোগীশ্বর বিষ্ণু যে আমারই অংশ তাতে সংশয় নেই। আমার আদেশে তিনি তোমায় সাহায্য করবেন।

ব্রহ্মাকে এই বর দিয়ে শিব কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান বিষ্ণুকে বললেন, তুমিও বর প্রার্থনা কর। তোমাকেও আমি বর দেব। তোমাতে আমাতে ভেদ নেই। তুমি আমার শক্তি, পুরুষাত্মক অর্থাৎ জ্ঞাতৃস্বরূপ। সমুদয় অব্যক্ত জগৎ এবং জ্ঞান জ্ঞেয় স্বরূপ জগৎ—এ তোমার ও আমারই স্বরূপ মাত্র। আমি জ্ঞাতা তুমি জ্ঞান ; আমি মন্তা তুমি মতি ; তুমি প্রকৃতি আমি পুরুষ। এ বিষয়ে সংশয় নেই। তুমি চন্দ্র আমি সূর্য ; তুমি রাত্রি আমি দিন ; তুমি মায়া আমি মায়ী।

নিরঞ্জন বাসুদেব শিবের এই কথা শুনে পরমাত্মা মহাদেবকে বললেন, আপনার প্রতি আমার নিশ্চল ও অব্যভিচারী ভক্তি হোক, অন্য বর আর কী চাইব!

'তথাস্তু' বলে শিব বিষ্ণুকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর 'আমার আদেশে জগৎ পালন কর' এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন। এই জন্য দেব ত্রিলোচন ব্রহ্মার পুত্র হয়েছিলেন।

গৌরীর জন্ম

ঋষিরা বললেন, ভগবতী গৌরী শঙ্করের অর্ধ-শরীর রূপা হয়েও কেন পৃথক শরীর ধারণ করেছিলেন, আমরা তা শুনতে চাই।

সূত বললেন, ব্রহ্মা মহাদেবের নিকটে বর পেয়ে প্রজা সৃষ্টি করলেন, কিন্তু প্রজা বৃদ্ধি হল না। অপ্রবৃদ্ধ প্রজা দেখে ব্রহ্মা দুঃখিত হলেন এবং নিজেকে অকৃতার্থ মনে করলেন। তারপর হর প্রাদুর্ভূত হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, তোমার দুঃখের কারণ আমি জানতে পেরেছি। আমি এমন কাজ করছি যাতে তোমার সর্বতোভাবে সুখ হবে।

এই বলে অর্ধনারীশ্বর বিশ্বেশ্বর শিব নারী ভাগ থেকে পৃথক ঈশ্বরী সৃষ্টি করলেন। তিনি ব্রহ্মময়ী নবোদিত কোটি-সূর্য-সমপ্রভা পরমা শক্তি। তাঁর প্রকৃত জন্ম নেই। কিন্তু জাত বলে প্রকাশ আছে। ব্রহ্মাদি দেবতারা এই শক্তির পরম ভাব অবিদিত। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর শক্তি থেকে উদ্ভূত, ব্রহ্মা তাঁকেই স্বামীর অঙ্গ থেকে বিভক্তের মতো দেখলেন। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর স্তব করতে লাগলেন, আপনি আমার মাতা ও স্বয়ং সর্বেশ্বর আমার পিতা। ত্রিপুরারিই সৃষ্টি করবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করেছেন। বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করলেও তার বৃদ্ধি না হওয়াতে আমি মিথুন-সম্ভূত প্রজা সৃষ্টি করে প্রজাবৃদ্ধি করতে চাই। আপনার থেকেই সর্বশক্তির সৃষ্টি। কিন্তু আপনিই শক্তি ও সমস্ত প্রাণীর শক্তিপ্রদায়িনী হয়েও নিজে সৃষ্টি করেন নি বলে শক্তি সৃষ্টির বিষয়ে আমাকে বর দিন যে আমার সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য এক অংশে আপনি আমার পুত্র দক্ষের কন্যা হয়ে জন্মাবেন।

ব্রহ্মার এই প্রার্থনা শুনে দেবী আত্মসমপ্রভা এক শক্তিমূর্তি নিজের দুই ভ্রূর মধ্য থেকে উৎপাদন করলেন। বিশ্বেশ্বর হর তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সহাস্যে বললেন, ব্রহ্মার কথা মতো তাঁর অভীষ্ট সাধন কর। ব্রহ্মরূপিণী পরমেশ্বরী মাথায় শিবের আজ্ঞা নিয়ে স্বেচ্ছায় দক্ষের কন্যা হলেন এবং আদ্যা শক্তি শিবের দেহে প্রবিষ্ট হলেন। দেবদেব আবার অর্ধনারীশ্বর রূপে প্রকাশ পেলেন। আমরা এই

কথা শুনেছি। এর পর থেকেই প্রজারা মৈথুন-সম্ভূত হতে লাগল। বিপ্রগণ, দেবীর এই আবির্ভাবের কথা আমি আপনাদের বললাম। এই প্রকরণ পাঠ বা শ্রবণ করলে বংশবৃদ্ধি হয়।

দক্ষ ও তাঁর কন্যাদের বংশ বিবরণ

সূত বললেন, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা শিব ও শিবার এই অত্যুত্তম বর লাভ করে মরীচি প্রভৃতি নিষ্পাপ ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। তিনি মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে মনের দ্বারা সৃষ্টি করলেন। ক্রমে তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পিতৃগণকে এবং অন্ধকারে রাক্ষসদের সৃষ্টি করলেন। সহস্র সহস্র গন্ধর্ব, নাগ ও যক্ষ সৃষ্টি করলেন। তিনি মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের, উরু থেকে বৈশ্যদের এবং চরণ থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি করলেন। দেবদেব পিতামহ ছন্দ, বেদ, যজ্ঞ, কল্পসূত্র ও বেদাঙ্গ সৃষ্টি করে মৈথুন-সম্ভূত সৃষ্টি করবার জন্য প্রবৃত্ত হলেন। তিনি নিজেই অর্ধাংশে রমণী ও অর্ধাংশে পুরুষ হলেন। অর্ধনারীর ভাগ থেকে শতরূপা উৎপন্ন হলেন। পুরুষ স্বরূপ অর্ধ ভাগ থেকে স্বায়ম্ভুব মনুকে উৎপাদন করলেন। দেবী শতরূপা অতি দুশ্চর তপস্যা করে স্বায়ম্ভুব মনুকে পতি রূপে প্রাপ্ত হলেন। মনুর ঔরসে শতরূপা প্রিয়ব্রত ও উত্তান-পাদ নামে দুই পুত্র এবং আকূতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যার জন্ম দিলেন। এই দুই কন্যা থেকেই সৃষ্টি বৃদ্ধি হয়েছিল।

স্বায়ম্ভুব মনু প্রথমা কন্যা রুচিকে ও কনিষ্ঠা কন্যা দক্ষ প্রজাপতিকে দান করলেন। কনিষ্ঠা প্রসূতির গর্ভে চব্বিশটি কন্যার জন্ম হল। দক্ষ ধর্মকে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যা দান করলেন। ভৃগুকে খ্যাতি, শূলপাণিকে সতী, মরীচিকে সম্ভূতি, অঙ্গিরাকে স্মৃতি, পুলস্ত্যকে প্রীতি, পুলহকে ক্ষমা, ক্রতুকে সন্ততি, অত্রিকে অনসূয়া, বশিষ্ঠকে উর্জা, পিতৃগণকে স্বধা ও অগ্নিকে স্বাহা সম্প্রদান করলেন। খ্যাতির গর্ভে নারায়ণ প্রিয়া লক্ষ্মী এবং ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্রের জন্ম হল।

এঁরা দুজন মেরুর জামাতা, মেরুর দুই কন্যা আয়তি ও বিয়তি। ধাতা ও বিধাতা দুই ভাইএর পুত্র প্রাণ ও মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়, এবং প্রাণের পুত্র বেদশিরা। সম্ভূতির গর্ভে পৌর্ণমাস নামে এক পুত্রের জন্ম হল। দক্ষের কন্যাদের মধ্যে এক সম্ভূতিরই চারটি কন্যা হল। ক্ষমার পুত্র কর্দম ও অম্বরীষ। অনসূয়ার পুত্র দুর্বাসা চন্দ্র ও যোগী দত্তাত্রেয়। স্মৃতির চার সুলক্ষণা কন্যার নাম সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি। পূর্ব জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যিনি অগস্ত্য ছিলেন, তিনিই প্রীতির গর্ভে জন্ম নিয়ে দত্তোলি নামে খ্যাত হলেন। সন্ততির যাট হাজার পুত্র হল, তারা বালখিল্য নামে বিখ্যাত। সকলেই উর্ধ্বরেতা হলেন। উর্জার সাত পুত্র ও এক কন্যা জন্মাল। পুত্রদের নাম বজঃ, গোত্র, উর্ধ্ববাহু, সবল, অনঘ, সুতপা ও শুক্র এবং কন্যার নাম পুণ্ডরীকা। স্বাহার গর্ভে ব্রহ্মার পুত্র রুদ্রাত্মক অগ্নির তিন পুত্র হল, তাঁরা পাবক পবমান ও শুচি নামে খ্যাত অগ্নিত্রয়। অরণি কাষ্ঠ মথনসম্ভূত অগ্নি পবমান, বৈদ্যুতাগ্নি পাবক এবং সূর্যতাপসম্ভূত অগ্নিই শুচি। তাঁদের পঁয়তাল্লিশজন পুত্র। পাবক প্রভৃতি তিন ভ্রাতা, তাঁদের পঁয়তাল্লিশজন পুত্র এবং পিতা ব্রহ্মপুত্র অগ্নি—এঁরা সবাই মিলে উনপঞ্চাশ অগ্নি। সকলেই যজ্ঞভাগী, তপস্বী, শিবপূজাপরায়ণ ও ত্রিপুণ্ড্রধারী। ব্রহ্মার পুত্র পিতৃগণ দ্বিবিধ—যজ্বা ও অযজ্বা। অগ্নিম্বাত্তগণ অযজ্বা অর্থাৎ নিরগ্নি এবং বর্হিষদ্‌গণ যজ্বা অর্থাৎ সাগ্নি। স্বধা মেনা ও ধারিণী নামে দুই কন্যার জন্ম দেন, তাঁরা উভয়েই যোগমার্গরতা। হিমালয়ের ঔরসে মেনার মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ নামে দুই পর্বত এবং গৌরী ও গঙ্গা নামের দুই কন্যার জন্ম হয়। সুমেরুর ঔরসে ধারিণীর চারু কন্দর সম্পন্ন নানা ধাতু চিত্রিত শিবের প্রিয় মন্দর পর্বত উৎপন্ন হয়। ধারিণী বেলা নিয়তি ও আয়তি নামে তিনটি কন্যাও প্রসব করেন। সাগরের ঔরসে বেলার সামুদ্রী নামে কন্যা জন্মে। এই সামুদ্রী প্রাচীনবর্হি রাজার ঔরসে দশ পুত্রের জন্ম দেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁরা প্রচেতা নামে খ্যাত হন। শিবের শাপে দক্ষ প্রজাপতি

এঁদের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন। দক্ষ কন্যাদের বংশ আমি আপনাদের বললাম। এবারে মনুর পুত্র মন্বতির বিবরণ বলছি।

উত্তানপাদের বংশ বিবরণ

সূত বললেন, উত্তানপাদের পুত্র মহামনা হরি পরায়ণ ধ্রুব মমতা অহঙ্কার পরিহার করে পরম দেব অনাময় নারায়ণের আরাধনায় তাঁর প্রসাদে উত্তম স্থান লাভ করেন। ধ্রুবের চার পুত্র। তাঁদের নাম স্মষ্টি ধন্য হর্য ও শম্ভু। এঁরা সকলেই প্রথিততেজ বৈষ্ণব। ধর্ম পরায়ণ স্মষ্টির ঔরসে ছায়ার পাঁচ পুত্র হয়, তাদের নাম রিপু রিপুঞ্জয় বিপ্র বৃষল ও বৃষকেতন। রিপুর পত্নী বৃহতীর গর্ভজাত পুত্র চক্ষু। চক্ষুর ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভে চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি। তাঁর বংশ সম্ভূত অঙ্গ ক্রতু ও শিব প্রভৃতি অসংখ্য ব্যক্তি। অঙ্গের পুত্র বেণ, বেণ থেকে বৈণ্যের উৎপত্তি। বৈণ্য পৃথু নামে খ্যাত। পৃথু বিখ্যাত রাজা এবং ইনিই পৃথিবী দোহন করেন। তাঁর মতো হরি পূজা পরায়ণ রাজা ভূতলে কেউ নেই। পৃথু গোবর্ধন পর্বতে তপস্যা করে বিষ্ণুর আরাধনা করলে বিষ্ণু প্রীত হয়ে তাঁকে বললেন, রাজর্ষি, আমার প্রসাদে তোমার দুই পুত্র হবে, তারা উভয়েই আমার ভক্ত, মহাত্মা, পিতৃ তৎপর ও সার্বভৌম রাজা হবে। পৃথু এই বর লাভ করলে পৃথুর পত্নী যথাসময়ে শিখণ্ডী ও হবির্ধান নামে দুই পুত্র প্রসব করলেন। শিখণ্ডীর পুত্র সুশীল শিবধ্যান তৎপর শ্বেতাশ্বতর মুনির উপাসনা করে তাঁর নিকটে শিবযোগ লাভ করলেন।

রাজা সুশীলের উপাখ্যান

ঋষিরা বললেন, রাজা সুশীল কীরূপে অত্যুত্তম জ্ঞান লাভ করলেন, আমরা তা শুনতে চাই। সূত, আপনি আমাদের সেই কথা বলুন।

সূত বললেন, শিখণ্ডীর এই পুত্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বেদাধ্যয়ন

করলেন এবং বৈরাগ্যে আস্থাবান হলেন। কোন সময় তাঁর মনে শ্রেয়ো বিচার উপস্থিত হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে যে কর্মদ্বয় আছে, তার অত্যন্ত মুক্তি আমার কেমন করে হবে? মনে মনে এই চিন্তা করে রাজা হিমালয় পর্বতে মুনি-সিদ্ধ-সেবিত ধর্ম বনে গেলেন। সেখানে এক ঋষি-সেবিত শিবালয় দেখতে পেলেন। মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিরা, সিদ্ধগণ, ভগবান নারায়ণ এবং অন্য দেব-দানবেরা অনেকেই সেই শিবের আরাধনা করে সিদ্ধ হয়েছেন। পাপহারিণী মন্দাকিনী গঙ্গার তীরে তিনি যোগীন্দ্র সেবিত এক আশ্রম দেখতে পেলেন। রাজা মন্দাকিনীর জলে স্নান করে শিব পূজার পর শিবের কথা যুক্ত বিবিধ স্তোত্রে বিশ্বেশ্বর শিবের ধ্যান করে ক্ষণকাল অতিবাহিত করলেন। তারপর তিনি মহা পাশুপত, শান্ত, জীর্ণ কৌপীন পরিহিত ভস্মাবৃত শরীরে ত্রিপুণ্ড্রধারী শ্বেতাশ্বতর মহামুনিকে দেখতে পেলেন। রাজা তাঁর চরণ যুগল বন্দনা করে সেই সর্বভূতে দয়ালু মুনিকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হলাম, আমার জীবন সার্থক হল। আপনার দর্শন লাভ করে তপস্যাও সফল হল। আপনার শিষ্য হবার যোগ্য যদি হই তো আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। সংসার ভীতি থেকে আমাকে বিমুক্ত করুন।

শ্বেতাশ্বতর রাজাকে পুত্রের ন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়ে সেই অত্যুত্তম যোগ প্রদান করলেন। এই পাশুপত যোগ শেষ আশ্রমেই লভ্য। ইহা সর্ববেদ গুহ্য, কিন্তু বেদজ্ঞ-দের অনুষ্ঠিত। মুনি শ্বেতাশ্বতরের অনুগ্রহে রাজা সুশীলও পাশুপত হলেন এবং বেদাভ্যাস নিরত, ভস্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে সন্ন্যাস বিধি আশ্রয় করায় মুক্তিলাভ করলেন।

ধর্মের বংশ বিবরণ

সূত বললেন, ব্রহ্মা দক্ষ প্রজাপতিকে প্রজাসৃষ্টি করবার আদেশ দিলে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভেই সুরাসুর সৃষ্টি করলেন। প্রজাপতি বীরণের কন্যা অসিক্লী। অসিক্লীর গর্ভে দক্ষ প্রজাপতি ষাট কন্যার জন্ম দিলেন। তাদের মধ্যে দশটি ধর্মকে, তেরোটি কশ্যপকে, সাতাশটি চন্দ্রকে, চারটি অরিষ্টনেমিকে এবং দুটি করে কন্যা বহুপুত্র, কৃশাশ্ব ও অঙ্গিরাকে সম্প্রদান করলেন। সাধ্যা বিশ্বা সংকল্পা মুহূর্তা অরুন্ধতী মরুত্বতী বসু ভানু লম্বা ও জামী এই দশজন ধর্মের পত্নী। তাঁদের বংশবিবরণ বলা হচ্ছে। সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেব-গণ, সঙ্কল্পার গর্ভে সঙ্কল্প, মুহূর্তার গর্ভে মুহূর্ত দেবগণ, অরুন্ধতীর গর্ভে আরুন্ধতগণ, বসুর গর্ভে বসুগণ, ভানুর গর্ভে ভানু দেবগণ, লম্বার গর্ভে ঘোষ দেবতাগণ এবং জামীর গর্ভে নাগবীথী দেবগণ উৎপন্ন হল। এই দেবত্রয় জ্যোতিসম্পন্ন এবং সর্বদিক ব্যাপী। বসুগণ সর্বলোকের হিতকামা। অষ্টবসুর নাম আপ নল সোম ধ্রুব অনিল অনল প্রত্যুষ ও প্রভাস। তাপের পুত্র বৈতণ্ড্য শ্রম শ্রান্ত ও ধ্বনি। নলের ঔরসে মনোহরার গর্ভে দ্রবিণ হুতহব্যবহ শিশির প্রাণ ও বরুণের উৎপত্তি। সোমের পুত্র বর্চা। এই বর্চা থেকেই লোকে বর্চস্বী অর্থাৎ কান্তিমান হয়। ধ্রুবের পুত্র সর্বলোক ভয়ঙ্কর কাল। অনিলের পত্নী শিবার গর্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্রের জন্ম। অনলের পুত্র কুমার শরস্তম্বে উৎপন্ন। শাখ বিশাখ ও মৈগমেয় কুমারের কনিষ্ঠ। কৃত্তিকার অপত্য বলে কুমার কার্তিকেয় নামে খ্যাত। প্রত্যুষের পুত্র দেবল ঋষি। দেবলের দুই পুত্রই ক্ষমাশীল ও মনীষী। প্রভাসের পুত্র বিশ্বকর্মা। এই হল ধর্মের বংশ।

হিরণ্যকশিপু বধ

অদিতি দিতি দনু অরিষ্টা সুরসা স্বধা সুরভি বিনতা তাম্রা কদ্রূ ক্রোধবশা ইরা ও মুনি—এঁরা কাশ্যপের পত্নী। অংশু ধাতা ভগ ত্বষ্টা মিত্র বরুণ অর্যমা বিবস্বান সবিতা পূষা অংশুমান ও বিষ্ণু এঁরা চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতা ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে তাঁরাই অদিতির পুত্র হয়ে আদিত্য নামে আখ্যাত হলেন। দিতি কশ্যপের ঔরসে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুই পুত্রের জন্ম দিলেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মবরে দর্পিত হয়ে ইন্দ্রাদি দেবতাদের পীড়িত করল। দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে কৃতাঞ্জলিপুট বলতে লাগলেন, হিরণ্যকশিপু দৈত্য শস্ত্র ও অস্ত্র দিয়ে আমাদের বিধ্বস্ত করেছে। সে আমাদের পত্নী ও বজ্রাদি অস্ত্র হরণ করেছে। ভীতিগ্রস্ত আমাদের আপনি রক্ষা করুন। আমাদের আর রক্ষাকর্তা নেই। ব্রহ্মা দেবতাদের এই কথা শুনে তাঁদের নিয়ে বিষ্ণুর সন্নিধানে গেলেন। বিবিধ স্তোত্রে তাঁর স্তব করে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বললেন, আমার বরেই গর্বিত হিরণ্যকশিপু সমস্ত দেবতা ও নিষ্পাপ মুনিদের পীড়ন করছে। এমন কাউকে দেখছি না যে এই হিরণ্যকশিপুকে শীঘ্র বধ করতে পারে। একমাত্র আপনিই তা পারেন, এই বিবেচনা করে আমরা আপনার নিকটে এসেছি। দেবকার্য সিদ্ধির জন্য আপনি তাঁকে শীঘ্র বধ করুন। দেবতাদের এই কথা শুনে নারায়ণ মানুষের অর্ধ দেহ ও বাকি অর্ধ সিংহের এই রূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুর নগরে আবির্ভূত হলেন। তিনি নৃসিংহরূপী হয়ে অসুর-ভয়াবহ মহা-ঘোর শব্দ করতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপু এই মূর্তি দেখে তাকে বধের জন্য প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাসুরগণকে প্রেরণ করলেন। প্রহ্লাদ. অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ হিরণ্যকশিপুর এই চার পুত্র। এরা সকলেই বিখ্যাত বীর। সেই দৈত্যরা নৃসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। নৃসিংহের প্রতি প্রহ্লাদ ব্রহ্মাস্ত্র, অনুহ্লাদ বৈষ্ণবাস্ত্র, সংহ্লাদ কৌমার-অস্ত্র, হ্লাদ আগ্নেয়াস্ত্র এবং

অন্য মহাসুররাও এই সব অস্ত্রক্ষেপ করল, কিন্তু এই চতুর্বিধ অস্ত্রই নৃসিংহের অঙ্গ স্পর্শ মাত্র বজ্রহত বৃক্ষরাজির মতো ভগ্ন হল। নৃসিংহ তখন হিরণ্যকশিপুর চার পুত্রকে দুই বাহু দিয়ে গ্রহণ করে আকাশ থেকে বারংবার ভূতলে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পুত্রদের এই ভাবে নিপীড়িত হতে দেখে হিরণ্যকশিপু স্বয়ং কোপে প্রজ্বলিত হয়ে নৃসিংহের নিকটে অভিযান করলেন। এই সময়ে দৈত্য পুলব প্রহ্লাদ অমিততেজ নৃসিংহকে নারায়ণ বলে জানতে পেরে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং অসুরদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করে বললেন, ইনি সনাতন পরমাত্মা যোগী নারায়ণ, এঁকে ধ্যান করতে হয়। এঁর সঙ্গে কেউ কদাচ যুদ্ধ করবে না। পুত্র বার বার এ কথা বললেও হিরণ্যকশিপু তা না শুনে বিষ্ণুর সঙ্গে তিনশো বৎসর যুদ্ধ করলেন। তারপর বিশ্বরূপ বিষ্ণু ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে হিরণ্যকশিপুকে নখ দিয়ে বিদীর্ণ করলেন।

হিরণ্যাক্ষ বধ

সূত বললেন, হিরণ্যকশিপু নিহত হলে তাঁর পুত্র দৈত্য সত্তম প্রহ্লাদ মহাবাহু হিরণ্যাক্ষকে রাজ্যাভিষিক্ত করলেন। হিরণ্যাক্ষও দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করলে তাঁরা স্বর্গ ছেড়ে পলায়ন করলেন। হিরণ্যাক্ষ তপস্যায় মহাদেবের আরাধনা করে সর্বদেব নিসূদন মহাবল পুত্র লাভ করলেন। হিরণ্যাক্ষের ভয়ে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু তাঁদের দেখে হিরণ্যাক্ষ বধের জন্য বরাহ রূপ ধারণ করলেন, তারপর তাকে বধ করলেন।

প্রহ্লাদ চরিত

হিরণ্যাক্ষ নিহত হলে বৈষ্ণবোত্তম প্রহ্লাদ তামস বৃত্তি পরিত্যাগ করে রাজা হলেন। তারপর এক সময়ে তিনি দেব মায়ায় মোহিত হয়েছিলেন। এক কৃশাঙ্গ ব্রাহ্মণ তাঁর গৃহে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে

অবজ্ঞা করলেন। সেই অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিশাপ দিলেন, যাঁর বল অবলম্বন করে তুমি আমাকে অবজ্ঞা করলে, সেই জনার্দনের প্রতি তোমার ভক্তি বিনষ্ট হবে। ব্রাহ্মণ এই শাপ দিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ পিতৃহত্যা স্মরণ করে বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি অন্য দেবতাদের জয় করলেন। কিন্তু পুনর্বার বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভ করে মায়াময় পদার্থ পরিত্যাগ করে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। তার পর হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধকাসুরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে নিজে যোগাবলম্বন করলেন।

ভৃঙ্গীর উপাখ্যান

দেবদেব মহাদেব কোন কারণে ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি পার্বতীকে মন্দর পর্বতে রেখে গিয়েছিলেন এবং নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাদের দেবীর নিকটে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং দেবতারা স্ত্রী মূর্তি ধারণ করে পার্বতীর সেবা করছিলেন। শিব নন্দী প্রমুখ অসংখ্য গণ নায়ক ও ভৈরব-নন্দীকে দ্বারদেশে থাকবার আদেশ দিয়েছিলেন।

এই সময়ে অন্ধকাসুর ভবানী হরণের অভিলাষে মন্দর পর্বতে এসে উপস্থিত হল। তাই দেখে কাল ভৈরব তাকে শূল তাড়িত করলেন। অন্ধক মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ল এবং পুনরায় উত্থিত হয়ে গদা হাতে নিয়ে ভৈরব ও অন্য গণাধ্যক্ষদের সবেগে আঘাত করল। দানব-মর্দন বিষ্ণু সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখে নানা দিব্য শক্তি সৃষ্টি করলেন এবং অন্ধক তাদের নিকট পরাজিত হল। তারপর রুদ্র দেবী পার্বতী দেবতাগণ ও গণধ্যক্ষদের সন্নিধানে এলেন অন্ধক বধের জন্য। বিশ্বেশ্বরকে দেখবামাত্র দেবী ভূলুণ্ঠিত হয়ে ভর্তার পাদপদ্মে ভক্তি ভরে প্রণাম করলেন। বিষ্ণুও তাঁকে প্রণাম করে যা-যা ঘটেছিল সব বললেন। সে সব শুনে বিস্ময়াপন্ন হয়ে তিনি দেবীর সঙ্গে উত্তম আসনে বসলেন এবং দেবতারা কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এমন সময়ে হিরণ্যাক্ষর পুত্র অন্ধক এসে দেবতা মাতৃগণ ও প্রমথদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল। ইন্দ্রাদি দেবতা ও মাতৃগণ তাব নিকটে পরাজিত হল। সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখে বিষ্ণু শিবকে বললেন, প্রভু, এই দৈত্য যাতে বিনষ্ট হয় তার উপায় করুন।

শিব বিষ্ণুর এই কথা শুনে দৈত্য রাজকে বধের জন্য কাল ভৈরবকে পাঠালেন। শিবের আজ্ঞা মাথায় করে কাল ভৈরব শূল নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন এবং তাকে শূলের অগ্রভাগে বিদীর্ণ করে আত্মলীলার বশে নৃত্য করতে লাগলেন। অন্ধক শূলাগ্রে স্থাপিত হলে ব্রহ্মাদি দেবতারা বিবিধ স্তোত্রে কাল ভৈরবের স্তব করতে লাগলেন। সমস্ত লোকও হৃষ্ট হল। অন্ধক বলতে লাগল, একাগ্রচিত্ত হলে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বরূপ যাঁকে অবগত হওয়া যায়, সেই পুরাতন পুণ্য অনন্ত রূপ যোগ-বিয়োগ-হেতু কবি কালরূপী অদ্বিতীয় ভগবানকে আমি ভূলুণ্ঠিত শীর্ষে প্রণাম করি। হে আদি দেব, তোমার জয় হোক। তোমার নির্মল তত্ত্বরূপ বিভাগ-বর্জিত। কিন্তু অগ্নি যেমন ব্যবহার ভেদে বিভক্ত, তেমনি অখিলাত্মরূপী তোমারও বিভাগ আছে। জ্ঞানীরা তোমাকে তেজময় তমোতীত একমাত্র প্রাণপুরুষ বলে থাকেন। তুমি এই জগতের স্রষ্টা, সতত রক্ষাকর্তা, আবার সংহার-কর্তাও। যোগগণ তোমার সেবক। তুমি বহু প্রকারে দেহে সন্নিবিষ্ট এক আত্মা, কিন্তু দেহাদি বিশেষ ধর্ম তোমার কিছুই নেই। পরমার্থপদবাচ্য আত্মতত্ত্ব-স্বরূপ তোমাকে কেউ কেউ শিব নামে নির্দেশ করে। তুমি পবিত্র আনন্দরূপ অক্ষর পরব্রহ্ম। প্রণব তোমার বাচক। তোমাকে নমস্কাব। মহেশ্বর শিবকে নমস্কার।

পরমেশ্বর ভৈরব এই স্তবে প্রীত হয়ে শূলাগ্র থেকে অন্ধককে অব-তরণ করিয়ে বললেন, দৈত্যশ্রেষ্ঠ, তোমার স্তবে আমি প্রীত হয়েছি। তোমাকে আমি দুর্লভ গাণপত্য পদ দিচ্ছি। তুমি ভৃঙ্গী নামে খ্যাত হবে এবং নন্দীশ্বরের সমান অনুচর হবে।

এই বর পেয়ে দৈত্য শ্রেষ্ঠ কোটি সূর্য সমপ্রভ নীলকণ্ঠ ত্রিনয়ন

বৃষধ্বজ ও জটাধর হলেন। দেবতারা ভৈরবের সমীপে তাকে গণ রূপ অবলোকন করে আনন্দিত হলেন। তারপর গণ রূপী অন্ধক শিবের পার্শ্ববর্তী শরণাগত বৎসলা দেবী বিশ্বেশ্বরীকে সর্বান্তঃকরণে স্তব করলে তিনি প্রীত মনে তাকে পুত্র রূপে গ্রহণ করলেন।

তারপর কাল ভৈরব মহেশ্বরের অনুজ্ঞা লাভ করে মাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাতালে নিজের নগরে গেলেন। বিষ্ণুর তামসী নৃসিংহ মূর্তি সেখানে বিরাজিত। ভৈরব সেই মূর্তি দেখে আনন্দে আলিঙ্গন করলেন। তাতে ভৈরব ও বিষ্ণুর মূর্তি এক হয়ে গেল। যিনি কালাগ্নি ভৈরব, তিনিই নৃসিংহ। আর যিনি নৃসিংহ তিনিই কাল ভৈরব। নৃসিংহ পূজায় ভৈরব ও ভৈরব পূজায় নৃসিংহ প্রীত হল। যে মায়ামূঢ় ব্যক্তি ভৈরব ও নৃসিংহে ভেদজ্ঞান করে, তার প্রলয় পর্যন্ত নরক ভোগ হয়। তাই রুদ্র নারায়ণ রূপী ভগবৎ মূর্তি অবশ্য পূজ্য। প্রীতি হলে তিনি অজ্ঞান নাশ করেন।

দ্বিজগণ, আমি সংক্ষেপে অন্ধকাসুর বধ, ভৈরবের প্রাদুর্ভাব ও পরাক্রমের কথা কীর্তন করলাম। যে মহাদেবের সামনে এই অধ্যায় পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে শিবের অনুচর হয়।

কশ্যপের বংশ

সূত বললেন, হিরণ্যকশিপুর পুত্র দৈত্য সত্তম প্রহ্লাদ অন্ধকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নিজেই দৈত্য রাজ্যে অধিষ্ঠিত হলেন। বহুকাল রাজ্যভোগের পর তাঁর বৈরাগ্য উপস্থিত হল। তিনি তখন শমাদি গুণান্বিত বাসুদেব পরায়ণ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ বিরোচণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে তপোবনে গেলেন। দেবদেব চক্রপাণি বিরোচণকে বধ করলেন। তাঁর পুত্র ধর্ম পরায়ণ বলি। চক্রপাণিই তাঁকে বন্ধন করে পাতালে নিয়ে যান। বলির পুত্র বাণাসুর ছিলেন বিশ্বেশ্বর শিবের ভক্ত। শিব তাঁকে গাণপত্য পদ প্রদান করলেন।

শম্বর কপিল শঙ্কর স্বর্ভানু ও বৃষপর্বা দনুর পুত্র। সুরসা কশ্যপের

ঔরসে খেচর সর্পদের উৎপাদন করেন। অনন্ত প্রভৃতি বলবান ফণিরা কদ্রুর পুত্র। অরিষ্টা কশ্যপের ঔরসে গন্ধর্বদের উৎপাদন করেন। বিনতা গরুড় ও অরুণের জননী। যক্ষ ও রাক্ষসেরা স্বধার সন্তান, অপ্সরা গণ মুনির। কশ্যপের অন্যান্য পত্নী থেকে পশু প্রভৃতি অনেক প্রাণী উৎপন্ন হল। এই ভাবে কশ্যপ স্থাবর জঙ্গম উৎপাদন করে পুনরায় প্রজাবৃদ্ধির জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। এই তপের প্রভাবে কশ্যপের বৎসর ও অসিত নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হলেন। বৎসরের পুত্র নৈধ্রুব ও রৈভ্য। নৈধ্রুবের ঔরসে সুমেধা কুণ্ডপায়ী নামে পুত্রদের উৎপাদন করলেন। অসিতের ঔরসে একপর্ণার গর্ভে দেবল মুনি উৎপন্ন হলেন। দেবল শিবের আরাধনা করে পরম সিদ্ধি লাভ করলেন। দেবলের পুত্র শাণ্ডিল্য। এই হল কশ্যপের বংশ।

রাজর্ষি তৃণবিন্দু তাঁর কন্যা ইলবিলা পুলস্ত্যকে দান করলেন। পুলস্ত্যের ঔরসে ইলবিলার গর্ভে বিশ্রবার জন্ম। বিশ্রবার চারিজন পত্নী, তাঁদের নাম পুষ্পোৎকটা, রাকা, কৈকসী ও দেববর্ণিনী। বিশ্রবার ঔরসে দেববর্ণিনীর গর্ভে কুবের, কৈকসার গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণ সূর্পণখা ও বিভীষণ, পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর প্রহস্ত ও মহাপার্শ্ব নামে তিন পুত্র ও কুম্ভীনসী নামে এক কন্যার জন্ম হয় এবং রাকার গর্ভে জন্ম ত্রিশিরা দূষণ ও মহাবল বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে ক্রূরকর্মা তিন রাক্ষস পুত্র। ভূত মৃগ পিশাচ ও দংষ্ট্রীরা পুলস্ত্যের বংশসম্ভূত।

দৈত্য গুরু বিখ্যাত শুক্র ভৃগুর বংশে উৎপন্ন। ইনি পূর্বকালে বদরিকাশ্রমে শিবের আরাধনা করে সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করেছিলেন। তাতেই সেই মহামুনি জরা-মরণ-মুক্ত বজ্রের মতো দৃঢ়দেহী হয়েছিলেন এবং পার্বতীপতির প্রসাদে যোগাচার্য নামে খ্যাত হয়েছেন।

অনসূয়া তিন পুত্র প্রসব করেন, তাঁদের নাম দত্তাত্রেয়, চন্দ্রমা ও দুর্বাসা। এঁরা অত্রির পুত্র, আত্রেয় নামে বিখ্যাত। ক্রতু নিঃসন্তান। অরুন্ধতী নামের কন্যা বশিষ্ঠকে দান করা হয়। অরুন্ধতীর গর্ভে শক্তির জন্ম। পরাশর শক্তির পুত্র ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পরাশর নন্দন।

দ্বৈপায়নের পুত্র শুক। শুকের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। তাদের নাম ভূরিশ্রবা প্রভু শম্ভু কৃষ্ণ ও গৌর এবং কীর্তিমতী কন্যার নাম। এই বংশের কথা বলা হল।

সূর্যবংশ

কশ্যপের কাছ থেকে অদিতি অমিততেজ সূর্যকে পেয়েছিলেন। সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা ও ছায়া এই চারজন সূর্যের পত্নী। মনু সংজ্ঞার পুত্র। এই বংশে রাজাদের জন্ম হয়। যম ও যমুনাও সংজ্ঞার সন্তান। রেবত রাজ্ঞীর গর্ভে উৎপন্ন। সূর্যের ঔরসে প্রভা প্রভাত নামে পুত্র ও ছায়া সাবর্ণি মনু শনি তপতী ও বিষ্টির জন্ম দেন। ইক্ষ্বাকু নভগ ধৃষ্ট শর্যাতি নরিষ্যন্ত নাভাগ অরিষ্ট করুষ ও বৃষধ্বজ এই নয়জন বৈবস্বত মনুর সমগুণ-সম্পন্ন পুত্র এবং ইলা জ্যেষ্ঠা ও বরিষ্ঠা এই তিন কন্যা। ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি। বিকুক্ষির শতপুত্র, জ্যেষ্ঠ ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্র সুযোধন। সুযোধনের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিশ্বক, বিশ্বকের পুত্র দমক। শর্যাতি দমক থেকে উৎপন্ন, শর্যাতির পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্তি। শ্রাবস্তি নগরা এঁরই নির্মিত। শ্রাবস্তির পুত্র কুবলয়, তাঁর পুত্র ধুন্ধুমারি, ধুন্ধুমারির দৃঢ়াশ্ব প্রভৃতি তিন পুত্র। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত। রোহিতের পুত্র হরিৎ, হরিতের পুত্র ধুন্ধু, ধুন্ধুর সুদেব ও বিজয় নামে দুই পুত্র। বিজয়ের পুত্র কুরুক, বৃক কুরুকের পুত্র, বৃকের পুত্র বাহু, বাহুর পুত্র সগর, সগরের পৌত্র অংশুমান, তাঁর পুত্র দিলীপ ও দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এঁরই তপস্যায় প্রীত হয়ে শিব বর দেন, তাতে জগৎ রক্ষার জন্য দশ অযুত দুই হাজার দুশো বৎসর তিনি মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করেন। শিবের বর পাবার পর ভগীরথ রাজত্ব করে জগৎকে ইন্দ্রজাল মনে করে রাজ্য ভোগ থেকে বিরত হলেন এবং জাবাল মুনির প্রপন্ন হয়ে তাঁর অনুগ্রহে শিবজ্ঞান লাভ করলেন। তাতেই তাঁর পরম সিদ্ধিপ্রাপ্তি হল।

ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের পুত্র অযুতায়ু। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সুধামা। শিব এই সুধামাকে গাণপত্য পদ দিয়েছিলেন। সুধামার পুত্র কল্মাষপাদ, কল্মাষপাদের ক্ষেত্রজ পুত্র বশিষ্ঠ সম্ভূত অশ্মক। অশ্মকের পুত্র নকুল, নকুলের পুত্র শতরথ, শতরথের পুত্র ইলবিল, তাঁর পুত্র বৃদ্ধশর্মা। বিশ্বসহ বৃদ্ধশর্মার পুত্র। খট্বাঙ্গ তাঁর পুত্র, খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, রঘু দীর্ঘবাহুর পুত্র, অজ রঘুর পুত্র।

রামচরিত

অজ থেকে উৎপন্ন রাজা দশরথের লোক বিশ্রুত ও ধর্মজ্ঞ চার পুত্রের নাম রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন। রাম স্বয়ং নারায়ণ। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও শিব পরায়ণ। জানকী তাঁর পত্নী। জনক পূর্বকালে তপস্যায় ভবানীকে আরাধনা করায় পার্বতীর অংশে তিনি উৎপন্ন হন। প্রীত হয়ে শিব জনক রাজাকে শরাসন দান করেন। রাম জনকের গৃহে স্থিত সেই ধনু ভগ্ন করলেন। ব্রহ্মজ্ঞ-প্রধান জনক গুণশালী রামের পরাক্রম দেখে তাঁকে সীতা দান করলেন। পিতা দশরথ যখন রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করেন, তখন তাঁর প্রিয় বনিতা কৈকেয়ী তা নিবারণ করলেন। বললেন, আপনি পূর্বে যে বর দিয়েছিলেন, তার ফলে আমার পুত্র ভরতকে রাজা করতে হবে। কৈকেয়ীর এই কথা শুনে দশরথ ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করে রামকে লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে পাঠালেন। পৌলস্ত রাবণ রাক্ষস বনবাসী রামের পত্নীকে দেখে তাঁকে লঙ্কায় হরণ করে নিয়ে গেল। তারপর রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে দেখতে না পেয়ে সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে বানর রাজ সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলেন। সুগ্রীবের সচিব বানর বীর হনুমান রাবণের পুরীতে গিয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়ন নীলকমললোচন জনকনন্দিনী সীতাকে দেখতে পেলেন। হনুমান সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তাঁকে একটি রামের অঙ্গুরীয় দিলেন। তাই দেখে

সীতা আনন্দিত হলেন। তারপর হনুমান সীতাকে আশ্বাস দিয়ে রামের নিকটে ফিরে এলেন। রাম হনুমানকে আগত দেখে অতি আনন্দে উৎফুল্ল চোখে হনুমানের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হলেন। তারপর মহামনা রাম সমুদ্রে সেতু বন্ধন করে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভাইদের সঙ্গে রাবণকে বধ করলেন। তারপর অশোক বনের মধ্যে স্থিত সীতাকে আনয়ন করলেন। শিব পরাক্রম রঘুনন্দন রাম সেতুর মধ্যে শিব প্রতিষ্ঠা করে শিব ভক্তি প্রাপ্ত হলেন। সেতুব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সেই পিনাকপাণি মহাদেব রামেশ্বর নামে খ্যাত। রামেশ্বর শিবের দর্শন মাত্রে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়। তার পর রাজাবলোচন রাম বাজ্যাভিষিক্ত হয়ে সমস্ত পৃথিবী ধর্মত পালন করে অশ্বমেধ যজ্ঞে দেবদেব শিবের পূজা করলেন। তারপর তাঁর প্রাসাদে স্বপদ প্রাপ্ত হলেন।

রামচরিত আমি সংক্ষেপে বললাম। বাল্মীকি ইহা বিস্তৃত রূপে বলেছেন। রামের দুই পুত্র লব ও কুশ। উভয়েই সুব্রত সত্যসন্ধ মহাবীর্য ও শিব পরায়ণ। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, তার পুত্র নল ও নলের পুত্র নভ। নভের পুত্র চন্দ্রাবলোক, তাঁর পুত্র তারাপীড়, তাঁর পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরির পুত্র ভানুজিৎ। এই সব রাজা ইক্ষ্বাকু কুলসম্ভূত। এঁরা সকলেই ধর্মাত্মা মহাসত্ত্ব কীর্তিমান ও দৃঢ়ব্রত। যে ইক্ষ্বাক্ষু বংশ পাঠ করে, সে সমস্ত পাপমুক্ত হয়ে সূর্যলোকে বসতি লাভ করে।

চন্দ্রবংশ

সূত বললেন, ইলার পুত্র পুরূরবা নামে পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি উর্বশীর গর্ভে ছয়জন প্রথিত তেজ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁদের নাম আয়ু মায়ু অমায়ু বিশ্বায়ু শতায়ু ও শ্রুতায়ু। এঁরা ছজনই দেবযোনি। স্বর্ভানু তনয়ার গর্ভে আয়ুর পাঁচ পুত্র হয়। লোক বিখ্যাত নহুষ তাঁদের জ্যেষ্ঠ। পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে

নহুষের পাঁচ পুত্র জন্মে। তার মধ্যে যযাতি বিখ্যাত। যযাতির দুই পত্নী, শুক্রের কন্যা দেবযানী প্রথমা এবং বৃষপর্বা অসুরের কন্যা শর্মিষ্ঠা দ্বিতীয়া। এঁদের উভয়ের সন্তানের কথা বলছি।

যদু ও তুর্বসু দেবযানীর পুত্র, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু শর্মিষ্ঠার পুত্র। ধীমান যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র প্রশংসনীয় পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বৈরাগ্য যোগে বনে গেলেন। শতজিৎ যদুর পুত্র, শতজিতের পুত্র হৈহয়, তাঁর পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র ধর্মনেত্র, তাঁর পুত্র ধনক, ধনকের পুত্র কৃতবীর্য এবং তাঁর তিন পুত্র কার্তবীর্য, কৃতাগ্নি ও কৃতবর্মা। কার্তবীর্য রাজার শত পুত্র, তার মধ্যে শূরসেন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র মহাত্মা নরপতি। তাঁরা শিব পরায়ণ ও শিবের বর প্রাপ্ত। অতিমান জয়ধ্বজ হরি পরায়ণ ছিলেন। তাঁর পুত্রেরা তালধ্বজ নামে খ্যাত। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র। এঁরা সকলেই যাদব নামে পরিচিত।

বিশ্রুত-উর্বশী সংবাদ

বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত, তাঁর পত্নী পতিব্রতা। একদা যমুনার তীরে পত্নীর সঙ্গে ক্রীড়ারত রাজা বীণাবাদন-লালসা উর্বশীকে দেখতে পেলেন। রাজা কামে পীড়িত হয়ে উর্বশীকে বললেন, আমি তোমার সঙ্গে ক্রীড়ায় ইচ্ছুক হয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর। উর্বশী রাজার কথা শুনে এবং তাঁকে মদনোপম দেখে বহুকাল তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া করলেন। রাজা বিশ্রুত সহস্র বৎসর গত হবার পর কাম ভোগে বিরক্ত হয়ে উর্বশীকে বললেন, এরকম ভোগে প্রয়োজন নেই, এবারে আমি নিজের রাজধানীতে ফিরব।

উর্বশী বললেন, আপনি যাবেন না, আমার প্রীতির জন্য আপনি এখানেই থাকুন।

রাজা বললেন, যশস্বিনী, পুরাতে গিয়ে শীঘ্রই আমি আবার তোমার নিকটে আসছি।

তারপর রাজা উর্বশীর অনুমতি পেয়ে নিজের নগরীতে গেলেন।

সেখানে তিনি পতিব্রতা পত্নীকে দেখে ভয়ে বিহ্বল হলেন। ভামিনী পতিব্রতা নিজের মহিমায় পতির অভিপ্রায় অবগত হয়ে বললেন, ভয় পাবেন না রাজা, আপনার দোষ নেই। এ সব মদনেরই কর্ম। কাম থেকে স্বর্গলাভ হয়, আবার নরক প্রাপ্তিও ঘটে। বিধিপূর্বক কাম সেবায় স্বর্গ এবং অবিধিপূর্বক কাম সেবায় নরক। কিন্তু আপনি বিধি পরিত্যাগ করে কাম সেবা করেছেন বলে মহাপাপ জন্মেছে, আপনি প্রায়শ্চিত্ত করুন।

রাজা পত্নীর কথা শুনে কণ্বের আশ্রমে গেলেন। সেখানে তাঁর বাক্যে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় জেনে হিমালয় যাত্রা করলেন। পথে দেখতে পেলেন, অরিন্দম বিশ্বাবসু গন্ধর্ব দিব্য মালা বিভূষিত হয়ে কান্তার সঙ্গে ক্রীড়া করছেন। সেই মালা দেখে রাজশ্রেষ্ঠ বিশ্রুতের উর্বশীকে মনে পড়ল। এ মালা উর্বশীরই যোগ্য আর কারও নয়, মনে মনে এই কথা ভেবে রাজা সেই মালা কেড়ে নিতে উদ্যত হলেন। গন্ধর্বের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করে রাজা সেই মালা কেড়ে নিয়ে অপ্সরার উদ্দেশে চললেন। উর্বশীর অন্বেষণে রাজা সমগ্র ভূমণ্ডল ভ্রমণ করলেন। বন পর্বত দ্বীপ ও জনপদগুলি সম্পূর্ণ রূপে পরিভ্রমণ করেও তিনি উর্বশীর দর্শন পেলেন না। তার কারণ সেই আকাশচারিণী অপ্সরা শিবের অনুগ্রহে তিরোহিত হয়ে অবস্থিতি করছিল। রাজা মহর্লোকে গিয়ে নারদ মুনিকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে যথাবিধি অভিবাদন করে লজ্জিত ভাবে পার্শ্ববর্তী হলেন। মুনিপুঙ্গব নারদ রাজাকে কুশল প্রশ্ন করলেন। উর্বশীর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত রাজা নারদকে বললেন, ভগবন্, আপনি কোথা থেকে আসছেন? উর্বশীকে কি আপনি সেখানে দেখেছেন, বা তিনি কি সেখানে আছেন? যদি থাকেন তো বলুন।

নারদ মুনি রাজার মনোগত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বললেন, সুমেরুর দক্ষিণে মানস সরোবর, উর্বশী সেখানে ছিলেন। আমি ব্রহ্মার কাজের উদ্দেশে সেখানে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই এখানে

এসেছি। এখন সত্যলোকপতি যেখানে আছেন, সেখানে পুনরায় যাচ্ছি।

রাজা নারদ মুনির এই কথা শুনে তাঁর অনুজ্ঞা নিয়ে শীঘ্র সেই প্রদেশে গিয়ে উর্বশীর দর্শন পেলেন এবং সেই মালাটি তাঁকে দিলেন। উর্বশী সেই মালায় ভূষিত হলেন। তার পর তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া করতে করতে আরও শত বৎসর অতীত হল। এক সময় উর্বশী রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা, নিজের রাজধানীতে গিয়ে আপনি কী করেছেন? আমাকে যদি ভালবাসেন তো তা বলুন।

উর্বশী এই কথা জানতে চাইলে রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। রাজার কথা শুনে উর্বশী তাঁকে বললেন, এর পর আপনার আর আমার সঙ্গে অবস্থান বিধেয় নয়। কণ্ব আপনাকে ও আপনার পত্নী আমাকে অভিশাপ দেবেন।

তন্বঙ্গী উর্বশী এ কথা বললেও রাজা তাঁকে ছাড়লেন না। উর্বশী রাজার এই অত্যধিক আগ্রহ দেখে নিজের শরীরকে বলি পলিতাকীর্ণ জরাযুক্ত করলেন। তাই দেখে রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে পরিত্যাগ করে তপস্যায় স্থিরসংকল্প হলেন। রাজা বারো দিন শুধু কন্দ মূল ফল খেয়ে কাটালেন। তারপর বারো দিন বায়ু আহারে থেকে কণ্ব মুনির আশ্রমে গেলেন। শিবের ধ্যানে তৎপর কাম গুণান্বিত কণ্ব মুনিকে দেখে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং অকপটে নিজের চরিত্রের কথা তাঁকে বললেন। মুনি তাঁর পাপের কথা বিদিত হয়ে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিলেন। রাজাকে তিনি কাশীতে পাঠালেন। সেখানে গঙ্গাস্নান তর্পণ ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করে পাপমুক্ত হয়ে তিনি নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের ধন দান করে রাজা পালন করতে লাগলেন।

যদুবংশ

উর্বশীর গর্ভে বিশ্রুতের সাত পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল।

যদুর পুত্র ক্রোষ্টুর বংশধররা সকলেই সৎ কীর্তিশালী। তার মধ্যে মুখ্য ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করছি, অপ্রধান ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করছি না। ক্রোষ্টুর বংশে ক্রথ বিদর্ভ ও কোশলের উৎপত্তি। তারপর সাত্বত, তারপর মহাভোজ, ভোজ, সত্যবাক সত্যক, সত্যকের পুত্র সাত্যকি, ক্রথক, সুষেণ, সুভোজ, নরবাহন, আহুক, দেবক, শ্রীদেব, দেব সুব্রত, উগ্রসেন, কংস এবং মহাযশা বসুদেব উৎপন্ন হন। উগ্রসেনের কন্যা দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে ভৃগুর শাপে সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর আবির্ভাব হয়। রোহিণী নামে বসুদেবের শোভনা পত্নীর গর্ভে সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি। ইনি সাক্ষাৎ অনন্তদেব। মাধবের যে ষোড়শ সহস্র পত্নী তাঁদের গর্ভে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি অসংখ্য পুত্রের উৎপত্তি হয়। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ সনাতন পরমাত্মা। তিনি স্বয়ং যোগযুক্ত মায়াবী বিশ্ব ভোক্তা। তিনি নিত্য তৃপ্ত। তথাপি পিনাকী উমাপতি মহাদেবকে সর্বস্বরূপ জ্ঞান করে লিঙ্গে তাঁকে পূজা করেন। জনার্দন মহাদেবের নিকটে বিবিধ বরলাভ করে ত্রিলোকে অজেয় হয়েছেন। কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শৈব আর নেই। অতএব কৃষ্ণের পূজা করলেই শিব সুপূজিত হন। বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করলে শিব পরাঙ্মুখ হন। অতএব শিব পরায়ণ ব্যক্তিরা বিষ্ণুর পূজা অবশ্যই করবে। আর বিষ্ণুর ভক্তগণও শিবের পূজা করবে।

দ্বিজগণ, যদুবংশের কথা আমি সংক্ষেপে বললাম। ইহা শ্রবণ বা পাঠ করলেও সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়।

শিবির উপাখ্যান

সূত বললেন, এইবারে মন্বন্তরের কথা আপনাদের বলছি, শুনুন ছয় মনু অতীত হয়েছেন, সপ্তম মনু এখন বর্তমান। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু। তারপর স্বারোচিষ উত্তম তামস রৈবত ও চাক্ষুষ এই পাঁচ মনু

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা কল্পারম্ভের প্রস্তাবে বলেছি। স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবগণ, বিপশ্চিৎ ইন্দ্রের নাম। এবারে সপ্ত ঋষিদের উল্লেখ করছি। তাঁরা হলেন উর্জ স্তম্ভ প্রাণ দান্ত ঋষভ তিমির ও শর্বরীবাণ। উত্তম মন্বন্তরে সুধামা নামে দেবগণ। প্রতর্দন শিব সত্য ও বশবর্তী দেবতারা এই চার শ্রেণী ও বারোটি গণে বিভক্ত। মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রের নাম সুদান্তি। রজ গোত্র উর্ধ্ববাহু সবল অনঘ সুতপা ও শুক্ক এঁরা সপ্তর্ষি। পূর্ব মর্ত্য সুধীগণ তামস মন্বন্তরের দেবতা। জ্যোতি ধর্ম পৃথু কল্প বৈত্রাগ্নি সবল ও পীবর এঁরা সপ্তর্ষি। সিদ্ধাচার সেবিত সুর রাজের নাম শিবি।

সমস্ত বস্তুতে অনিত্যত্ব জ্ঞান হওয়ায় শিবি স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করে পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করে বৃহস্পতিকে বললেন, রাজত্ব করার প্রয়োজন নেই, কারণ এতে তুচ্ছ সুখ। গুরু, কৈবল্য লাভ কী করে হয়, আপনি তা প্রকাশ করে বলুন।

বৃহস্পতি বললেন অনন্ত গুণাধার পরমানন্দ বিগ্রহ মহাদেব আছেন, তাঁকেই ধ্যান করলে পুরুষের কৈবল্য লাভ হয়। স্মরণ মাত্র শিব মোহ পাশে নিবদ্ধ ব্যক্তির মহামোহ স্বরূপতা হরণ করেন এবং মুক্তিদান করেন। ইহা বেদেরই তাৎপর্য। যিনি পরম জ্যোতি স্বরূপ সর্বাশ্রয় অক্ষয় পরম ব্রহ্ম, শীঘ্র সেই সর্বানুগ্রহকারী শিবের শরণাপন্ন হও। তিনিই সমস্ত জ্যোতির পরম জ্যোতি, আনন্দ রূপী ও তমোতীত। শৈবতত্ত্বের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। হে অসুর-সূদন, সেই মহেশ্বরকেই বিশ্বাত্মা পরম ব্রহ্ম বলে জানবে। সমস্ত জগৎ সেই শিব স্বরূপ। যাঁরা আত্মাকে শিব থেকে অভিন্ন দেখেন, তাঁরা শিবকেই দর্শন করেন। পুনঃ পুনঃ তাঁদের সংসারে আসতে হয় না। পরমাত্মা মহেশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। দেবরাজ, এই রকম নিশ্চিত বুদ্ধি যাঁদের আছে, তাঁরাই কৃতার্থ হয়ে থাকেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা এবং সংযত চিত্ত যোগীরা যাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরই শরণাপন্ন হও। মহত্তত্ত্ব থেকে স্থূল জগৎ পর্যন্ত যাঁতে লীন হয় এবং

যাঁর থেকেই পুনরায় উৎপন্ন হয়, তিনিই পিনাকপাণি। এই চরাচর বিশ্ব যাঁর লীলা বিলাস সম্ভূত এবং যাঁর লীলা ভাবেই বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই মহেশ্বর। যাঁর আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টির কাজে, বিষ্ণু পালনের কাজে ও রুদ্র সংহারের কাজে নিযুক্ত, তিনি শূলপাণি। যাঁর লেশ মাত্র প্রসাদে মরণ ধর্মী মানুষ অমরত্ব লাভ করে, সেই বৃষধ্বজকে ভজনা কর। ক্ষণকাল মাত্র ধ্যান পূজা বা স্মরণ করলেই যিনি মুক্তি প্রদান করেন, সেই মহেশ্বরকে ভজনা কর। সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার এই ত্রিগুণ ভেদে যাঁর ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হর নামে খ্যাত, সেই ঈশ্বরকে ভজনা কর। সর্ব ভূত যাঁর অন্তর্গত, জগৎ চক্র যিনি ঘোরাচ্ছেন, বেদ যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, সেই রুদ্রের শরণ নাও। বেদ-বাদীরা মুক্তির জন্য যজ্ঞে যাঁর অর্চনা করে কর্মফল লাভ করেন, সেই হরের শরণ নাও। বীতনিদ্র শ্বাসজেতা ক্ষীণকর্মা পুরুষ ধ্যান করলে যে তত্ত্বের স্ফূর্তি হয়, তাই শৈব তত্ত্ব বলে জানবে। শক্র, অজ্ঞান রজ্জুতে আবদ্ধ মনুষ্যাদি প্রাণীর মোচনের জন্য মহাদেব ভিন্ন আর কাউকে আমি দেখি না। অতএব তুমি শিবের আরাধনা কর, তিনি প্রসন্ন হয়েই তোমাকে উত্তম কৈবল্য পদ প্রদান করবেন।

গুরুর এই কথা শুনে দেবরাজ শিবের আরাধনার জন্য বদরিকা-শ্রমে গেলেন। সেখানে তিনি জটাধারী জিতেন্দ্রিয় ও ভস্মনিষ্ঠ হয়ে মন্দাকিনীর জলে স্নান করে মন্ত্রপূত ভস্ম মেখে দেবদেবের পূজা করলেন। তারপর শুধু শিবের ধ্যান পরায়ণ হয়ে শিবমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। এই ভাবে চোদ্দ হাজার বৎসর অতীত হল। তারপর ত্রিপুরারি শিব দেবরাজের তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁকে বললেন, শত-ক্রতু, তোমার তীব্র তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর নাও। দুর্লভ হলেও তোমার অভীষ্ট প্রার্থনা আমি পূর্ণ কবব।

মহেশ্বরের এই কথা শুনে ইন্দ্র তাঁকে বিবিধ স্তোত্রে স্তব ও প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, তোমার দর্শনেই আমি চরিতার্থ হয়েছি, আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন নেই। তোমাতে আমার ভক্তি

থাক। যে তোমার ভক্তি-সুধার আস্বাদ পেয়েছে, সেই পরমানন্দ লাভের পর আর কী কষ্ট থাকতে পারে! সেই প্রাণী তো তখন পূর্ণ কাম। হে দেবেশ, যতদিন লোকের তোমাতে ভক্তি না হয়, ততদিনই তার অস্থির চিত্ত ইতর বস্তুর দিকে যায়। তোমার চরণ-কমলে পরম ভক্তি না হওয়া পর্যন্ত সংসার সাগর পার হওয়া অসম্ভব। তোমার করুণা যত দিন না হয়, তত দিন প্রাণী বারে বারে পড়ে সংসারের গর্তে। সংসারের এই ভয়ঙ্কর বিষবৃক্ষ শুধু তোমার ভক্তির কুঠারেই ছেদন করা যায়, অন্য ভাবে নয়।

ইন্দ্রের এই কথা শুনে শিব তাঁর প্রতি কৃপার কটাক্ষপাত করলেন এবং করযুগলে তাঁকে স্পর্শ করে গাণপত্য প্রদান করলেন। ব্রহ্মাদি দেবতারা কর্মফল অনুসারে সৃষ্ট রক্ষিত লীন ও বার বার উৎপন্ন হন। স্বর্গ ও নরক ভোগ, তির্যক ও মানুষ জন্ম এবং পুনরায় ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি এই ভাবে চক্র পরম্পরা প্রচলিত। যাঁরা শিবের গণপতি, তাঁদের আর সংসারে ফিরতে হয় না, অভিলাষ মতো ভোগ্য ভোগের পর শিবের সাযুজ্য লাভ হয়। গণ নায়করা স্বেচ্ছায় শরীর-ধারী ও ইচ্ছামতো আচারসম্পন্ন। শিবের সঙ্গে বিবিধ ভোগের পর তাঁরা শিবপদ লাভ করেন। দেবরাজ শিবিকে এই দুর্লভ গাণপত্য বর দিয়ে শম্ভু সেখানেই অন্তর্হিত হলেন এবং শিবি তাঁর আজ্ঞায় নিজের নগরীতে ফিরে এলেন। সেখানে তিনি এক মন্বন্তর শিব পূজায় রত এবং শিবের কথা আলোচনা পরায়ণ হয়ে রইলেন। তার পর তিনি শিবের নিকটে চণ্ড নামে গণপতি হলেন। শিবলোকে তিনি বৃষধ্বজ ত্রিনেত্র জটাজুটধারী চন্দ্রশেখর শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশ চতুর্ভুজ ত্রিশূল-অক্ষমালা-খড়্গা-অভয়-মুদ্রাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত ও সর্বাভরণ ভূষিত হয়ে দ্বিতীয় নন্দীশ্বরের মতো শোভা পেতে লাগলেন। দ্বিজগণ, মানুষের সর্বপাপনাশক ও সর্বসিদ্ধিপ্রদ এই শিবি চরিত আপনাদের আমি সম্পূর্ণ রূপে বললাম। সূর্য বলেছেন যে শ্রদ্ধা সহকারে এই শিবি চরিত পাঠ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

প্রলয়ের বর্ণনা

সূত বললেন, রৈবত মন্বন্তরের ইন্দ্রের নাম বিভু। সেই মন্বন্তরে দেবতারা বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি চার শ্রেণীতে বিভক্ত। হিরণ্য-রোমা বিশ্বশ্রী ঊর্ধ্ববাহু ইন্দ্রবাহু সুবাহু পর্জন্য ও মহামুনি এঁরা সপ্তর্ষি। এই সপ্তর্ষি প্রিয়ব্রত বংশ সম্ভূত। চাক্ষুষ মন্বন্তরের ইন্দ্রের নাম মনোজব। আয়ু সম্ভূত ভাব প্রভৃতি এই মন্বন্তরের দেবতা। সুমেধা বিরজা হবিস্মান উত্তম বুধ অত্রি ও সহিষ্ণু এঁরাই সপ্তর্ষি। বিবস্বানের পুত্রের নাম বৈবস্বত মনু। সম্প্রতি ইনিই বর্তমান। এঁরা সময়ে মরুৎগণ আদিত্যগণ রুদ্রগণ ও বসুগণ দেবতা। ইন্দ্রের নাম পুরন্দর। ইনি অসুর দর্পঘাতী। বশিষ্ঠ কশ্যপ অত্রি জমদগ্নি গৌতম বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ এঁরা সপ্তর্ষি। দ্বিজগণ, এই আপনাদের কাছে আমি অতীত ও বর্তমান মন্বন্তরের কথা কীর্তন করলাম। এর পর প্রলয়ের বৃত্তান্ত শুনুন।

পুরাণ শাস্ত্রে নিত্য নৈমিত্তিক প্রাকৃত ও আত্যন্ত এই চার রকম প্রলয়ের কথা বলা হয়েছে। জগতে প্রতিদিন যে প্রাণীক্ষয় তা নিত্য প্রলয়, কল্পান্তের ভূত সংহার নৈমিত্তিক প্রলয়। মহত্তত্ত্ব থেকে স্থূল পদার্থ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষয়ের নাম প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয় জ্ঞান সাধ্য। সেই জ্ঞান শিবভক্তি যোগে লভ্য, এই হল শ্রুতি বাক্য। সহস্র চতুর্যুগের অবসানে ভূতক্ষয় কাল উপস্থিত হলে শত বর্ষ ব্যাপী তীব্র অনাবৃষ্টি হয়ে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়। গভস্তিমালী ভাস্কর তখন সপ্তরথী হয়ে রশ্মিজাল দিয়ে সাগর শোষণ করেন। সেই সময়ে তাঁর রশ্মিজাল প্রদীপ্ত হয়, সপ্ত রথের সপ্ত সূর্যই সর্বতোভাবে রশ্মি সঙ্কুল হয়ে থাকেন এবং তাঁদের রশ্মির প্রভাবে শৈল সাগর ও দ্বীপ সহ সমগ্র ভূমণ্ডল দগ্ধ হতে থাকে। সূর্যের তেজাগ্নিতে সব কিছু দগ্ধ হতে থাকলে পরস্পরের ব্যবধান দূর হয়ে এক অগ্নিতে পরিণত হয়। সেই অগ্নির শিখায় নিখিল জগৎ দগ্ধ হয়ে যায়। রুদ্র তেজ বিজৃম্ভিত অগ্নি সমগ্র

পৃথিবী দগ্ধ করে স্বর্গ ও পাতালও দগ্ধ করেন। তাঁর শিখার জাল শত যোজন বিস্তৃত হয়ে উত্থিত হয়। সেই সংবর্তক অনল যক্ষ রাক্ষস পন্নগের সহিত চতুর্লোক দগ্ধ করেন। তখন এই জগৎ একটি তপ্ত লৌহ পিণ্ডের মতো প্রতিভাত হয়। তার পর সূর্য মণ্ডল থেকে ঘোর গর্জন চপলা-বিলসিত সংবর্তক-সদৃশ নানা বর্ণের ভয়ঙ্কর জলদ জাল উত্থিত হয়। তারা ব্রহ্ম প্রেরিত হয়ে গজশুণ্ডাকৃতি ধারায় শত বৎসর বারি পাত করে। তখন কল্পান্ত পাবক জলরাশিতে নাশ প্রাপ্ত হয়, দ্বীপ পর্বত যুক্ত পৃথিবী আবার জলে পূর্ণ হল। তখন সমগ্র পৃথিবী দ্রবীভূত হয়ে যায়। সেই ঘোর একার্ণবে দেবদেব ব্রহ্মা শিবের ধ্যান করে যোগনিদ্রায় শয়ান হন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ, এরই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এর পর প্রাকৃত প্রলয়ের কথা বলছি, শুনুন।

ব্রহ্মার শত বর্ষ অতীত হলে কালাগ্নি রুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করে পার্বতীকে অবলোকন ও পরমানন্দ আস্বাদন করে তাণ্ডবনৃত্য করতে থাকেন। একমাত্র হিমালয় নন্দিনী পরমাশক্তি শিবাই নিত্যা এবং মহাদেবই নিত্য। তাঁদের উভয়ের কোন ভেদ নেই। তখন এক শক্তি ও মহেশ্বরই থাকেন। পরমাশক্তির সঙ্গে মহেশ্বর ভিন্ন আর কোন সত্তা তখন থাকে না, এই বেদবাক্য। সহস্র শীর্ষ প্রদীপ্ত সহস্র চক্ষু সহস্র চরণ সহস্র বাহু সহস্রাকৃতি ত্রিশূলধারী দংষ্ট্রাকরালাস্য বিশ্বাত্মা পুরুষ ঈশ্বর পরব্রহ্মময় শিব ব্রহ্মাদি বিশ্ব দগ্ধ করে নিজের তেজে অধিষ্ঠিত হন। স্বগুণ সংযুত পৃথিবী জলে লীন হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে ও আকাশ ভূতাদি অহঙ্কারে লীন হয়। ইন্দ্রিয়রা তৈজস অহঙ্কারে, দেবতারা সাত্ত্বিক অহঙ্কারে এবং ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়। মহতত্ত্ব ব্রহ্মাতে এবং ব্রহ্মা প্রকৃতিতে লীন হন। এই ভাবে ভূতগণের সঙ্গে সব কিছু সংহার করে শিব একমাত্র রূপে বর্তমান থাকেন। আর কেউ থাকে না। পার্বতীকান্তের ইচ্ছাতেই প্রলয় হয়, অন্য ভাবে হয় না। তত্ত্বদর্শীরা বলেন যে ব্রহ্মাদির পুনর্বার সৃষ্টি হয় না। সেই শিবেরই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও

মহেশ্বর এই তিন শক্তি। শূলপাণি যে সেই মূর্তি বা শক্তিত্রয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বেদে এই কথা আছে। ভেদদর্শী লোকেই এক মহাদেবকেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র বায়ু ইন্দ্র রবি শশী অগ্নি যম বরুণ প্রভৃতি বহু প্রকারে কীর্তন করেন। সর্বশক্তিময় শঙ্কর শিবই সেই সেই রূপ অবলম্বন করে সকলের ফল দান করেন। অতএব সকলকে পরিত্যাগ করে একমাত্র সদাশিবেরই পূজা করবে। তিনি আদি মধ্য অন্তরহিত নির্গুণ ও তমোতীত। দ্বিজগণ, অন্য দেবতা আরাধনায় ক্রমে মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু মহেশ্বরের আরাধনায় সেই জন্মেই মুক্তিলাভ হয়। সূর্য যে ভাবে বলেছেন, সেই ভাবেই আমি আপনাদের নিকটে প্রণয়ের বর্ণনা করলাম। এবারে আর কী শুনতে চান বলুন।

শিবের ত্রিপুর দাহ

ঋষিরা বললেন, সৃষ্টি প্রলয় বংশ মন্বন্তর ও বংশ সম্ভূতদের চরিত্র কথা সমস্তই শুনলাম। এখন আমরা ত্রিপুরারির চরিত্র শ্রবণে অভিলাষী হয়েছি। পুরাকালে শিব কী ভাবে লীলাক্রমে এক শরে ত্রিপুর দগ্ধ করেছিলেন, তা শোনবার জন্য আমরা কৌতূহলী হয়েছি।

সূত বললেন, ঋষিগণ, ভগবান সূর্য পুরাকালে মনুকে যা বলেছিলেন, শূলপাণির সেই চরিত্র আপনারা সকলেই শুনুন। এই শিব চরিত্র শ্রবণকারীর পাপ নাশ করে, সমস্ত দুষ্ট নিবারণ করে এবং সমস্ত বিপদ সংযমন করে। তাদের এ উত্তম কর্ণামৃত। কার্তিকেয় তারক নামে যে দৈত্য বিনাশ করেন, তার তিনটি পুর ছিল। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করে তারা দর্পিত হয়েছিল। মহাবলশালী বিদ্যুন্মালী তারকাখ্য ও কমলাখ্য নামে তিনজন দানব প্রিয় কামনায় যম নিয়ম যুক্ত ও পবনাহারী হয়ে ঘোর তপস্যা করতে লাগল। ব্রহ্মা প্রীত হয়ে তাদের এই উত্তম বর দিলেন যে তারা সমস্ত দেবাসুরের অবধ্য হবে। সেই তিনজন অসুর ব্রহ্মার নিকটে অমর রাজত্বও প্রার্থনা করল। তাতে

ব্রহ্মা বললেন, তোমরা অন্য মনোমত বর প্রার্থনা কর, আমি শীঘ্রই তা তোমাদের দেব।

তারা তখন পরস্পর বিচার করে ব্রহ্মাকে বলল, বিভু, আমরা ত্রিপুর রচনা করে ত্রিলোকে বিচরণ করব এবং সহস্র বৎসর পর আমরা পরস্পর মিলিত হব, ত্রিপুরও মিলিত হবে। এই সময়ে পরস্পর মিলিত পুরত্রয়কে যিনি এক শরে বিনাশ করতে পারবেন, তিনিই আমাদের মৃত্যু স্বরূপ হবেন। সুরশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের এই বর দিন।

'তথাস্তু' বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন।

ময় দানব ক্রমে তাঁদের পুরত্রয় নির্মাণ করলেন। অসুরদের পৃথিবীস্থিত নগর লৌহময়, আকাশস্থিত নগর রজতময় এবং স্বর্গস্থিত নগর কাঞ্চনময় হল। এই সব নগর দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে শত যোজন হল। দিব্য লৌহময় পুর হল বিদ্যুন্মালীর, তারকাখ্যের হল রজতময় পুর এবং কমলাখ্যের সুবর্ণময় পুর হল। ময় দানবের বিস্তৃত গৃহ ত্রিপুরেই রইল। ময় দানব সেখানে দেব দানব পূজিত হয়ে বাস করতে লাগলেন। সেই ত্রিপুর ত্রৈলোক্যের মতো শোভা পেতে লাগল। সূর্য সন্নিভ বিমানরাজি এবং চারিদিক ঘিরে হস্তী অশ্ব সঙ্কুল পুরদ্বার ও অট্টালিকা মণ্ডিত হয়ে সেই ত্রিপুর শোভা পেতে লাগল। পুরত্রয়ে বিরাজ করতে লাগল সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব ও দিব্য স্ত্রীগণ। প্রতিটি গৃহের অগ্নিহোত্র বেদাধ্যয়নে মুখরিত হল এবং গুপ্ত গৃহে পরিশোভিত হল সেই সব গৃহ। দানব পত্নীরা সেখানে পতিব্রতা ও দানবরা শিব পূজায় রত। তাদের তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবতারাও হীন হয়ে পড়লেন। দেবতারা এই ত্রিপুরের ঐশ্বর্য দেখে ও তেজে দগ্ধ হয়ে বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে বললেন, ত্রৈলোক্য-অভয়প্রদ দেবদেব জগন্নাথ, ত্রিপুরাসুর ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

দেবতাদের এই কথা শুনে দানবমর্দন গোবিন্দ নিজের কর্তব্যের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। দৈত্যরা শিব পরায়ণ, শিব

তেজের অনলে তাদের পাপরাশি নিশ্চয়ই দগ্ধ হয়ে গেছে। কী ভাবে তাদের বধ করা যাবে! জগতে এমন কে আছে যে ত্রৈলোক্য হতার পর শিব পরায়ণ ব্যক্তি শিবের অনুগ্রহ ব্যতীত তাকে বধ করতে পারে! শম্ভুর সামান্য প্রসাদে আমি ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করেছি। ব্রহ্মা দেব দৈত্য সিদ্ধ মুনি মনু রাক্ষস সর্প গন্ধর্ব পিতৃ-মাতৃগণ গুহ্যক ভূত পিশাচ ও মানুষ, এঁরাও আমার মতো। শিবের অর্চনা না করে যারা সিদ্ধির অভিলাষী হয়, ত্রিজগতে তারা মূঢ় ও দুঃখভাগী। তাই সেই সুরশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে উগ্র যজ্ঞে অর্চনা করে তবেই দানবদের বধ করতে হবে।

এই কথা বলে কমলাপতি সুমেরুর উত্তর প্রদেশে গিয়ে যজ্ঞে রুদ্রাংশ দ্বারা সদাশিবের পূজা করলেন। তারপর নানা অস্ত্রধারী ত্রৈলোক্য দগ্ধ করতে পারে, এমন প্রভা সম্পন্ন ভূতেরা নির্গত হল। তাদের প্রস্থিত দেখে নারায়ণ বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে ত্রিপুর দাহ, মহাসুর ত্রয় বধ ও অসুরদের নিঃশেষে নিধন করে ফিরে এস। মহাবল ভূতেরা বিষ্ণুর এই কথা শুনে তাঁকে প্রণাম করে তাঁরই আদেশ অনুসারে ত্রিপুর যাত্রা করল। অযুত অযুত কোটি ভয়ঙ্কর দৃপ্ত ভূতেরা ত্রিপুর সন্নিধানে উপস্থিত হয়েই জ্ঞানশূন্য হল। তারপর সৎপথবর্তী দৈত্যরা ভূতদের পরাজিত করল। ভীতিগ্রস্ত হয়ে ইন্দ্রাদি দেবতারা পুনরায় এসে নারায়ণকে বললেন, রক্ষা করুন আমাদের।

অব্যয় বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতাদের দেখে ভাবতে লাগলেন, কী ভাবে দেবতাদের কার্য হবে! অভিচার ক্রিয়ায় তো ধর্মিষ্ঠ মহাত্মাদের নাশ হবে না, কারণ মহাভাগ দৈত্যরা সত্যব্রত পরায়ণ, শ্রৌত্র-স্মার্ত-ক্রিয়ানিষ্ঠ ও শিবের পূজারত। মায়ায় মোহিত করেই এই মহাসুরদের নিহত করতে হবে। সমগ্র ত্রিপুর নিহত করব, এই ভেবে বিষ্ণু নিজের শরীর থেকে মায়ী পুরুষের সৃষ্টি করলেন এবং অদৃষ্ট বিশ্বাস নাশক বিস্তৃত শাস্ত্র তাঁকে দিলেন।—শরীরই আত্মা, পারত্রিক গতি

নেই। সুরার মাদকতা শক্তির মতো মিলিত ভূত সমূহ থেকে চৈতন্য আবির্ভূত হয়। পরদ্রব্য অপহরণ করে কামসেবা করতে হয়। যে শাস্ত্রে এই সব কথা আছে, সেই শাস্ত্র উপদেশ দেবার জন্য বিষ্ণু মায়ীকে ত্রিপুরে পাঠালেন।

মায়ী সেখানে গেলেন। ত্রিপুরে প্রবেশ করে তিনি দানবদের মুগ্ধ করলেন। দানবরা বৈদিক কর্ম ও পরম্পরাগত শিব ভক্তি পরিত্যাগ করল। দানব রমণীরাও পাতিব্রত্য ত্যাগ করে স্বৈরিণী হল। বিষ্ণুর আদেশে নারদ মুনিও মায়ারূপ অবলম্বন করে শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিপুরে গেলেন। মহাত্মা নারদের উপদেশে স্ত্রীলোকেও প্রত্যক্ষ ফলাভিলাষী হল এবং পুরুষরাও প্রত্যক্ষ ফল কামনা করতে লাগল। তখন দানবরা পাষণ্ডমার্গ বহুল, বেদমার্গ ভ্রষ্ট ও শিব পূজায় পরাঙ্মুখ হল। বিষ্ণু ত্রিপুরে মায়া রূপে অধর্ম বাহুল্য সম্পাদন করে সর্বদেহীর রক্ষক মহাদেবের শরণাপন্ন হয়ে উত্তম স্তোত্রে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু দণ্ডবৎ প্রণত ও জলে অবস্থিত হয়ে একাগ্র চিত্তে বলতে লাগলেন, তুমি সর্বাত্মা, আর্তিহারী রুদ্র, নীলকণ্ঠ প্রচেতা শঙ্কর, তোমাকে নমস্কার। হে অসুরমর্দন, তুমিই আমাদের নিত্য উপায়। তুমি প্রকৃতি পুরুষ, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, হর্তা ও জগতের গুরু। জ্ঞানীরা তোমাকে যোগীদের হৃদয়পদ্মের মধ্যে অবস্থিত পরব্রহ্ম স্বরূপ বলেন। তাঁরা আরও বলেন, তুমি বরপ্রদ, সর্বাবাস ও স্বয়ম্ভু। আমরা তোমাকে দেখি নি বটে, কিন্তু তুমি জগতে যে দুই ভাগ করেছ, তাই দৈত্য অসুর ও ব্রাহ্মণ, তাই দেবতা ও বিশেষ অসুর। স্থাবর জঙ্গমও তাই। হে শম্ভু, ক্ষণকালের মধ্যে অসুরদের নিহত করে আমাদের রক্ষা কর। অন্য উপায় আর নেই। দৈত্যরা সকলেই মায়ায় মোহিত হয়েছে। সাগরে যেমন তরঙ্গাশ্রিত সফরী পরস্পর যুদ্ধ করে, জড়ের আশ্রয়ে জড়ীকৃত দেবাসুরও তেমনি জয়ের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করছে।

সূত বললেন, প্রাতঃকালে উঠে শুদ্ধ হয়ে যে এই পবিত্র স্তব

পাঠ বা শ্রবণ করে, তার সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়। বিষ্ণু রুদ্র মন্ত্রে এই ভাবে শিবের স্তব করলে শিব নন্দীর উপরে তার হাত রেখে এই কথা বললেন, তোমাদের কাজ, বিষ্ণুর মায়াবল ও ত্রিপুরে যা ঘটেছে, তা সবই আমি বিদিত আছি। সমস্ত দানবই এখন সদাচার ভ্রষ্ট এবং বেদ ও ধর্মনিন্দক হয়েছে। অতএব এখন তারা আমার বধ্য হয়েছে।

উমার সামনে মহাদেব এই কথা বলে কার্তিকেয় নন্দী ও গণ-নায়কদের সঙ্গে দিব্য ভবনে প্রবেশ করলেন। ব্রহ্মাদি দেবতারা তখন দ্বারে থেকে স্তব করতে লাগলেন। তারপর গণাগ্রগণ্য শূলপাণি নন্দী শিবের আদেশে বাহিরে এলেন। অভীষ্টার্থ প্রদাতা নন্দীকে দেখে দেবতারা তাঁকে বিবিধ স্তোত্রে স্তব করতে লাগলেন। ইন্দ্রের আদেশে আকাশচারী দেবতারা নন্দীর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করলেন। নন্দী তাতে সন্তুষ্ট হলেন।

সূত বললেন, নন্দীশ্বর এর পর পরম আনন্দে ব্রহ্মাদি দেবগণকে বললেন, শিবের সারথি সমেত রথ ও বাণ নির্মাণ করা আপনাদের উচিত। মহাদেব সেই রথে আরোহণ করে ত্রিপুর নাশ করবেন।

বিশ্বকর্মা তখন দেবাদিদেব শিবের জন্য পরম শোভাঢ্য সর্বদেবময় শুভ রথ নির্মাণ করলেন। চন্দ্র ও সূর্য সেই রথের দুই চক্র। শশি-কলা অব ও সূক্ষ্ম অর দ্বাদশ সূর্য। ছয় ঋতু নেমি। অন্তরিক্ষ সেই রথের পুষ্কর এবং মন্দর পর্বত হল রথনীড়, রথ কুবর উদয় পর্বত, অস্তাচল অধিষ্ঠান, কেশর শৈল মেরুস্থান, সংবৎসর রথবেগ, উত্তর ও দক্ষিণায়ন চক্রের মেখলাদ্বয়। মুহূর্ত রথাগ্র, কাষ্ঠা রথাবয়ব বিশেষ, ক্ষণ অক্ষদণ্ড, নিমেষ কুথা, লব কীল, আকাশ বরূথ, স্বর্গ-মোক্ষ দুই ধ্বজ, কর্ম ও বৈরাগ্য দণ্ডদ্বয়, যজ্ঞ দণ্ডাশ্রয় স্থান, দক্ষিণা সন্ধি, অর্থ ও কাম যুগাক্ষদ্বয়, প্রকৃতি ঈষাদণ্ড, বুদ্ধি রথের বিড্বল, অহঙ্কার কোণ, পঞ্চভূত উত্তম বল, দশেন্দ্রিয়ের অর্ধ পঞ্চেন্দ্রিয় ভূষণ ও পঞ্চেন্দ্রিয় উত্তম গতি, চতুর্বেদ অশ্ব, ষড়ঙ্গ অশ্বভূষণ, ধর্মশাস্ত্র মীমাংসা, পুরাণ ও ন্যায়

বাণ রক্ষার স্থান, মন্ত্র সমূহ ঘণ্টা, ছন্দসমূহ রথমধ্য, দিঙমণ্ডল রথপাদ, সমুদ্র চতুষ্টয় রথকম্বলিকা। গঙ্গা প্রভৃতি নদীরা সর্বাভরণ ভূষিতা শুভ্রবর্ণা রমণীরূপে চামর ধারণ করে রইলেন। আবহ প্রভৃতি সপ্ত বায়ু সোপানাবলী, ব্রহ্মা সারথি, প্রণব প্রতোদ অর্থাৎ চাবুক, গিরিরাজ শরাসন, সর্পরাজ মৌর্বী, সরস্বতী ঘণ্টা, বিষ্ণু বাণ, যম শল্য, স্বয়ং কালাগ্নি, শরের তীক্ষ্ণতা। এইভাবে সর্ব দেবময় রথ হল। তারপর ভগবান মহাদেব মুনিদের দ্বারা স্তুত হয়ে সেই দিব্য রথে আরোহণ করলেন। তারপর তিনি স্বকার্য বিঘ্নকর্তা দেব বিনায়ককে অবলোকন করে পিষ্টক বিশেষ ও মোদকাদি ভক্ষ্য ভোজ্য বিবিধ ফল ও মনোহর পুষ্প ও দীপে তাঁর পূজা করে পুরদাহের জন্য গমন করলেন।

শিবের আগে চললেন দেবতারা, তাঁদের আগে গণাধ্যক্ষরা এবং তাঁদেরও আগে চললেন সর্বলোক নমস্কৃত নন্দী। শিলাদতনয় নন্দী কোটি সূর্য সন্নিভ বিমানে আরোহণ করে দৈত্যদের বধের জন্য ত্বরায় গমন করলেন। দেবতারা, অস্ত্রধারী বাহনারূঢ় লোকপালরা, সিদ্ধ গন্ধর্ব অপ্সরা শংসিতাত্মা মুনিরা ও লোকজননী মাতৃগণ সকলেই শিবের চারিদিকে কৃতাঞ্জলিপুটে চললেন। আকাশচারী চারণেরা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। লক্ষ কোটি গণ পরিবৃত ভৃঙ্গী শঙ্কু কর্ণ মহাবল গোকর্ণ ত্রিপুর বিনাশের জন্য চললেন। কুন্দদন্ত মহাকাল ডিণ্ডী মুণ্ডী গণেশ্বর শতজিহ্ব সহস্রাক্ষ বীরভদ্র শিবাখ্য বিশিখ পঞ্চশিখ শতাস্য টঙ্কহস্ত পিশাচীশ পিনাকধারী এই সব গণাধ্যক্ষ ও বহু লক্ষ কোটি গণ মহাদেবকে চারি দিকে বেষ্টন করে ত্রিপুর নাশের জন্য যাত্রা করলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা যাঁর পাদ-পদ্মে প্রণত হলেন, সেই শিব উমা সমভিব্যাহৃত হয়ে সমস্ত লোকের হিতার্থ ত্রিপুর দাহের জন্য চললেন।

ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা বলতে লাগলেন, শূলপাণি এই চরাচর বিশ্ব ক্ষণকালের মধ্যে মনের দ্বারাই দগ্ধ করতে সমর্থ। তথাপি তিনি ত্রিপুর দাহের জন্য প্রমথদের সঙ্গে চললেন কেন? তিনি ত্রিপুর

দাহে অভিলাষী হলে রথের কী প্রয়োজন, শর শ্রেষ্ঠের কী প্রয়োজন আর কা প্রয়োজন প্রমথদের ? তাঁর শক্তি তো অব্যাহত ! তাঁরা বললেন, ভগবান পিনাকী বোধহয় লীলার বশেই এই সব প্রহার করাব ব্যবস্থা করেছেন, নতুবা এমন আড়ম্বর কেন !

তারপর মহেশ্বর হাতে ধনু নিয়ে তাতে শর সন্ধান করে ত্রিপুর চিন্তা করলেন। সেই সময়ে পুষ্য যোগ হওয়াতে পুরত্রয় একত্ব প্রাপ্ত হল। দেবতাদের তখন তুমুল ধ্বনি হল। তাঁরা মুনিদের সঙ্গে পরস্পরে মহেশ্বরের স্তব করতে লাগলেন। লোক পিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে বললেন, পার্বতীকান্ত, পুষ্য যোগ উপস্থিত, পুরত্রয়ের সম্মেলন হয়েছে। এই যোগেই ত্রিপুর দাহ করতে আজ্ঞা হয়। তোমার নিকটে দেব দৈত্য উভয় পক্ষই সমান। কিন্তু দেবতারা ধর্মাত্মা ও অসুররা অধর্মাত্মা। এই জন্যই আমি অসুর নাশ করতে বলছি। হে বিশ্বপূজিত, ত্রৈলোক্যের হিতের জন্য তোমাকে ত্রিপুর দাহ করতে হবে।

তারপর দেবদেব অবজ্ঞা ভরে পুরত্রয়ের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাতেই তাঁর প্রভাবে সমস্ত ভস্মীভূত হতে আরম্ভ করল। তাই দেখে শিবের রথে অবস্থিত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, তোমার দৃষ্টিপাত হতেই পুরত্রয় দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য তুমি শর নিক্ষেপ কর।

শিব তখন হাস্য সহকারে শরাসন জ্যা মার্জনা করে ত্রিপুরে বাণ নিক্ষেপ করলেন। তাতে তখনই সেই পুরত্রয় ভস্মীভূত হল। সেখানে শিব পূজারত যত নিষ্পাপ দৈত্য ছিল, শিবের অনুগ্রহে তারা শিবলোক প্রাপ্ত হল। ব্রহ্মাদি দেবতা মুনি সিদ্ধ ও কিন্নরেরা শিবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে তাঁর বন্দনা করলেন।

সূত বললেন, বিশ্বেশ্বর ভবানীপতি ব্রহ্মাদিকে বর দান করে মন্দর গিরিতে প্রবেশ করলেন। দেবতারা আনন্দিত হয়ে নিজ নিজ ধামে ফিরে গেলেন এবং শিবের অনুগ্রহে বৈরহীন হয়ে সুস্থ চিত্তে অবস্থান

করতে লাগলেন। শিবের এই ত্রিপুর দাহ বৃত্তান্ত উত্তম ও পবিত্র উপাখ্যান। আমি সংক্ষেপে আপনাদের বললাম। যে এই পবিত্র আখ্যান শিবের সমীপে শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে শিবলোকেই সাদর বসতি প্রাপ্ত হয় এবং ঐশ্বর্য বিদ্যা যশ পুত্র পত্নী ও অন্যান্য অভীষ্ট লাভ করে।

উপমন্যুর উপাখ্যান

ঋষিরা বললেন, উপমন্যু কী ভাবে শিবের নিকটে গাণপত্য লাভ করলেন এবং ক্ষীর সমুদ্র পেলেন কী ভাবে, তা বলুন।

সূত বললেন, উপমন্যু নামে বিখ্যাত মুনি ছিলেন সৌম্য মুনির জ্যেষ্ঠ। তিনি শিবের নিকটে বর পেয়ে দ্বিতীয় কার্তিকেয়র মতো হয়েছেন। একদা তিনি মাতুলের আশ্রমে ক্রীড়া করতে করতে তাঁরই গৃহে দুগ্ধ পান করলেন। তারপর নিজেদের আশ্রমে ফিরে এসে মাতাকে বললেন, মা, মামার বাড়ির দুধের চেয়ে সুস্বাদু দুধ আজ আমাকে দিতে হবে। তার মাতা দুঃখিত হয়ে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সেই কলভাষিণী বীজ পেষণ করে তার কৃত্রিম দুগ্ধ মিষ্ট কথা বলে পুত্রকে দিলেন। উপমন্যু মায়ের দেওয়া সেই দুধ পান করে বললেন, মা তুমি যে দুধ দিয়েছ তা তো দুধ নয়!

মাতা পুত্রের অশ্রুপূর্ণ লোচন দেখে অতি দুঃখিত হয়ে করযুগলে তার নয়ন মার্জনা করে বললেন, বাছা, আমরা বনবাসী, তার উপর দরিদ্র। তুমি যা চাইছ, সেই দুগ্ধ আমাদের কাছে দুর্লভ। শিবের দয়া ছাড়া ভোগ্য প্রাপ্তি হয় না।

সূত বললেন, উপমন্যু বালক হলেও মাতার এই কথা শুনে সেই তপস্বিনী কল্যাণীকে বিনয় সহকারে বললেন, তুমি শোক কোরো না। শিব যদি কোথাও থাকেন তো আমি তোমার নিকটে ক্ষীরের সমুদ্র এনে দেব। তারপর মুনি বালক উপমন্যু মাতার আজ্ঞা নিয়ে মাতাকে প্রণাম করে তপস্যার জন্য চলে গেলেন। তারপর হিমালয়

পর্বতে গিয়ে পবনাহারী হয়ে বহু শত বর্ষ তপস্যা করলেন। উপমন্যুর তপস্যায় ত্রিভুবন প্রতপ্ত দেখে দেবতারা বিষ্ণুর নিকটে গিয়ে বললেন, জগন্নাথ, ত্রৈলোক্য দাহক অনল থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

বিষ্ণু দেবতাদের কথা শুনে মনে মনে চিন্তা করে শিবের দর্শনের জন্য মন্দর পর্বতে গেলেন। তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি-পুটে বললেন, উপমন্যু নামে এক বালক দুগ্ধের জন্য হিমালয় পর্বতে তপস্যা করছে। তার তপস্যার আগুন ত্রিলোক দাহ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

তারপর পরমাত্মা শিব নিজে ইন্দ্রের রূপ ধারণ করে ঐরাবতের উপরে বাম ভাগে শচী ও দেবতা পরিবৃত হয়ে সেই মুনির তপোবনে গেলেন। তারপর প্রসন্নতা প্রকাশ করে উপমন্যুকে বললেন, বর প্রার্থনা কর।

শিবার্পিতচেতা উপমন্যু বজ্রধরের কথা শুনে সহাস্যে তাঁকে বললেন, শূলপাণির নিকটে আমি তাঁর প্রতি ভক্তিই চাই, তরঙ্গ চঞ্চল অন্য কোন বর আমি চাই না। শিবের প্রসন্নতা লাভ না হলে মুহূর্ত ক্ষণ নিমেষ বা নিমেষার্ধ কালও শিবের প্রতি ভক্তি হয় না। তোমার পদ বা ব্রহ্মপদও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। আমার শিবভক্তি হোক, এই আমার স্থির সংকল্প। শিব ভক্তি লাভের কাছে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তিও আমার কাছে পলাল অর্থাৎ বিচালির মতো অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

উপমন্যুর কথা শুনে ইন্দ্ররূপধারী প্রভু যেন কুপিত হয়ে বললেন, কী! আমাকে তুমি জানো না! তুমি আমার পরায়ণ, আমার পূজা-পরায়ণ ও আমার প্রতি নমস্কার-পরায়ণ হও। আমি প্রসন্ন হলে জগতে তোমার দুর্লভ কিছু থাকবে কি? মহাত্মা হলেও সেই নির্গুণ পার্বতীকান্ত তোমার কী করবে! তাই বলছি, তুমি আমার কাছেই বর চাও।

ইন্দ্রের এই কথা শুনে উপমন্যু ক্রুদ্ধ হলেন এবং ভাবলেন যে কোন পাপাত্মা রাক্ষসাধম আমার তপোবিঘ্নের জন্য ইন্দ্রের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হয়েছে। অতএব একে বধ করাই উচিত। কারণ এই ব্যক্তি শিবের নিন্দাকারী। শিবের নিন্দা শোনার চেয়ে তা উপেক্ষা করাই বেশি পাপের কাজ। শিবের যে নিন্দা করে, তাকে বধ করে আত্মহত্যা করলে পরম গতি লাভ হয়। এই শাস্ত্রের উপরে নির্ভর করে ইন্দ্র বধে উদ্যত উপমন্যু বললেন, আমি দুগ্ধের জন্য তপস্যা করছি বটে, কিন্তু তা থাক। এখন আমি তোমাকে বধ করে নিজের দেহ যোগানলে দগ্ধ করব।

এই বলে উপমন্যু সাগ্রহে এক মুষ্টি ভস্ম নিয়ে অথর্বাস্ত্র জপ করে ইন্দ্র দাহের জন্য নিক্ষেপ করলেন এবং অব্যয় পরমাত্মা বিশ্বেশ্বর দেবকে ধ্যান করে অগ্নি যোগে নিজের শরীর দাহ করতে উদ্যত হলেন। উপমন্যু এই কাজ করলে পিনাকপাণি নীললোহিত শঙ্কর সৌম্যযোগে অগ্নিযোগ বারণ করলেন। উপমন্যুর সেই ভীষণ অগ্নি-যোগ নন্দী প্রকারান্তরেও সংহার করেছিলেন। তারপর বিশ্বপতি শিব উপমন্যুর দৃঢ় ভক্তি বিদিত হয়ে কোটি সূর্য সমপ্রভ পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনয়ন দশভুজ শশিকলা-শেখর ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করলেন। উপমন্যু তাঁকে দেখে কৃতার্থ হয়ে নানাবিধ স্তোত্রে তাঁর স্তব করলেন। শিব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ক্ষীর সাগর প্রদান করলেন। ব্রহ্মাদি দেবদুর্লভ গাণপত্যও শিব তাঁকে দিলেন। কিন্তু উপমন্যু তাতে খুশী না হয়ে বারবার শিবভক্তিই প্রার্থনা করলেন। উমার সঙ্গে মহাদেব উপমন্যুকে সেই বর দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। মহাত্মা উপমন্যুর এই উপাখ্যান যে পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে যায়।

জালন্ধর বধ-বৃত্তান্ত

ঋষিরা বললেন, শূলপাণি সুদর্শন চক্র দিয়ে কী ভাবে জালন্ধর দৈত্যকে বধ করেছিলেন, সেই কথা এবারে আমাদের বলুন।

সূত বললেন, জালন্ধর নামে বিখ্যাত জলমণ্ডল সম্ভূত কৃতান্ত সদৃশ এক দৈত্য ছিল। তার নিকটে দেবতারা পরাজিত হলেন। জালন্ধর লোকপাল সাধ্য অষ্টবসু পবন বিশ্বদেব আদিত্য ও রুদ্রগণকেও জয় করল। তারপর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও দৈত্যনাশক বিষ্ণুকেও যুদ্ধে জয় করবার জন্য যাত্রা করল। জালন্ধরের সঙ্গে বিষ্ণুর যুদ্ধ হল। বিষ্ণুকে জয় ক'রে জালন্ধর দৈত্যদের বলল, এক ত্রিলোচন ব্যতীত সমস্ত দেবতাই পরাজিত হয়েছে। নন্দীশ্বর ও পার্বতীর সঙ্গে মহেশ্বরকে আজ আমি রণাঙ্গনে জয় করতে চাই।

জালন্ধরের কথা শুনে দৈত্যরা যুদ্ধোদ্যত হয়ে দেবদেব শিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং দৈত্য পরিবৃত ও রথ-করি-নিকরে সুসজ্জিত হয়ে জালন্ধর শিবের সমীপে উপস্থিত হল। অঞ্জন গিরি সন্নিভ ব্রহ্মবরে দর্পিত জালন্ধর দৈত্যকে দেখে শিব সহাস্যে বললেন, দিতি-নন্দন, যুদ্ধে প্রয়োজন নেই। আমার নিশিত শর নিকরে সর্বাঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে তুমি এখনই মৃত্যুর গ্রাসে নিপতিত হবে।

দেবদেব শূলপাণির কথা শুনে জালন্ধর দৈত্য সক্রোধে বলল, মহেশ, তোমার বৃথা বাক্য প্রলাপে কী লাভ হবে! এই তীক্ষ্ণ ধারের গদায় আমি তোমাকে তাড়িত করছি। আমাকে জয় করতে পারে এমন লোক তো আমি ত্রিভুবনে দেখি না, তোমার যদি বল থাকে তো যুদ্ধ কর।

দৈত্যের কথা শুনে শিব লীলাক্রমে তাঁর পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে সাগরে দিব্য চক্রায়ুধ অঙ্কন করলেন এবং বললেন, সমুদ্রে আমি যে এই নির্মল চক্র নির্মাণ করলাম তা উত্তোলন করবার সামর্থ্য যদি তোমার থাকে, তবেই যুদ্ধের জন্য থাকো, নতুবা নয়।

শিবের এই কথা শুনে জালন্ধর ক্রোধে রক্তলোচন হয়ে যেন

ত্রৈলোক্য দাহ করে শিবকে বলল, ও চক্র তো রেখা মাত্র, তাকে উত্তোলন করতে বলছ কী? আমি কি সুমেরুকে সঞ্চালন করতে পারি না! তোমার এই অঙ্কিত রেখার চক্র উত্তোলন করে পরে তোমাকে নন্দী প্রভৃতির সঙ্গে বধ করছি। বাল্যেই আমি বাল ব্রহ্মাকে জয় করেছি, বিষ্ণুকেও অবলীলা ক্রমে শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করেছি। ইন্দ্রাদি লোকপালরা এখন বন্ধন দশায় আমার কারাগারে আছে। আর তাদের পত্নীরা আমার গৃহে দাসী হয়ে আছে। ক্রীড়ার জন্য আমি আকাশ গঙ্গাকে দুই বাহু দিয়ে হিমালয়ে রুদ্ধ করেছি, ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজদের সাগরে নিক্ষেপ করেছি। আমি বাড়বানল প্রতিরুদ্ধ করায় সমুদ্রজলে একার্ণব হবার উপক্রম হয়েছিল। তবু তুমি আমার বিক্রম জানো না কেন? আজ আমি তোমাকেও জয় করে কারাগারে পাঠাব।

জালন্ধরের এই কথা শুনে মহেশ্বর নয়নানলের কণিকা দিয়ে দৈত্যের সহস্র অক্ষৌহিণী সেনা ক্ষণকালের মধ্যেই অবলীলাক্রমে দগ্ধ করলেন। তারপর তিনি জালন্ধরকে বললেন, তুমি আমার অঙ্কিত রেখা উত্তোলন করবে বলে স্বীকার করেছ, শীঘ্র তাই কর। পরে আমাকে জয় করবে।

মদান্ধ দৈত্যরাজ শিবের এই কথা শুনে বাহ্বাস্ফোটন করে সবেগে সেই রেখা উত্তোলনে উদ্যত হল। সেই রেখাই সুদর্শন চক্র। দৈত্যরাজ অতি কষ্টে তা নিজের কাঁধে স্থাপন করল এবং তাতেই তার স্কন্ধ দ্বি-খণ্ডিত হলে সে দ্বিতীয় কৃষ্ণ পর্বতের মতো নিপতিত হল। তার দেহের রক্তে জগৎ পূর্ণ হল এবং দেবদেবের আদেশে জালন্ধরের রক্ত মাংস পাপিষ্ঠদের নরকে রক্ত কুণ্ড রূপে পরিণত হল। জালন্ধর দৈত্য শূলপাণির হাতে নিহত হতে দেখে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং 'জয় মহাদেব' বলতে লাগলেন। সেই মহাসুর নিহত হবার পর দেবতা সাগর বসুন্ধরা দিগ্‌গজ ও পর্বতেরা নিজ নিজ স্থান ফিরে পেলেন। এই জালন্ধর-বধের বৃত্তান্ত যে ভক্তি সহকারে

পাঠ বা শ্রবণ করে বা দ্বিজদের শোনায়, তার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

প্রতর্দন রাজার উপাখ্যান

সূত বললেন, চতুর্বেদ ও সমস্ত পুরাণের মত এই যে মহেশ্বরের তুল্য বা তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন দেবতা নেই। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁর বশীভূত এবং যাঁর থেকে সমস্ত দেবতার উৎপত্তি, সেই শিবই ধ্যেয়। শিব ছাড়া ধর্ম নেই, অর্থ নেই, সুখ নেই, মুক্তিও নেই। মানুষ যখন আকাশকে শিব হতে ভিন্ন জ্ঞান না করে চক্রবৎ বেষ্টন করে, তখনই তাদের দুঃখ নাশ হয়। অর্থাৎ লোকে যখন সমস্ত পদার্থ শিব স্বরূপ ভেবে নিজে নিরাবলম্ব আকাশ মূর্তি হয়, তখনই মুক্তি লাভ করে। যাঁর প্রসাদে ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্তা, বিষ্ণু ধ্যেয় ও ইন্দ্র জিষ্ণু, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউই নেই।

ঋষিরা বললেন, সংশয় নাশক সূত, অনেক লোকে শিবকে ত্যাগ করে বিষ্ণুর সেবক হয়। তার কারণ কী? বিষ্ণুর প্রভু পার্বতীপতি থাকতেও লোকে মৃত্যুকালে প্রায়ই বিষ্ণুকে স্মরণ করে।

সূত বললেন, বিষ্ণুর ভক্তিপূর্ণ আরাধনায় শিব যখনই প্রসন্ন হয়েছেন, তখনই তিনি বহু বর দিয়েছেন। বলেছেন, লোকে প্রায়ই স্পষ্ট রূপে জানতে পারবে না যে তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ আছেন। অতি অল্প লোকেই তত্ত্বকথা অবগত হবে। এই কারণেই অল্প লোকেরই শিবতত্ত্বজ্ঞান হয় এবং শিবের বরদানের জন্যই লোকে বিষ্ণুর নাম কীর্তন করে থাকে। বিষ্ণুকে স্মরণ করা মাত্রই যে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, এ শিবের প্রসাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এতে বিচার বিতর্ক নেই, শিবকে যিনি তত্ত্বত অবগত হন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ। নারায়ণকে যিনি তত্ত্বত অবগত হন, তিনি ইন্দ্র; দেবরাজ ইন্দ্রকে যিনি তত্ত্বত অবগত হন, তিনি লোকপাল বরুণ। আর যাঁরা সমস্ত লোকপালকে তত্ত্বত জানেন, তাঁরা অমর হয়ে থাকেন। যজনীয়

দেবতাদের যিনি তত্ত্ব জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ঋষি। যিনি ঋষিদের সম্যক্ রূপে জানেন, তিনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সর্বদেবময় ব্রাহ্মণের তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিও বেদজ্ঞ। যিনি বেদরহস্যজ্ঞ, তিনিই শিবের প্রিয়। বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত মহামূর্খরা সৃষ্টি স্থিতি লয়কারা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির পূর্বপুরুষ শম্ভুকে জানতে পারে না।

প্রতর্দন নামে এক প্রতাপশালী পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি সপ্ত দ্বীপা পৃথিবার অধিপতি। তিনি বীর পবিত্রবুদ্ধি ভোগী দাতা ও বেদার্থ পালক ছিলেন। তিনি সর্ববিধ নিয়মের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণ প্রিয় ছিলেন। দেবতারা তাঁর রাজ্যে সতত উত্তম হবি গ্রহণ করতেন। পাষণ্ডী বা বৌদ্ধ তাঁর রাজ্যে ছিল না। একদা সেই রাজা ক্রীড়ার জন্য রাজধানী ছেড়ে বহির্ভাগে গিয়েছিলেন। এমন সময় একজন ক্ষপণক অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে দেখে বিস্ময়াপন্ন হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কোথা থেকে যাচ্ছ ও কোথায় যাবে? তোমার প্রয়োজন কী ও কী জাত, এই সব কথা বল।

ক্ষপণক বলল, রাজা, আমি যতি শীলব্রত সম্পন্ন শান্ত বণিক, আমার অঞ্চল সংলগ্ন আরও বণিক এখানে আছে।

রাজা বললেন, তোমার ধর্ম কী, তত্ত্ব কী? এর বোদ্ধা কে ও বক্তা কে? এ পথে এলে কেন? তুমি প্রকট ভাবেই বা থাক না কেন?

ক্ষপণক বলল, অহিংসা পরম ধর্ম, শারীরিক দমই তত্ত্ব, বোদ্ধা জৈন ও বৌদ্ধ। এর বক্তা ভগবান জিন। রাজা, বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা যাজ্ঞিক বৈষ্ণব দ্বিজ ও মহাপূজ্য মাহেশ্বরদের ভয়ে আমি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকি।

সূত বললেন, অনন্তর রাজা দুঃখিত চিত্তে ভাবতে লাগলেন, আমি যোগ্য রাজবুদ্ধি সম্পন্ন নই, আমার রাজ্যে ধিক্। কারণ আমার রাজ্যে বেদ বহির্ভূত ব্যক্তি অবস্থান করে। এখন যদি এই পাপিষ্ঠকে বধ করি, তাহলে যে সব প্রজা একে মান্য করে তারা বলবে, কুবুদ্ধি-

সম্পন্ন রাজা এই শান্তচিত্ত যতিকে বধ করল। আর একে যদি বধ না করি তো কী হবে? অধিকতর প্রজা ক্রমেই এর অনুগামী হবে, দয়ার নামে অধর্ম প্রচার হবে। বেদ বহির্ভূত প্রজা রাজার শাসন-বাধ্য নয়, অথচ রাজাকেই তার পাপের ভাগী হতে হয়। ভগবান মনু এই কথাই বলেছেন।

সূত বললেন, এর পর রাজা প্রতর্দন রাজ্য ত্যাগ করে একাগ্র-চিত্তে সাবিত্রীর ধ্যান করে তপস্যা করতে লাগলেন। কয়েক দিনেই ব্রহ্মা সেই তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রত্যক্ষগোচর হয়ে বললেন, বৎস, আমি প্রীত হয়েছি। তুমি বর নাও। কেন মনকষ্ট ভোগ করছ, কেনই বা তুমি রাজ্য ত্যাগ করেছ?

সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি প্রতর্দন বললেন, যাতে বেদপ্রমাণ বক্তা ও বেদপ্রামাণ্যজ্ঞাতা প্রজা থাকে, এমন নিষ্কণ্টক রাজ্য আমি চাই। অন্য বরে আমার প্রয়োজন কী!

তথাস্তু বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। পৃথিবীপতি রাজর্ষি প্রতর্দনও সন্তুষ্ট হলেন। তদবধি সেই রাজ্যে সর্বধর্ম ব্যবস্থিতি হল। বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ, যতি, ব্রহ্মচারী, বিবিধ বিশুদ্ধ শৈব ও শুভ বৈষ্ণবরা তাঁর রাজ্যে সুব্যবস্থিত হলেন, অগ্নিহোত্র ও যাগযজ্ঞ সম্পূর্ণ রূপে হতে লাগল। তাঁর সেই মহা পবিত্র রাজ্যে পাষণ্ডী বা কুতার্কিক বিলুপ্ত হল। বর্ণাশ্রমাচার সম্পন্নদের তখন ক্রিয়াকলাপ হতে লাগল। তখন বিষ্ণুভক্তদের উৎসব ও গৃহে গৃহে শিবের পূজা হতে লাগল। সবাই দেবতাদের মানল, দেবদ্বেষী কেউ রইল না। সর্বত্র ন্যায় বেদান্ত ও মীমাংসার ব্যাখ্যা হতে লাগল। বেদ নির্ঘোষে সমগ্র রাজ্য শব্দায়-মান হল। নানা স্থানে যজ্ঞের স্তম্ভগুলি উচ্ছ্রিত হল। বৃদ্ধদের আদৃত পুণ্যকারা পতি বহু ভোগসম্পন্ন হৃষ্টপুষ্ট সতী রমণীদের রক্ষা করতে লাগল।

সূত বললেন, এই ভাবে বহুকাল অতীত হলে যে সব পাপী হীন-কর্মা দৈত্য দানব ও ম্লেচ্ছ ছিল, তারাও স্বর্গে গেল। যাদের সন্তান-

সন্ততি শুদ্ধ বেদ-মার্গাবলম্বী হল, তারা সকলেই নরক মুক্ত হয়ে অমরাবতী প্রাপ্ত হল। সর্বত্র তুলসীর বৃক্ষ ও বিষ্ণুর পূজা এবং বিল্ব-পত্রে শিবের পূজা হতে লাগল। তাই এই সব ধর্মাত্মাদের পিতৃলোক নরকে থাকবে কী ভাবে! এ রাজ্যে এসে যমের কিঙ্করেরাই বা কী করবে!

সূত বললেন, ঋষিরা শুনুন। সমস্ত লোক স্বর্গারূঢ় হতে থাকলে যম ব্যাপারহীন হলেন এবং সকলেই সর্বলোক পূজিত দেবতা হতে লাগলেন। তখন মহামনা ধর্মরাজ ইন্দ্রলোকে গিয়ে সমস্ত দেবতাদের সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন, দেবতা সাক্ষী, আমার রাজ্যে চুরাশি লক্ষ জীবের বাস ছিল, তা নষ্ট হয়েছে। যে পাপিষ্ঠ জীব কীটাদি যোনিতে বা সংযমনী পুরে ছিল, তার পুত্র তাকে উদ্ধার করেছে। পাপীর পুত্ররা বেদ নির্ভর করে শ্রাদ্ধ ও দেবপূজাদি করছে।

ইন্দ্র বললেন, বেদ যখন তত্ত্বত প্রমাণ করে দিচ্ছেন, তখন আমরা হীনজীব, আমাদের আর বিশেষ কর্তব্য কী আছে! আমরাও তো বেদেরই আদেশবর্তী। পুরোহিত, আমরা জানি যে আপনার বুদ্ধি শোভন। আপনিই পূর্বে চার্বাক ও বৌদ্ধাদি মার্গ প্রদর্শন করেছেন। দৈত্য দানবরা সেই মার্গে বিভ্রান্ত হয়ে বেদমার্গ থেকে বহিষ্কৃত হয়। দ্বিজোত্তম, এখন আপনি আবার তাই করুন।

বৃহস্পতি বললেন, চার্বাক বৌদ্ধ জৈন জবন কাপালিক বা কৌলিক সে রাজ্যের কোথাও প্রবেশ করতে পারে না। সে রাজ্যের উত্তম প্রজারা বেদকেই প্রমাণ স্থির করে আছে। তাদের তো এখন বিচলিত করতে পারা যায় না। ব্রহ্মার প্রদত্ত বর খণ্ডন করতে আমার কী শক্তি!

ইন্দ্রাদি বললেন, দৈত্য দানবদের যখন দুর্দশা হয়, শুক্রাচার্য তখন স্বয়ং তাদের প্রতি কৃপা করে কত উদ্যোগ করেন! আপনি আমাদের কেন উপেক্ষা করছেন? আপনার অসাধ্য কী আছে! আমরা তো

আপনারই শরণাগত। আমাদের দ্বিষ্ট ব্যক্তিরাও বেদকর্ম নিরত হয়েছে। অতএব সেই পাপিষ্ঠ দৈত্য ও রাক্ষসদের বিমুগ্ধ করবার জন্য যত্ন করুন।

সূত বললেন, দেবতারা এই রূপ বলতে থাকলে উদারমতি বৃহস্পতি সৃষ্টি রক্ষার জন্য উপায় চিন্তা করলেন। তারপর তিনি বললেন, দেবতারা সবাই শোন। আমি একটা উপায় বলছি। যদি কোন দেবতা শঙ্খ-চক্রান্বিত-দেহ, তুলসী-কাঠ-ভূষিত, উর্ধ্ব-পুণ্ড্রধারী, হরি-নামাক্ষর-জপ-পরায়ণ, অথচ দেবনিন্দক, শিবে মতিহীন, মহাপাপ নিয়োক্তা, শিবদ্বেষ্টা, শিবনিন্দক ও কপট বৈষ্ণব হন এবং দম্ভ সহকারে সেই রাজ্যে শিবের নিন্দা করেন, তাহলে সেই রাজ্যবাসীর পূর্বপুরুষেরা দারুণ নরকে যেতে পারে।

কিন্তু সেই সব দেবতার মধ্যে কেউই এ কাজে সম্মতি প্রকাশ করলেন না, প্রত্যুত পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন, এ কাজ ভাল নয়। যাঁর প্রসাদে বিষ্ণু এই রকমের পদ পেয়েছেন, কোন্ চণ্ডাল সেই শিবকে বিষ্ণুর সমান করতে যাবে!

সূত বললেন, অনন্তর ইন্দ্র এক কিন্নরকে ডেকে বললেন, তুমি মায়াবী বৈষ্ণব হয়ে ভূতলে যাও। সেখানে গিয়ে সবাইকে বলবে, শিব তো সর্বশ্রেষ্ঠ নন, মহা বিষ্ণুই একমাত্র ধ্যেয়, আর কেউ ধ্যেয় নন। আগে প্রচ্ছন্ন রূপে থেকে এই মার্গ প্রদর্শন করবে, পরে ক্রমে ক্রমে সকলেই এই রকম কুতর্কী হবে। তুমি বলবে, বেদই প্রমাণ, কিন্তু বিষ্ণুই একমাত্র মহান, শিব তাঁর কিঙ্কর।

সূত বললেন, সেই কিন্নর ইন্দ্র কর্তৃক সবলে প্রেরিত হয়ে লোকে সাধু বলে অথচ দাম্ভিক রূপ ধারণ করে সভয়ে ধীরে ধীরে এগোলেন। সমস্ত বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করে তিনি নগরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। শিষ্য গ্রহণ করে তাদের পূর্বেই বললেন, শঙ্কর মান্য নন। কোথাও বললেন, শিব ধ্যেয় নন। কোথাও বললেন, শিব প্রধান নন। আবার কোথাও বললেন, শিব উৎকৃষ্ট জীব। কোথাও বা বললেন, শিব

বিষ্ণুর কিঙ্কর। এইভাবে লোকের বুদ্ধি নানা প্রকারে ভেদ প্রাপ্ত করিয়ে তিনি শিষ্য পরিবৃত হয়ে রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। রাজ-পুরুষেরা তাঁর বিরুদ্ধ ভাব দর্শন করতে পারে নি। সবাই বুঝেছিল যে ইনি বিষ্ণু ভক্ত, শান্ত বেদ বেদান্ত পারগ মহাপুরুষ। সবাই তাঁকে নানা উপঢৌকন, অশ্ব, রথ ও ধন দিতে লাগল। কিন্তু তাঁর গুপ্ত পাপ কেউ দেখতে পেল না।

সূত বললেন, এক সময়ে সজ্জনেরা উপবাসী থেকে প্রাতঃকালে বিষ্ণুকে নমস্কারের জন্য গমন করলেন। সেখানে সেই কপট বৈষ্ণব শিষ্য পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। নিজের তেজের দর্পে ভস্মাঙ্কিত-ললাট বিপ্রদের গ্রাহ্যই করলেন না। এমন সময়ে রাজা প্রতর্দন কুশহস্ত শুচিব্রত সম্পন্ন বহু বিপ্রে পরিবৃত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাদের মধ্যে কেউ ত্রিপুণ্ড্রধারী ও শিবসূক্ত পাঠরত, কেউ বা ঊর্ধ্ব-পুণ্ড্রধারী ও বিষ্ণুসূক্ত পাঠরত। এই সব ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজা উপবেশন করে কোমলাক্ষর যুক্ত উপযুক্ত বাক্যে বললেন, আপনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর পারিষদ, আপনি বেদাধ্যয়ন রত, বিষ্ণুভক্ত ও বৈষ্ণবোচিত বেশধারী।

বৈষ্ণবাভাস অর্থাৎ সাজা বৈষ্ণব বললেন, বেদই পরম শ্রেয়স্কর, বেদার্থের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। একমাত্র বেদই প্রমাণ এবং বিষ্ণুর বাক্যই শ্রুতি। রাজা, বহু ব্যক্তিই বেদার্থ বিজ্ঞানে বিমূঢ়। তাতেই পণ্ডিত ব্যক্তিরাও নানা দেবপূজক ও শিবপূজক হয়েছেন। একমাত্র বিষ্ণুই দেবতাদের মধ্যে ধ্যেয়, আর কেউ নয়। তবে ক্রূরকর্মা শঙ্করকে শ্রেষ্ঠ বলে কেন মানে! আপনার এই সব ব্রাহ্মণ ঊর্ধ্ব-পুণ্ড্রধারী, এঁদের দেখে আমার খুব প্রীতি হচ্ছে। ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, করে রুদ্রাক্ষের মালা, শিবসূক্ত পাঠরত, এই ব্রাহ্মণদের দেখে আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো মনে হচ্ছে। বহু কুশ ধারণ, ভস্মলেপন ও রুদ্রাক্ষ ধারণ—এ সব কী ব্যাপার! শিব কে? তার আবার সূক্তই বা কী! এক বিষ্ণুই পরম ধ্যেয়, অন্য

দেবতা কদাচ ধ্যেয় নন। তাঁর অস্ত্র চিহ্ন ও তাঁর ভক্তরাই সতত পূজনীয়।

রাজা বললেন, অনাদি প্রমাণ বেদে শিব বিষ্ণুর চেয়ে বড় বলে কীর্তিত হয়েছেন। তিনি পূজ্য নন, এ কি হতে পারে? শিব পুরাণ, সর্ববিধ স্মৃতি ও শৈব আচারে শিবই শ্রেষ্ঠ, এ কথাই সর্বতো-ভাবে বলা হয়েছে। নানা পবিত্র তন্ত্রে শিব অজ এবং ঈশ্বর নামে অভিহিত। সুতরাং আপনার এই কথা আমার হৃদয়ে বজ্রের মতো মনে হচ্ছে।

বৈষ্ণবাভাস বললেন, যারা শিব পূজা করে, তারা একাগ্রচিত্ত নয়। শিব দিগম্বর, শ্মশানবাসী, ব্রহ্মমস্তকধারী, সর্পহারযুক্ত, বিষধারী ও জটাধর। তিনি কী ভাবে সেব্য হতে পারেন? সুন্দর কমলা-পতি বিষ্ণুই সতত সেবনীয়।

রাজা বললেন, শিবের নানা রূপ, কে তা জানতে পারে? নরাধম তো জানতে পারেই না। তোমাকে দেখতে বৈষ্ণবের মতো, কিন্তু তুমি কিছুই জান না।

সূত বললেন, তারপর রাজা চিন্তা করলেন, বিদ্বান ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ-দের আহ্বান করে তাঁর তত্ত্ব নির্ণয় করব।

রাজা গৃহে ফিরে স্থির হয়ে যখন ব্রাহ্মণদের আহ্বান করলেন, তখন অপরূপী কলি ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবিষ্ট হল। কলি-সমাবিষ্ট কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে লক্ষ্য করে কপট বৈষ্ণবের বাক্যের অনুরূপ কথা বলতে লাগলেন। পরস্পরের বাক্য ক্রোধে খণ্ডন করতে লাগলেন। কেউ মৌনাবলম্বী হয়ে রইলেন, কেউ বা তত্ত্ব কথা বললেন। কেউ আবার 'এই রকমই বটে' বলে অন্যের কথার অনুমোদনও করতে লাগলেন। এইরূপ কোলাহল হতে থাকলে রাজার চিত্তে সিদ্ধান্ত নির্ণয় হল। কিন্তু বহু লোকে নাস্তিকতা প্রাপ্ত হল। রাজা সেই কপট বৈষ্ণবকে মহামূর্খ বলেই বুঝলেন, কিন্তু মায়াবী বলে বুঝতে পারলেন না। লোক ভ্রান্ত হলে রাজা ভাবলেন, এই দুষ্টাত্মা ঈশ্বরদ্রোহী, একে

বধ করা উচিত। এই শাস্ত্র। কিন্তু লোকে অকারণে আমাকে ব্রহ্মঘাতী বলবে।

সূত বললেন, সেই সময়ে সেই সব লোকের পূর্বপুরুষেরা স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে নানাবিধ নরকে গেল। যাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি সন্ততি, মাতামহাদি পক্ষ, সম্বন্ধী, সখা বা বান্ধব শিবের অবজ্ঞাজনিত পাপে দূষিত, তারা যমলোকে স্থিত হলেও তাদের পুণ্য মদের স্পর্শে গঙ্গাজলের মতো বিনষ্ট হয়ে গেল। কমলাপতি এই সময়ে সুপ্ত ছিলেন। তিনি রক্তধারায় আপ্লুত হয়ে ক্রন্দন করে উঠলেন। লক্ষ্মী তাঁর সেই বিহ্বল রূপ দেখে আশ্চর্যান্বিত ও ভয়ে ব্যাকুল হয়ে দুঃখে রোদন করতে লাগলেন। তিনি বললেন, বেদান্ত-বেদ্য পুরুষেশ্বর, তোমাতে আজ এ কী দেখা যাচ্ছে! তুমি আকার সম্বন্ধহীন, পুরাণ পুরুষ। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তেমনি তোমাতেই এই জগৎ ভ্রম হয়। শৈল সব নিপতিত, জলধি বিশুষ্ক, সূর্যাদি নিষ্প্রভ, পৃথিবী পরমাণু রূপে পরিণত ও প্রাণীরা বিলয় প্রাপ্ত হয়। তবুও সামান্যক্ষণের জন্য তোমার রোম মাত্রও বিচলিত হয় না।

নারায়ণ বললেন, লক্ষ্মী, তুমি যা বললে তা সত্য বটে। কিন্তু আমার প্রভুর প্রতি অবহেলা আমার অসহ্য। আমার এই পূজ্যতম মূর্তি স্থাপন করেও শিবকে না মানা আমার পক্ষে বজ্রের তুল্য।

লক্ষ্মী বললেন, তুমি সর্বাত্মা সর্বজ্ঞ কর্তা বক্তা পালয়িতা অব্যয় প্রভু। তুমি সমস্ত লোকের সাক্ষী। তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?

নারায়ণ বললেন, আমার মধ্যে এ সব গুণ সত্যিই আছে। কিন্তু আমি এ সমস্তই মহেশ্বরের বরে লাভ করেছি। এ সব আমার নিজের কিছুই নয়। একমাত্র শিবই আমার মতো অনেক জীব সৃষ্টি করেন। তাঁর তত্ত্ব আমি ও আমার কতিপয় ভক্তই অবগত আছি। বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণ বধের পাপ থেকে জীব মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু শিবকে অবহেলার পাপ থেকে মুক্তি নেই। যে গুরুদারগামী,

সতত মদ্যপানরত ও ব্রাহ্মণের সুবর্ণ চোর, তারও পাপ মুক্তি হতে পারে। যে স্ত্রীহত্যা গোহত্যা বা রাজা হত্যা করে এবং বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন নাস্তিক ও লুব্ধ, তারও কখনও পাপমুক্তি হতে পারে। কিন্তু রুদ্রকে যে অন্যের সঙ্গে সমান জ্ঞান করে, কদাচ তার বন্ধন মুক্তি হয় না। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতার চেয়ে যে শিব বড়, এ জ্ঞান যদি না হয় এবং তাঁকে বিষ্ণুর সমান বলে কেউ মনে করে, তবে সে জীবের মুক্তি হয় না। শ্রীকণ্ঠই আমার প্রভু এবং আমি তাঁর দাসের কাজে নিযুক্ত আছি।

লক্ষ্মী বললেন, তোমার প্রভু যেখানে আছেন, সেই রমণীয় কৈলাস পর্বতে গিয়ে সেই সদাশিবকে প্রণাম করতে চাই।

সূত বললেন, তারপর লক্ষ্মীনারায়ণ গরুড়ে আরোহণ করে কৈলাস পর্বতে গিয়ে নানাবিধ স্তোত্রে ক্ষণকালের মধ্যে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলেন। তারপর ব্রহ্মাদি দেবতা ও সিদ্ধরা সেখানে উপস্থিত হলেন। তারপর রুদ্র কৌতূহলী হয়ে সেই সমস্ত দেবতায় পরিবৃত হয়ে উমা সমভিব্যাহারে প্রতর্দন রাজার নিকটে গমন করলেন। দেবতাদের সমস্ত বিমানের মধ্যস্থলে রইলেন শঙ্কর। তিনি বললেন, এই সব দেবতা মিলিত হয়েছেন কেন? বল, কী কাজ বা কোন্ অপূর্ব ব্যাপার উপস্থিত যে রাজাও চিন্তাতুর।

দেবতারা বললেন, ব্রহ্মার নিকটে বর পেয়ে রাজা বেদমার্গ বক্তা ও বেদমার্গ প্রবর্তক হয়েছিলেন। কিন্তু সৃষ্টি রক্ষার জন্য আমরা কপটতা করেছি। আপনি সকলের স্রষ্টা, দেবতারা আপনার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। এই কিন্নর আমাদেরই কথায় আপনার নিন্দাপরায়ণ কল্পিত বৈষ্ণব। আপনি আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সূত বললেন, তখন রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে ক্রোধে সেই কিন্নরকে তীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়ে বধ করলেন। তার পক্ষপাতী অনেকের মাথা কাঁধ থেকে দ্বিখণ্ডিত হল। অশ্ব প্রভৃতি অনেক প্রাণীও

নিহত হল। কেউই সেই পুণ্যচেতা রাজাকে নিবারণ করতে সমর্থ হল না। মহাদেব নিজেই সেই মহাত্মা রাজার ক্রোধ প্রশমন করলেন। তারপর কোলাহল নিবৃত্ত হলে নন্দী কৌতূহল বশে ঘোড়ার মাথার সঙ্গে নিহতদের শরীর এবং তাদের মাথার সঙ্গে ঘোড়ার শরীর যোজনা করলেন। তারপর সেই জ্ঞানী ও সত্যবাক্ নন্দী দেবতাদের সভায় এই সত্য কথা বলতে লাগলেন, মুখে যারা শিব-নিন্দা করেছে তাদের অশ্বমুখ হল এবং যারা মুদ্রা ধারণের গর্বে শিবের প্রতি অবহেলা করেছে তাদের দেহ অশ্বাকার হল।

ব্রহ্মা বললেন, রাজর্ষি প্রতর্দনের রাজ্য পালনের সময়ে যা হওয়া উচিত তাই হল। এখন ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত বলব, এক মনে তা শোন্। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হলে, ভূমণ্ডল ম্লেচ্ছে ব্যাপ্ত হয়ে মানুষ সমস্ত আচার-ভ্রষ্ট অধম হবে। সেই সময়ে আন্ধ্রী দেশে দুর্ভাগ্য সম্পন্ন বিধবা ব্রাহ্মণী রত এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ হবে। সেই পাপী ব্রাহ্মণের ব্যভিচার ফলে যে পুত্র উৎপন্ন হবে, পূর্বাদৃষ্টবশে সে সুখী গুণান্বেষী ও অধ্যয়নে উৎসুক হবে। সেই বিধবার পুত্র অদ্বৈত শাস্ত্রবেত্তা শ্রেষ্ঠ বেদান্তবাদী পদ্মপাতুক আচার্যকে প্রণাম করে তাঁর নিকটে প্রার্থনা করবে, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম মধু শর্মা, আমাকে অধ্যয়ন করান, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের পাঠ আমাকে দিন। দয়ালু আচার্য পদ্মপাতুক বাৎসল্যবশে সেই বিনয়াবনত মধু শর্মাকে শিষ্যদের অগ্রগণ্য করবেন। এর পর মধু শর্মার প্রতিদিনের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে গুরু তাকে সমগ্র বিদ্যা প্রদান করবেন। কিন্তু একদিন তিনি দেখতে পাবেন যে মধু শর্মা স্নান-সন্ধ্যাদি আহ্নিক কার্য না করেই ভোজনার্থী হয়েছে। গুরু তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সত্য কথাই বলবে। পরে বলবে, সাধারণ ধর্ম অনুষ্ঠান করেছি, এর জন্য ক্ষুব্ধ হচ্ছেন কেন? আচার্য বলবেন, তোমার মাতা-পিতার কোন্ জাত? তাতে মধু শর্মা বলবে, আমার পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা ব্রাহ্মণী। গুরু বলবেন, তোমার মাতামহ কে? কোন্ বিধি অনুসারে কোথায় তাঁর সম্প্রদান কাজ হয়? সত্য

কথা শীঘ্র বল, নতুবা তোমাকে ভস্মসাৎ করব। গুরু এই কথা বললে সেই বিধবার পুত্র সব কথাই সত্য বলবে। তাতে আচার্য শাপ দেবেন, তোমার এই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের স্ফূর্তি হবে না। অদ্বৈত দর্শনে হবে জড়তা। বিধবার পুত্র বিলাপ করবে, প্রভু, আমি যে আপনার সেবা করেছি, তা কি নিষ্ফল হবে? আচার্য বললেন, তোমার পূর্ব পক্ষ দৃঢ় হবে, সিদ্ধান্তে সর্বথাই স্ফূর্তি বিহীনতা হবে। আমার কথার অন্যথা হবে না। এতে মধু সমস্ত শাস্ত্রের পূর্ব পক্ষ অবলোকন করবে এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত অন্যথা করতে উদ্যত হবে। দেবগণ, কলির প্রচার হতে থাকলে শিবদ্বেষ্টার অসৎ মার্গও বিস্তৃতি লাভ করবে। দ্রাবিড়ের পূর্বে ও কর্ণাট-তৈলঙ্গের মধ্যে গোদাবরীর তীরে মধুর মৃত্যু হবে। কলিযুগের সম্পূর্ণ অধিকার হলে আর্যাবর্তেও এই অসৎ পথ চলতে থাকবে। নরাধমের অসৎ শাস্ত্র মায়াবাদ কীর্তন করবে। তাদের দর্শন হলেই সবস্ত্র স্নান করবে। বিষ্টি যেমন ভদ্রা, রাহু যেমন স্বর্ভানু, ভেক যেমন হরি, মায়াবাদীরাও তেমনি তত্ত্বদর্শী। তারা যোগ নিন্দা পরায়ণ ও নিত্য অগ্নিহোত্রের নিন্দারত। তারা পুরাণকে বেদান্ত সদৃশ বলবে, কৃত্রিম বেশধারী হবে। তাদের সঙ্গে সম্ভাষণ করলেও ব্রহ্মতেজে হীন হতে হবে। জৈন বৌদ্ধ ও কাপালিকও ভাল, কারণ তারা স্পষ্টভাবে বেদের অপ্রামাণ্য ঘোষণা করে। কিন্তু এরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকারের অভিমান রাখে, অথচ প্রকৃতপক্ষে বেদার্থের বিরুদ্ধবাদী। কথায় ঈশ্বর মানে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বর।

সূত বললেন, এই ঘটনার পর দেবতারা স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। রাজর্ষি প্রতর্দনও নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করে দেহান্তে পরম অদ্বৈত রূপ মোক্ষ লাভ করলেন। কালক্রমে মধুর অনেক শিষ্য হবে। তারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করবে, রাজসেবা করবে, প্রচ্ছন্ন কৌলিক হবে। অগম্যা গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান করবে এবং বিবিধ ভোগের জন্য আকুল হবে। যামারূঢ়, রাজসেবা তৎপর, অদ্বৈত নিন্দা পরায়ণ এবং নিজেদের গুপ্ত গ্রন্থের গৌরবে

গৌরবান্বিত থাকবে। অন্য দর্শনের সিদ্ধান্ত তারা যথার্থরূপে জানবে না। কেবল দোষ দেবার জন্যই সেই সব দর্শন পাঠ করবে। হায়, অন্য দেবতার নাম যদি হেয়ই হয়, তবে সেই পাপিষ্ঠরা কেন বেদপাঠ বা তর্ক অধ্যয়ন করে! তারা মীমাংসাদি সৎ গ্রন্থ বার বার আলোচনা করে সেই সব শাস্ত্রের উপরে যে পূর্ব পক্ষ আছে বিদ্বেষ বুদ্ধিতে তাই গ্রহণ করবে। তাদের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত থাকবে না বলে নিজের সিদ্ধান্ত বলবে না। সেই জারজ সম্প্রদায় হংস ও পরমহংসদের নিন্দা করবে। সেই নরাধমরা মানুষ জন্মাবামাত্র তার মাথা মুড়িয়ে কাষায় বস্ত্র পরিয়ে মঠাধিপতি করবে। মঠাধিপত্য, সেবা, ধনসংগ্রহ, দাসীগমন ও ঈর্ষা —এই পাঁচ ধর্ম যাদের, তারাই তত্ত্ববাদী হবে। সংসারই তত্ত্ব, এই তাদের মত। কিন্তু বিশ্ব মায়াবিলাস মাত্র, এই কথা বলাতে তারা মায়িকবাদী বলে অভিহিত হবে। বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান তাদের থাকবে না, কিন্তু বিশ্বকেই তত্ত্ব বলবে। কলিযুগে শব্দমাত্রেই তত্ত্ববাদী হবে। কলিযুগে পাপবৃদ্ধি হতে থাকলে উত্তরদেশে দাম্ভিক বৈষ্ণবের প্রাদুর্ভাব হবে। শিবকে যে অপরের সমান বলে, অপরের সমান মনে করে বা তাদের সঙ্গ করে, তাদের দর্শন হলেও সবস্ত্র স্নান করতে হয়। কলি-কালে মধুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণকারী পাপিষ্ঠ বৈষ্ণব অনেক হবে। তারপর জাতিভ্রষ্ট শূদ্র ও ম্লেচ্ছরা বৈষ্ণব পথাবলম্বী হবে। তাই বিপ্রগণ, আপনারা পার্বতীকান্তের মাহাত্ম্য শুনুন, সর্বদা তাঁর প্রতি ভক্তি রাখুন।

শিবনিন্দকের জন্মকথা

ঋষিরা বললেন, সূত, বিষ্ণু যাঁর সেবক সেই মহেশ্বরের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয় কেমন করে, সেই কথা আমাদের বলুন। কেউ তাঁদের সমান বলেন, কেউ বিষ্ণুকেই শিবের সেব্য বলেন, কেউ বা উভয়ের একত্ব নির্দেশ করেন। এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের মর্যাদা আমাদের এমন যথার্থভাবে বলুন যে অবাধে আমাদের সন্দেহের নিবৃত্তি হয়।

সূত বললেন, ঋষিরা সবাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত শুনুন। মহেশের চেয়ে বড় যে আর কিছু নেই, তা সমস্ত বেদ সম্মত। শিবের কৃপাতেই বিষ্ণু প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা হয়েছে। দান বলে বিষ্ণুকে মহেশ্বর অনুগ্রহ করেছেন। ইহা শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের যথার্থ সিদ্ধান্ত। ইন্দ্র উপেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই মহেশ্বরের কিঙ্কর। বেদান্তবেদ্য প্রভু পার্বতীপতিকে ঈশ্বর বলে যিনি অবগত হন, তিনি সমস্ত প্রাণীর দুঃখহারী সাক্ষাৎ বিষ্ণু। বিষ্ণুকে যিনি ঈশ্বর বলে জানেন, তিনি সাক্ষাৎ ইন্দ্র। ইন্দ্রকে যিনি ঈশ্বর বলে জানেন, তিনি ঋষি। ঋষিদের যিনি ঈশ্বর মনে করেন, তাঁর স্বর্গ লাভ হয়। কিন্তু অদ্বৈত শিবরূপী ঈশ্বরকে না জানলে মুক্তি হয় না। ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হলে মানুষ শিব-পরাঙ্মুখ হবে, দ্বৈপায়ন এই সত্য কথ্য বলেছেন।

কামদেব শিবের কোপানলে দগ্ধ হলে তাঁর পত্নী রতির বিলাপে কামের বন্ধু বসন্ত প্রভৃতি অধিকতর দুঃখিত হয়ে এসে রতিকে বললেন, এখন কী করা যায়? শিব সর্বলোকেশ্বর, আমরা তো তাঁর বৈর নির্যাতনে অসমর্থ!

রতি বললেন, লোকে যাতে তাঁকে ঘাতক মনে করে এবং জগতে যাতে তাঁর পূজা না হয়, যেভাবেই হোক সেই রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর অপকীর্তি ঘোষণা করতে হবে। তাতে কিছু ফল না হলেও আমার দুঃখের খানিকটা শান্তি হবে।

বসন্ত প্রভৃতি বললেন, যে চন্দ্রশেখর চতুর্দশ বিদ্যায় অভিহিত, বেদান্ত সংশিত ব্রত মুনি ও ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা যাঁর মাহাত্ম্য গানে তৎপর, সেই দেবদেবের ন্যূনতার কথা বললে কর্ম চণ্ডাল নাম হবে। ব্রহ্মা বিষ্ণুকেও তাঁর তুল্য বললে ষাট হাজার বছর বিষ্ঠায় কৃমি হয়ে থাকে। যখন তুল্য বলা যায় না, তখন ন্যূন বলা কি সম্ভব? অথচ মিত্রের ঋণ মুক্তির ইচ্ছা আছে, তাই বড় সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে দেখছি।

সূত বললেন, তখন মহামোহ প্রভৃতি কামের মিত্ররা এই রকম

বিচার করে সর্বলোক ভয়ঙ্কর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করল। এক সময়ে কৃপানিধি ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হয়ে কলির সেবক মোহ দম্ভ ক্রোধ লোভ ও হেতুবাদকে বললেন, তোমরা ইচ্ছামত বর নাও। তোমরা যা চাইবে, আমি তাই দেব।

মোহাদি বলল, প্রভু, আমাদের পরম মিত্র কামকে মহাদেব বিনষ্ট করেছেন, এই ঋণ পরিশোধের জন্য আমরা বৈর নির্যাতনে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমাদের নিকট থেকে চন্দ্রশেখর যাতে পূজা নিতে না পারেন, সেইজন্য আমরা তাঁর পূজার নিন্দা করব।

ব্রহ্মা বললেন, সম্প্রতি তা সম্ভব নয়, বহুকাল পরে তা হবে। যারা তোমাদের বশবর্তী হবে, তারা শিব পূজা করবে না। তোমাদের প্রার্থনায় এই বর দিলাম। এখন যা ইচ্ছা কর।

সূত বললেন, ব্রহ্মা তাদের এই কথা বলে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। মোহ প্রভৃতি সকলেই তখন মিলিত হয়ে দুঃখের সঙ্গে কলির সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগল। কলি বলল, তোমরা 'এখনই' না বলে 'নিন্দা করব' বলেছ, তাই আমার অধিকারের কাল উপস্থিত হলেই এ সমস্ত হবে। যারা আমাদের বশবর্তী হবে, তারাই শুধু শিবের নিন্দা করবে। যারা আমাদের মানবে না, তারা শিবের নিন্দা করবে না। অর্থাৎ দারুণ ভাব নিয়ে আমি উপস্থিত হলে লোভ মোহাদি যুক্ত লোকেরাই হেতুবাদের আদর করে শিবভক্তি পরাঙ্মুখ হবে।

সূত বললেন, সমস্ত ধর্ম বিবর্জিত প্রবল কলিযুগ উপস্থিত হলে ম্লেচ্ছরা ব্রাহ্মণ ও গোবধ করতে থাকবে, স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার উঠে যাবে, জৈন ও বৌদ্ধদের প্রাদুর্ভাব বাড়বে, ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছাচারী ও শূদ্র ব্রাহ্মণঘাতী হবে। ঋতুরাজ বসন্ত তখন ব্রাহ্মণের ঔরসে বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন হয়ে মধু নামে খ্যাত হবে। তার দ্বারা কর্ণাট তিলঙ্গাদি দেশ দূষিত হবে। সেই পাপিষ্ঠ বিধবার:পুত্র শিষ্যের ভাব অবলম্বন করে বেদান্ত ব্যাখ্যারত প্রভু পদ্মপাদুককে পূজা করবে। মধু তার নিকটে সম্পূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আহ্নিক ত্যাগ করে কুতর্ক করবে, অগ্নিহোত্র

কী, যাগই বা কী? গুরু তার কথা শুনে এ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নয় বুঝতে পেরে সেই দুষ্টকে বলবেন, কোন্ বর্ণে তোমার উৎপত্তি তা যথার্থ বল। ব্রাহ্মণের কর্মে তোমার যখন দ্বেষ, তখন তোমার উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুলে নয়। মধু বলবে, আমি ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত, তাতে সংশয় নেই। গুরু বলবেন, তোমার মাতা কার কন্যা এবং কে কবে কী ভাবে কোন্ বিধি অনুসারে কাকে সম্প্রদান করেছিলেন তা বল। মধু বলবে, প্রভু, আমার জননী বিধবা অবস্থায় তপস্বী ব্রাহ্মণের সংসর্গে গর্ভবতা হন, তাতেই আমার জন্ম হয়েছে। গুরু বলবেন, দুরাত্মা, কাপট্য অবলম্বন করে আমার নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ বলে কদাচ তোমার শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্ফূর্তি পাবে না। মধু বলল, মহাভাগ, আপনার কথার অন্যথা হবে না। কিন্তু পূর্ব পক্ষ আমার হৃদয়ে যেন দৃঢ় থাকে। গুরু বলবেন, সিদ্ধান্তে অন্ধতা ও পূর্ব পক্ষে তোমার পটুতা হবে। কিন্তু তোমার শিষ্যরা পাপিষ্ঠ হবে। তারা মোহ বশে সিদ্ধান্ত জ্ঞানহীন, লোভ বশে রাজ সেবক, ক্রোধ বশে পুরুষ-ভাষী, দম্ভ বশে ধার্মিকবেশধারী এবং হেতুবাদ বশে শাস্ত্রেয় তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম হবে। স্বল্প কাল মধ্যে তারা চিরদিনের মত নরকে যাবে।

সূত বললেন, তারপর দুষ্টবুদ্ধি মধু গুরুর শাপগ্রস্ত হয়ে বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করবে। সেই কাজের জন্য সে দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্য নামে খ্যাত হবে। কলিযুগে তার খুব প্রাধান্যও হবে। শিষ্য প্রশিষ্যরা আর্যাবর্ত উৎকল গৌড় গঙ্গা ও গোদাবরীর তীর অর্বুদারণ্য ছাড়া অন্যত্র প্রচার পাবে। কলির প্রচার অনুসারে মহারাষ্ট্রেও তাদের প্রচার হতে থাকবে। এই হৈতুকরা কোথাও বা বিরল হবে। তারপর মহা-ম্লেচ্ছ পরিবৃত অতি দুষ্ট সময় উপস্থিত হলে পাপাচারী শিষ্যরা প্রচ্ছন্ন-ভাবে নানা স্থানে প্রচার চালাবে। দুষ্ট বুদ্ধি যুক্ত পাঁচ বৎসরের সন্ন্যাসী অধ্যয়ন করে শিষ্য উপশিষ্যের যোগে এইরকম হেতুবাদ করবে— সংসারই তত্ত্ব, এ বাধ্য নয়, সত্য—এ কথা যে বলে সেই তত্ত্ববাদী বস্তুতপক্ষে মিথ্যাবাদী বলে কথিত। এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা ও

মায়া কল্পিত, এইরূপ মায়াবাদী যারা তারাই তত্ত্ববাদী। সেই মিথ্যাবাদীরা কর্মকাণ্ড প্রবর্তক জৈমিনি প্রণীত সৎ শাস্ত্র মীমাংসা, গৌতম প্রণীত ঈশ্বর প্রতিপাদক ন্যায় দর্শন, কপিল প্রণীত পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক বোধক শাস্ত্র, ঈশ্বর প্রতিপাদক বৈশেষিক দর্শন, যোগশাস্ত্র, পাতঞ্জল, এ সমস্তকেই শৈব শাস্ত্র বলে থাকে। এমন কি অদ্বৈত বোধক শ্রেষ্ঠ বেদান্ত শাস্ত্র, ষড়ঙ্গ সমন্বিত বেদ, পুরাণ, উপ-পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি ও উপস্মৃতিও তাদের মতে শৈব শাস্ত্র। কিন্তু অধিকার অনুসারে সমস্ত বিদ্যারই পরস্পর প্রামাণিকতা আছে, আত্ম পক্ষে সব শাস্ত্রের তাৎপর্য—হেতুবাদীরা এই কথা বলবে। শাস্ত্রে পরস্পরের কিছু বিরোধ প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে কিছু মাত্র বিরোধ নেই। হেতুবাদীরা বলে, লোকে মহেশ্বরকে পরাৎপর মনে করে, কিন্তু বেদমার্গ থেকে বহিষ্কৃত পাপিষ্ঠরা মধ্বাচার্যকে মানে না, প্রত্যুত তারা তাকে বিধবার পুত্র বলে থাকে। মহাদুষ্ট মধু প্রচ্ছন্ন চার্বাক। কলিকালে এই মধুই শিবের নিন্দার প্রবর্তন করবে। কলি-কালে মোহ বশে সিদ্ধান্ত বহির্ভাব, ক্রোধ বশে শাস্ত্র প্রতিষেধ, লোভ বশে রাজ সেবা, দম্ভ বশে অন্য প্রতারণা, কাম বশে গণিকা মৈথুন এবং হেতুবাদ বশে বিচারকতা—এই ছয় প্রকার তত্ত্ববাদিতার লক্ষণ। নাস্তিকরা বালককে নিয়ে ক্রমে পাঁচ বছর বয়সে তাকে যতি করে ধনলোভে তাকেই মঠাধিপত্য দেবে। অনুরাগ ক্রমে মঠাধিপত্যে পরম্পরা ক্রম রক্ষা করবে। সেই পাপিষ্ঠরা ভোগাসক্ত, দাসীগমনকারী, তীর্থে যানারূঢ় ও সেবক পরিবৃত হয়ে নামে মাত্র সন্ন্যাসী হবে। তারা শিখা সূত্র বর্জিত হবে, মানুষ বাহিত শিবিকাদি যানে আরোহণ করবে। তাদের পক্ষপাতী মূঢ় গৃহস্থরা শিবের নিন্দা করবে। মিথ্যা বৈষ্ণবাভিমানগ্রস্ত হয়ে তারা নরকগামী হবে। বেশে বৈষ্ণব, সূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্রোধে বিচারক ও হেতুবাদে পণ্ডিত হবে। দোষ দেবার জন্য তখন শাস্ত্রপাঠ হবে এবং পরের মতের দোষ দেখিয়ে নিজের মতের দোষ গোপন করাই পণ্ডিতের কাজ হবে।

সূত বললেন, তখন রতির দুঃখ নিবারক মহামোহ প্রভৃতি সকলেই ভামিনী রতিকে আশ্বস্ত করে কোমল ভাবে বলল, সন্তাপ কোরো না। আমি কলির সখা মোহ, আমি তোমার পতির পরম বন্ধু ক্রোধ, আমরা লোভ মোহ তোমার দেবর। কলিযুগের সম্পূর্ণ অধিকার হলে আমরা দক্ষিণ দেশে মধ্বাচার্য রূপে অবতীর্ণ বসন্তকে আশ্রয় করে কুটিল বুদ্ধি বলে শিবপূজা নিবারক হেতুবাদ যথাশক্তি প্রচার করব।

সূত বললেন, এই ভাবে তারা রতিকে আশ্বস্ত করে যথাস্থানে গমন করল। শিবের নিন্দার কারণ আমি আপনাদের সবই বললাম।

বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র লাভ

ঋষিরা বললেন, সূত, বিষ্ণু কী ভাবে মহাদেবের নিকটে সুদর্শন চক্র পেয়েছিলেন, সেই কথা বলুন।

সূত বললেন, দেবাসুরের অদ্ভুত যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে দৈত্যদের হাতে পরাজিত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাগত হলেন। দৈত্যদের ভয়ে ভীত ক্ষতাঙ্গ ও অতি দুঃখ প্রাপ্ত দেবতারা বিবিধ স্তোত্রে তাঁর স্তব ও প্রণাম করে সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাই দেখে জনার্দন বললেন, দেবতারা কী জন্যে এসেছেন?

বিষ্ণুর কথা শুনে সুরশ্রেষ্ঠরা বললেন, অসুরদের নিকটে পরাজিত হয়ে আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনিই দেবতাদের রক্ষক, আপনি সেই অবধ্য অসুরদের শীঘ্র বিনাশ করুন। জালন্ধর বধের জন্য মহাদেব যে চক্র নির্মাণ করেছেন, তাঁর বরেই সে চক্র লাভ করে আপনি সেই মহাবল দৈত্যাদের বধ করুন।

বিষ্ণু তাঁদের সেই কথা শুনে বললেন, আমি তাই করব। বলে তিনি হিমালয় পর্বতে গিয়ে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে তা গন্ধজলে স্নান করিয়ে ত্বরিতাখ্য রুদ্র মন্ত্রে শিবের পূজা করলেন। তারপর ভব প্রভৃতি প্রত্যেক নামে এক একটি পদ্ম অর্পণ করে তাঁর সহস্র নামে শিবের স্তব করলেন [একচত্বারিংশ অধ্যায়]। স্বয়ং শিব বিষ্ণুর ভক্তি

পরীক্ষার জন্য সেই সহস্র কমল থেকে একটি পদ্ম গোপন করেন। বিষ্ণু আশ্চর্য হয়ে একটি পদ্ম কোথায় গেল ভেবে নিজের একটি চক্ষু দিয়ে শিবের পূজা করলেন। বিষ্ণুর এই দৃঢ় ভক্তি দেখে কোটি সূর্য-সন্নিভ শূল-টঙ্ক-গদা-চক্র-কুন্ত-পাশধারী বরাভয়কর সর্বাভরণ-ভূষিত ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখররূপে শিব সূর্যমণ্ডল থেকে প্রাদুর্ভূত হলেন। কমল-লোচন দেবদেব ঈশ্বরকে অবলোকন করে তাঁর চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হলেন। শিবের সেই মূর্তি দর্শন করে দেবতারা ভীত হয়ে প্রস্থান করলেন। ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত কম্পিত হল। অধ ও ঊর্ধ্ব দেশের শত যোজন শিবের তেজে দগ্ধ হতে লাগল। বিষ্ণুকে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দেখে শিব সহাস্যে বললেন, মধুসূদন, দেবতাদের বর্তমান কর্ম আমি অবগত আছি, তাই তোমাকে এই অদ্ভুত-দর্শন দিব্য চক্র দিচ্ছি। এরই গুণে তুমি দৈত্যদের বধ কর। এই বলে তিনি অযুত সূর্য সমপ্রভ চক্র বিষ্ণুকে দিলেন। শিবের বরেই বিষ্ণু পুণ্ডরীকাক্ষ নামে জগতে বিখ্যাত হলেন। শিব পুনরায় নারায়ণকে বললেন, তুমি অন্য ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। শিবের কথা শুনে জনার্দন সপ্রণয়ে বললেন, দেবদেবেশ, আপনার প্রতি আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে, আমাকে এই বর দিন। ঈশ্বর বললেন, আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তি থাকবে এবং আমার প্রসাদে তুমি ত্রিলোকে অজেয় হবে।

সূত বললেন, শিব বিষ্ণুকে এই বর দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। সূর্য এই কাহিনী বলেছিলেন। বিষ্ণু কথিত শিবের সহস্র নাম যে পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। এতে সংশয় নেই। একাগ্র চিত্তে ইহা পাঠ করলে বিদ্যা ও ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং তার প্রতি শিবের প্রীতি হয়। দুস্তর জলে পড়ে এই সহস্র নাম পাঠ করলে জল স্থলে পরিণত হয়। এই সহস্র নামের প্রভাবে মহাসর্প হারবৎ ও সিংহ ক্রীড়া মৃগের ন্যায় হয়। তাই শিবকে সহস্র নামে স্তব করা উচিত। এই স্তবে স্তুত হলে

তিনি সমস্ত কামনা পূরণ করেন এবং দেহান্তে পরম গতি প্রদান করেন।

শিবপূজার বিধি

ঋষিরা বললেন, বিষ্ণু যে ভাবে শিবের নিকটে চক্র লাভ করেন তা শুনলাম। এবারে আমরা শিবপূজার বিধি শুনতে অভিলাষী হয়েছি।

সূত বললেন, শিবপূজার বিধি আমি সংক্ষেপে বলছি। কারণ শত বৎসরেও তা সবিস্তারে বলা যায় না। পুরাকালে সিদ্ধ গন্ধর্ব সেবিত সুমেরুর শৃঙ্গে কুলানন্দকারা নন্দী সনৎকুমারকে এই শিবপূজার বিধি বলেছিলেন। সর্বজ্ঞ নন্দীশ্বর যখন গণপরিবৃত হয়ে সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন সনৎকুমার তাঁর সমীপে এসে দণ্ডবৎ প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে শিবপূজার বিধি উপদেশ দিন।

নন্দীশ্বর বললেন, তুমি সর্বাত্মক মহাদেবের ভক্ত বলেই তোমাকে শিবপূজার বিধি বলছি। প্রথমে যথাবিধি স্নানাদি নিত্যকর্ম শেষ করে পূজার স্থানে বসে তিনবার প্রাণায়াম করে সদাশিবের ধ্যান করবে। শরীর শোষণ দহন ও প্লাবন করে শৈবদেহ অবলম্বন করে অঙ্গন্যাস করবে। চন্দনের জলে পূজার স্থান ও পূজার সমস্ত দ্রব্য প্রোক্ষণ করবে। তারপর সূত্রাত্মক মন্ত্র, শিব গায়ত্রী ও গায়ত্রী পাঠ করে আমি ও মহাকাল এই দুই দ্বারপালের পূজা করবে। অযুত সূর্যসমপ্রভ চতুর্ভুজ বানরানন ত্রিনয়ন পুষ্পমালা শোভিত সর্বাভরণশোভাঢ্য নন্দীশ নামে আমাকে বাম পাশে এবং ঘোররূপ ভয়াবহ দংষ্ট্রকরালবক্তু কালাগ্নিচয় সন্নিভ মহাকালকে ডান পাশে পূজা করবে। পরে শিবের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে পঞ্চ মন্ত্রে পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দেবে। জ্ঞানী সাধক গন্ধপুষ্প দিয়ে মহাদেব স্কন্দ ও বিনায়কের পূজা করে প্রণবাদি নমোস্ত সূক্ত মন্ত্রে লিঙ্গ শুদ্ধি করবে। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যরূপ অষ্টদল পদ্মে তাঁর আসন কল্পনা করে শিবের পূজা করবে। তারপর শিবের

স্তব প্রদক্ষিণ প্রণাম পুনর্বার অর্ঘ্যদান পুষ্পাঞ্জলিদান ও প্রণাম করে বিসর্জন করবে। আমি সংক্ষেপে তোমাকে শিবপূজার এই বিধি বললাম। সমস্ত বেদে এ গোপনীয়। এ আমি শিবের নিকটে শুনেছি।

সূত বললেন, সনৎকুমার নন্দীশ্বরের নিকটে শিবপূজার যে বিধি শুনেছিলেন, আমি আপনাদের তা বললাম। ভক্তিপূর্বক এই পূজা বিধি পাঠ করলে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে সাদর বসতি পাওয়া যায়।

উমা-মহেশ্বর ব্রত

সূত বললেন, উমা-মহেশ্বর নামে পাপ বিনাশক ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ-প্রদ ত্রিলোক বিশ্রুত এক ব্রত আছে। পূর্ণিমা অমাবস্যা চতুর্দশী ও অষ্টমীর রাতে এই ব্রত কর্তব্য। ব্রতকর্তা ব্রহ্মচারী হবিষ্যাশী সত্যবাদী ও সুসংযত হবে। বৎসরান্তে সুবর্ণ বা রজত দিয়ে প্রতিমা করবে এবং পঞ্চামৃতে স্নান করিয়ে বস্ত্র ও পুষ্পে অলঙ্কৃত করে নানাবিধ ভক্ষ্য দিয়ে পূজা করবে। গুরুকে বস্ত্র অলঙ্কার ও ভূষণ দিয়ে ভক্তি সহকারে পূজা করবে, দক্ষিণা দেবে এবং শিবভক্তদের ভোজন করাবে। একজন শৈবকে ভোজন করালে একশোজনকে ভোজন করানোর ফল লাভ হয়। ইহা দেবের অথবা বেদের বাক্য। পূজিত প্রতিমা তাম্রপাত্রে রেখে শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদন করে প্রণাম করবে। শঙ্খতূর্যাদি বাদ্যধ্বনি করে শিবালয়ের বেদীতে প্রতিমা রেখে ব্রত নিবেদন করবে। তারপর শিবকে প্রদক্ষিণ করে দেবদেবকে 'ক্ষমস্ব' বলবে। এই ব্রত আচরণ করে মানুষ অযুত সূর্যসন্নিভ সর্বকামপ্রদ বিমানে সহস্র স্ত্রী ও বিবিধগণে পরিবৃত হয়ে শোকশূন্য শিবলোকে যায়। সেখানে তিনশো কল্প বাস করবার পরে বিষ্ণুলোকে ও পরে ব্রহ্মলোকে বাস করে। ক্রমে ক্রমে প্রাজাপত্যলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক, গন্ধর্বলোক ও যক্ষলোক ভোগের পর সুমেরু শৃঙ্গে বিবিধ ভোগ করেন। তারপর

লোকপালদের আনন্দ উপভোগের পর পৃথিবীতে একছত্র অধিপতি হন। উমা মহেশ্বর নামের এই সর্বসুখপ্রদ ব্রত শিব স্বয়ং পার্বতী ও কার্তিকেয়কে বলেছিলেন, কার্তিকেয়র নিকটে পেয়েছিলেন অগস্ত্য মুনি। তাঁর কাছ থেকে আমার গুরু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই ব্রত পেয়ে আমাকে দিয়েছিলেন।

শূলব্রত

সূত বললেন, এবারে শূলব্রত নামে অন্য ব্রতের কথা বলছি। এক বৎসর অমাবস্যায় উপবাসী থেকে সুসংযমী থাকতে হবে। বৎসরান্তে পিষ্টকের শূল শিবকে নিবেদন করতে হবে। সুবর্ণকণিকা যুক্ত রজত পদ্ম ভক্তি সহকারে শিবের মাথায় স্থাপন করতে হবে। আর সব বিধি উমা মহেশ্বর ব্রতের মতো। শূলব্রত করে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ মুক্ত হয়ে পরম গতি লাভ করা যায়। এতেও পূর্বের মতো সমস্ত লোক ভোগ করা যায়। এক বৎসর অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ব্রত করে প্রতিমা নিবেদন করবে। অষ্টমী ও চতুর্দশীতে জিতেন্দ্রিয় হয়ে উপবাসী থাকবে। তাতে শিবলোকে সাদর বসতি লাভ হয়। ক্ষমা সত্য দয়া দান শৌচ ইন্দ্রিয় সংযম শিবপূজা হোম সন্তোষ চৌর্যাভাব—এই দশবিধ ধর্ম সমস্ত ব্রতের সাধারণ নিয়ম।

দূর্বাগণপতি ব্রত

সূত বললেন, পাপ বিনাশক অন্য ব্রতের কথা শুনুন। এই ব্রতের কথা শিব ষড়াননকে বলেছিলেন। পার্বতীনন্দন স্কন্দ কৈলাস শিখর স্থিত জগৎগুরুকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন্ ব্রত করলে পুত্র পৌত্র ধন ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্য লাভ হয় ও মানুষ সুখে থাকতে পারে? যে ব্রত আচরণ করলে মানুষ রাজ্যলাভও করতে পারে, দাসকুলে সম্ভূতা নারীও রাজ্ঞীর মতো হয়, রাজপুত্র সর্পকুলজয়ী গরুড়ের মতো হয়, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে সবার বড় হতে পারেন এবং

বর্ণাশ্রম ধর্ম বর্জিত হয়েও সিদ্ধি লাভ হয়—এই রকম ব্রতের কথা আমাকে বলুন।

ঈশ্বর বললেন, বৎস, দূর্বাগণপতির এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত ব্রত আছে। পূর্ব কল্পে ভগবতী পার্বতী লক্ষ্মী সরস্বতী ইন্দ্র বিষ্ণু কুবের ও অন্যান্য দেবতা মুনি গন্ধর্ব ও কিন্নরেরা এই ব্রত করেছে। শ্রাবণ বা কার্তিক মাসের শুক্লা চতুর্থীতে এই ব্রত কর্তব্য। গজানন চতুর্ভুজ উৎপাটিত একদন্ত বিঘ্নরাজের সোনার প্রতিমা নির্মাণ করে স্বর্ণ পীঠে স্থাপন করবে। সেই আসনে সোনার দূর্বাও রাখবে। সর্বতোভদ্র-মণ্ডলে কলসের উপরে তামার পাত্রে সেই আসনস্থ গণপতিকে রক্তবস্ত্রে বেষ্টন করে স্থাপন করবে এবং রক্তপুষ্প ও বিল্ব অজামার্গ শমী দূর্বা ও তুলসী এই পাঁচ পত্রে পূজা করবে। অন্যবিধ সুগন্ধ পুষ্প ও পত্রিকাও চলবে। পরে ফল ও মোদক দিয়ে উপহার প্রদান করবে। তারপর শ্রদ্ধাসহকারে গণেশের পূজা করে সোনার গণেশ আচার্যকে দেবে। যে পাঁচ বৎসর এই ব্রত উদ্‌যাপন করে দেহান্তে তার অভীষ্ট লোক প্রাপ্তি ও শম্ভুপদ লাভ হয়। অথবা সংযতেন্দ্রিয় হয়ে তিন বৎসর শুক্লা চতুর্থীতে এই ব্রত করবে। তাতে সর্বসিদ্ধি লাভ হবে। যে ব্রত করে উদ্‌যাপন করবে না, তার শুক্ল তিল যোগে প্রাতঃস্নান কর্তব্য। জ্ঞানী সাধক সোনা বা রূপায় গণেশ নির্মাণ করে পঞ্চ গব্যে স্নান করিয়ে দূর্বা দিয়ে পূজা করবে।

শিবমন্দির নির্মাণ ও শিবপূজার ফল

ঋষিরা বললেন, মাটি থেকে রত্ন পর্যন্ত দিয়ে শিবালয় নির্মাণ করলে যে ফল লাভ হয়, আমাদের তা বলুন।

সূত বললেন, শিবালয় নির্মাণের অনন্ত ফল। সর্বপ্রকার যত্ন নিয়ে যে লোষ্ট্র দিয়ে শিবমন্দির করে, তারও ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ লাভ হয়। কৈলাস সুমেরু মন্দর হিমালয় নিষধ নীলাদ্রি অথবা মহেন্দ্র নামে শিবের প্রাসাদ নির্মাণ করলে সেই পর্বতের মতো সর্বকামপ্রদ

বিমানে আরোহণ করে সে দিব্য শিবপদ লাভ করে চিরকাল আনন্দ উপভোগ করে। মহাপ্রলয় পর্যন্ত ভোগের পর সে শিবের সাযুজ্য লাভ করে। যে পতিত বা জীর্ণ প্রাকার মণ্ডপ দ্বার বা প্রাসাদ পুনরায় পূর্ববৎ করে, তারও প্রথম নির্মাতার মতো পুণ্য হয়। বৃত্তির জন্য যে শিবালয়ে কাজ করে, তারও সবান্ধবে স্বর্গবাস হয়। আত্মভোগ সিদ্ধির জন্যেও রুদ্রালয়ে একবার কাজ করলেও স্বর্গবাস হয়। শিবের মন্দির নির্মাণের সামর্থ্য না থাকলে সম্মার্জনাদি করলেও কামনা পূর্ণ হয়। যে মৃদু সূক্ষ্ম সম্মার্জনী দিয়ে শিবালয় মার্জনা করে, এক মাসেই তার সহস্র চান্দ্রায়নের ফল হয়। শিবের সামনে অগ্নি স্থাপন ও শিব-পূজা করে যে তাতে নিজের দেহ আহুতি দেয়, তার শিবপদ প্রাপ্তি হয়। শিবের ক্ষেত্রে অনশনে প্রাণত্যাগ করলে শিবের সাযুজ্য লাভ হয়। শিবের ক্ষেত্র দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। শিবের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় এবং শিবলিঙ্গ দর্শনে তার দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। দর্শনের চেয়ে পূজার ফল শতগুণ এবং জলে স্নান করানোয় পূজার চেয়ে বেশি ফল। জলের চেয়ে শতগুণ ফল দুগ্ধে স্নান করানোয়, সহস্র গুণ ফল দধিতে স্নান করানোয় এবং মধু দিয়ে স্নান করানোয় তার চেয়েও শতগুণ ফল। ঘৃতে স্নান করালে অনন্ত ফল লাভ হয়। এরও শতগুণ ফল বস্ত্র দানে। এর কোটি গুণ পুণ্য লাভ হয় শিবালয়ে মৃত্যু হলে। প্রায়োপবেশন প্রভৃতি নিয়ম করে যে দেহত্যাগ করে, তার পুণ্য হয় এরও শতগুণ। যে পাদচার প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে তিনবার শিবের মন্দির প্রদক্ষিণ করে, তার প্রতি পাদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

দ্বিজগণ, যে কর্মে দুর্লভ মোক্ষও অনায়াসে লাভ হয়, এবারে তাই শুনুন। মন্ত্রজ্ঞ কর্মী চতুষ্কোণ মণ্ডল গোময় লিপ্ত করে পুষ্পপল্লব ছত্র পতাকা, দীপমালা ও চন্দ্রাতপ প্রভৃতি দিয়ে সজ্জিত করে একটি এক হাত প্রমাণ পঞ্চাশ দলের পদ্ম এঁকে তার কর্ণিকায় দেবীর সঙ্গে শিবকে স্থাপন করবে এবং অকারাদি বর্ণ যোগে রুদ্রদের বিন্যাস করবে।

তারপর শিব ও রুদ্রদের পূজা করে পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। ব্রাহ্মণদের অক্ষমালা যজ্ঞোপবীত কুণ্ডল কমণ্ডলু আসন দণ্ড উষ্ণীষ ও বস্ত্র দান করে শিবের উদ্দেশে মহাচরু নিবেদনের পর কালো রঙের গো-মিথুন দান করবে। সব শেষে শিবকে সেই বর্ণমণ্ডল দিয়ে যোগোপযুক্ত দ্রব্য দেবে এবং সমগ্র বর্ণ জপ করবে। তাতে যোগীরা যে ফল লাভ করেন, সেই ফলই পাওয়া যায়।

সরোবরের জল বস্ত্র পূত হলে পবিত্র এবং ফেনবর্জিত হলে নদীর জল পবিত্র। সর্বসিদ্ধির জন্য সমস্ত বৈদিক কাজ পবিত্র জলে সম্পাদন করতে হয়। সমস্ত প্রাণীরই অহিংসা পরম ধর্ম। অভয় দান সমস্ত দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই হিংসা সর্বদাই বর্জনীয়। যাঁর বাক্য মন ও কর্ম সমস্ত প্রাণীর হিতে তৎপর, দয়া যাঁদের পথপ্রদর্শক, তাঁরা শিবলোকে গমন করেন। শিব মন্দিরে একটি প্রাণী বধ করলে সমস্ত ত্রৈলোক্য বধের পাপ হয়। শিবের জন্য শুধু পুষ্প হিংসা করা যায়। যজ্ঞের জন্য পশু হিংসা ও রাজার দুষ্ট শাসনও কর্তব্য। কিন্তু স্ত্রীলোক সর্বত্র অবধ্য। অত্রি কুলসম্ভূতা রমণী বধে ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়। পাপকর্মে রত হলেও কোন দ্বিজ স্ত্রীলোক হত্যা করবেন না। এই ব্যবস্থা সর্বধর্ম সম্মত। অতএব অহিংস শান্ত শিবভক্তপ্রিয় হয়ে শিবের ভক্তি করলে সেই জন্মেই মুক্তি লাভ হয়। মনীষীরা সমস্ত পরিত্যাগ করে বিশ্বেশ্বর বিরূপাক্ষে ভক্তি করবেন। মানুষের মন পুত্র ও ধনে যে ভাবে সতত আসক্ত, শিবের প্রতি তেমন হলে শিবপদ আর দূরে থাকে না। যারা যে ভাবে শিবের ভজনা করে, শিব তাদের সেই ভাবেই ফল দেন। ভক্তি নিষ্ফল হয় না।

মোহান্ধ দ্বিজাধম উচ্ছিষ্ট অবস্থায় শিব পূজা করলে পিশাচ-লোকে দুর্ভোগ ভোগে। ক্রুদ্ধ হয়ে শিব পূজা করলে রাক্ষসের স্থান ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিব পূজা করলে যক্ষের স্থান প্রাপ্ত হয়। নৃত্য গীত করে শিব পূজায় গন্ধর্বলোক, প্রশংসা পরায়ণ হয়ে শিব পূজা করলে ইন্দ্রপদ এবং জলাহারে থেকে শিব পূজা করলে চন্দ্রপদ লাভ হয়।

নিরন্তর এক বৎসর গায়ত্রী মন্ত্রে শিব পূজা করলে প্রজাপতির পদ পাওয়া যায়, প্রণবে শিব পূজা করলে ব্রহ্মলোক এবং তাতেই বিষ্ণুলোক পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা সহকারে একবার মাত্র শিব পূজা করেও রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে রুদ্রদের সঙ্গে আনন্দ ভোগ করা যায়। শিবের সামনে এই অধ্যায় যে শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে স্থান পায়।

রুদ্র পাশুপত ব্রত

ঋষিরা বললেন, আমরা শিবের আরও মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষী। রুদ্র সর্বাত্মক কেন এবং পাশুপত ব্রত কী রূপ, তা নিঃসংশয়ে বলুন।

সূত বললেন, পুরাকালে ব্রহ্মাদি দেবতারা শিবের দর্শনের জন্য শিবের প্রিয় মন্দর পর্বতে গিয়ে তাঁর স্তব করে সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিব তাঁদের দেখে লীলাক্রমে জ্ঞান অপহরণ করলেন। তাঁরা সম্মুখে স্থিত আত্মস্বরূপ মহাদেবকে অজ্ঞানতাবশত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে ?

মহেশ্বর বললেন, আমিই পুরাতন। প্রথমে আমিই ছিলাম, এখনও আমি আছি, পরেও আমি থাকব। আমি ছাড়া আর কেউ এরকম নয়। আমাকে ছাড়া আর কিছু নেই। আমি নিত্য অনিত্য, আমি ব্রহ্মা ব্রহ্মণস্পতি. আমি দিক্-বিদিক্, আমি প্রকৃতি পুরুষ, আমি ত্রিষ্টুক জগতী অনুষ্টুপ ও পংক্তি ছন্দ, আমিই ত্রয়ী। আমি সর্বতোভাবে শান্ত সত্য, আমি ত্রেতাগ্নি, আমি গো ও গুরু। আমি হর ও গৌরী, আমি জগদীশ্বর। আমি আকাশ, সমুদ্র ও জল। আমিই সমস্ত বেদ ইতিহাস পুরাণ ও কল্পগ্রন্থ। আমি ক্ষর ও অক্ষর, ক্ষান্তি ও শান্তি, আমি অজ ও পবিত্র, আমি পুষ্কর, আমি জ্যোতি ও অন্ধকার। আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, আমি বুদ্ধি অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়। যে আমাকে সর্বাত্মক বলে জানে, সে সর্বজ্ঞ ও দেবশ্রেষ্ঠ। এই সব বলে তিনি সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। দেবতারা রুদ্রকে দেখতে পেলেন না।

তাই তারা রুদ্রকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং নারায়ণ ও ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতা ও মুনিরা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

পাশুপত ব্রত সংক্ষেপে আচরণ করব বলে পাশুপত ব্রত করবে। সৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং যোগ্য বৈশ্যগণের, বিশেষত যতিদের পাশুপত নামে পাশ বিমোচক এক দিব্য ব্রত নির্দিষ্ট আছে। পাশুপত ব্রতনিষ্ঠ বিপ্র অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিহোত্র গ্রহণ করে অঙ্গে ভস্ম মাখবে। সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করলে মহাপাতক পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভস্ম অগ্নির বীর্য স্বরূপ। তাই ভস্মভূষিত মানুষও বীর্যবান।

ব্রহ্মা এই স্তুতিবাদের পর বিরত হলেন এবং মহেশ্বরের মতো সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখলেন। দেবতাদের সন্তোষের জন্য মহেশ্বর উমার সঙ্গে তাঁদের সন্নিহিত হলেন। তাঁদের স্তুতি শুনে বৃষধ্বজ শঙ্কর বললেন, আমি তুষ্ট হয়েছি। এই বলে বর দান করেই ক্ষণকালের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

সূত বললেন, শিবের সামনে এই অধ্যায় পাঠ করলে সমস্ত তীর্থ দর্শনের, সব রকম যজ্ঞানুষ্ঠানের, সব দেবতা আরাধনার, সব ব্রতা-নুষ্ঠানের অথবা সমস্ত স্তোত্র পাঠের ফল লাভ হয় এবং দেহাবসানে গাণপত্য লাভ হয়।

শিবের মাহাত্ম্য

সূত বললেন, এইবারে শিবের মাহাত্ম্যের কথা বলছি শুনুন। মুনিরা এ কথা বহু শাস্ত্রে নানা ভাবে কীর্তন করেছেন। জ্ঞানীরা যাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার করে থাকেন, সেই শঙ্করকে কোন কোন মুনি সৎ ও অসৎ এবং সদসৎ সমস্ত বস্তুতেই অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ সৎ ও অসৎ উভয়ই শিবরূপ, শিব ভিন্ন আর কিছু নেই। শিব সৎ ও অসৎ উভয়েরই পতি বলে শিবকেই তাঁরা সদস্‌-পতি বলেছেন। কোন কোন তত্ত্বদর্শী মুনি মহেশ্বরকে ক্ষর অক্ষর ও

ক্ষরাক্ষরপর বলেছেন। তাঁরা বলেন যে অক্ষর রূপে অব্যক্ত ও ব্যক্ত ক্ষর শব্দে প্রতিপাদ্য। শঙ্করই উভয়বিধ রূপ। তিনি আবার এ সব থেকে পৃথক বলে তাঁকে ক্ষরক্ষারপরত্ব বলা হয়েছে। কোন আচার্য শঙ্করকে সমষ্টি ও ব্যষ্টি এবং তাদের কারণ রূপে নির্দেশ করেছেন। তাঁরা সমষ্টি রূপকে অব্যক্ত ও ব্যষ্টি রূপকে ব্যক্ত বলেছেন। এই উভয় রূপই শঙ্কর। কারণ তিনি ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন বস্তুই নেই। যোগশাস্ত্রে পণ্ডিতরা তাঁকেই এর কারণ বলে উল্লেখ করেন। কতিপয় বিদ্বান শিবকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলেছেন। ক্ষেত্র শব্দে চব্বিশ তত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে সুখদুঃখ-ভোক্তা জীবরূপী পরমাত্মা বোঝায়। বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতরা বলেন যে শঙ্করই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু দ্বারা তাদের ক্রিয়া করছেন ও মনের দ্বারা মনোবান হচ্ছেন। তিনি বুদ্ধিবলে বিচার করছেন। তিনি যখন বাহ্য ইন্দ্রিয়ে অন্বিত থাকেন, তখন তাঁকে জাগ্রত এবং যখন অন্তরিন্দ্রিয়যুক্ত ও সমস্ত তাপ বর্জিত হয়ে স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, তখন সুপ্ত। যখন তিনি বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় উভয়ের সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে সুষুপ্ত বলা হয়। মৎস্য যেমন শ্রান্ত হয়ে নদীতলে বিশ্রাম করে, শ্যেন বা গরুড় যেমন শ্রমান্বিত হয়ে পাখা বন্ধ করে পর্বত কন্দরে শয়ন করে, আত্মাও তেমনি জাগ্রত ও স্বপ্নগত ভাবে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম করেন। তারপর প্রসন্ন হয়ে পরমানন্দময় হন। অবিদ্যার জন্যই পরমাত্মার এই সমস্ত ভাব। আত্মার যদি গুণ ও ধর্ম থাকে, তবে সুষুপ্তি অবস্থায় কেমন করে তার অভাব হতে পারে! অবিদ্যার জন্যই বুদ্ধির ভ্রমণ অনুসারে আত্মাকে ভ্রমণশীল বলে মানুষ উল্লেখ করে। নিত্য সর্বগত আত্মা বুদ্ধির সন্নিহিত বলে যেদিকে বুদ্ধির গতি হয় সেই দিকে আত্মারও গতি বলে বোধ হয়। মহেশ্বরকে অনেকে বিদ্যারূপী ও অবিদ্যারূপী বলেন। আগমবিদ্ পণ্ডিতরা মানসিক চিন্তাশক্তির বলে বলে থাকেন যে ভ্রান্তি বিদ্যা ও পর অনুত্তম শিবরূপ। বহুবিধ বিষয়ে যে বিজ্ঞান তাই ভ্রান্তি, যে বুদ্ধিতে সমস্ত পদার্থকেই আত্মা বলে

জ্ঞান হয় তাই বিদ্যা এবং বিকল্পরহিত তত্ত্বই পর। শিবকে অনেকে ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞ রূপী বলেন। ব্যক্ত শব্দে তেইশ তত্ত্ব, অব্যক্ত শব্দে প্রকৃতি ও জ্ঞ শব্দে গুণভোগী পুরুষ বোঝায়। তিনি অব্যক্ত নন এবং শিব হতে ভিন্নও নন। যিনি সমস্ত গুণের হেতু, প্রকৃতির অতীত, তিনি ত্রিবিধ ও চতুর্বিধ। তিনিই সমস্ত জীবের আত্মা। তাঁর থেকেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, অথচ দৃশ্যমান নন। তিনি যোগীদের যোগী, কারণের কারণ, রুদ্রদের রুদ্র এবং দেবতাদের দেবতা। ব্রহ্মাদি দেবতারাও তাঁকে সম্যক জানেন না। তাঁকে জানতে পারলে জন্মমৃত্যুর ভয় আর থাকে না। জীবনান্তের সমস্ত দুঃখ একমাত্র তিনিই নিবারণ করতে সমর্থ।

সূর্য বলেছেন, এই জগতে বহু কাল গত হল, কেবল জন্মই হচ্ছে। তবে এ কথা নিশ্চয়ই জেনো যে শিবের প্রতি ভক্তি থাকলে এক জন্মেই মুক্তি লাভ হয়, তাঁকে স্মরণ করলেই সমস্ত ক্লেশ দূর হয় এবং জীব অনায়াসে মুক্তি লাভ করে। তাই মানুষ বিদ্যুতের ক্ষণিক জীবন লাভ করে আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য শিবের পুজা করবে। ক্ষণ ভঙ্গুর, স্ত্রীপুত্র গৃহাদি সম্পদ লাভ করে গর্বিত হয়ো না। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ত্যাগ করে অভীষ্ট ফলদাতা ঈশানের অর্চনা কর। যত দিন জরা ইন্দ্রিয়বিকলতা ও মৃত্যু না আসে, তত দিন তাঁর ভজনা কর। বিষয় মদে মত্ত হয়ে যারা তাঁর অর্চনা করে না, তারা জীবনান্তে পঙ্কে নিমগ্ন বনহস্তীর ন্যায় শোক করে। বিপদ সব সময়েই নিকটবর্তী, সম্পদ আপদের পদ, মিলনেও বিচ্ছেদ আছে, অর্থাৎ ইহজগতে সব কিছুই ভঙ্গুর—এই কথা জেনে যে শিবের অর্চনা করে সে ইহকাল ও পরকালে অক্ষয় ভোগের অধিকারী হয়। শিবের আরাধনা করে ত্বরায় তাঁর সাযুজ্য লাভ করবে। মহাপাতকীও শিবের অর্চনা করে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন একুশ পুরুষের সঙ্গে পরম স্থান লাভ করে। শত শত রাজসূয় ও সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞও শিবপূজার পুণ্যের ষোড়শাংশের সমান নয়। শিশুরা যেখানে ক্রীড়া করে, সেখানে সৈকত

বা মৃন্ময় শিবলিঙ্গ গড়ে লোকে ভূপতি হয়। যে মোক্ষার্থী, সে দেবতাদেরও আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ বিদিত হয়ে শিবের উপাসনা করবে। এই সংসার সাগর অতি ভয়ঙ্কর। এর কূল কিনারা নেই। মহা মোহ এর জল, কাম ক্রোধাদি রিপুরা কুমীর রূপে এই জলে বাস করছে। মাঝে মাঝে এতে সুখের ঢেউ ওঠে। যিনি প্রাজ্ঞ বেদান্তবিদ যোগী নির্মম নিরহঙ্কার প্রশান্ত চিত্ত দান্ত সুসংযত ধ্যাননিষ্ঠ আশাহীন নিস্পৃহ সর্বসঙ্গবর্জিত সুখদুঃখরহিত সর্বকর্মফল-ত্যাগী, যাকে দেখলে জড় অন্ধ ও বধির বলে মনে হয়, শত্রু ও মিত্রে যার তুল্য জ্ঞান এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন, এই রকম মানুষই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হতে পারে। কিন্তু শিবপূজায় নিরত ব্যক্তি যেমন অনায়াসে দুর্লভ মোক্ষ লাভ করে, যোগীও তেমন পারে না। তাই যারা পৃথিবী ও পাতালে বাস করছে, তারা মোক্ষ সাধন দুর্লভ জেনে কাম ক্রোধ বর্জিত কর্মযোগের দ্বারাই শিবের পূজা করবে। শিবের পূজা, তাঁর নাম ও মন্ত্র জপ, তাঁর উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দান ও তাঁর নাম কীর্তনই কর্মযোগ। পুরাকালে দেবী সাবিত্রী বলেছেন, শিবে চিত্ত সংসক্ত রেখে তাঁর অর্চনা করে মানুষ যে অভীষ্ট কামনা করবে, তাই পাবে। যে সতত তাঁর নামজপে নিবিষ্ট, তৎকর্ম পরায়ণ, তদ্‌গত মানস ও নিষ্কাম, সে রুদ্রপদ পায়। সর্বদা যে শিবের অর্চনা করে, এই ভূতলে সে রুদ্রতুল্য, তাঁকে দর্শন ও স্পর্শে মানুষের পাপ হরণ হয়।

সাবিত্রীর উপাখ্যান

ঋষিরা বললেন, সূত, আপনি যে সাবিত্রীর কথা বললেন, সেই পতিব্রতা বরবর্ণিনীর কথা আমাদের বলুন।

সূত বললেন, একদা দেবলোকে রমণীপ্রধান অরুন্ধতী সর্বগুণালঙ্কৃতা সুরূপা সাবিত্রীকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্বর্গবাসী দেব দেবী সিদ্ধ ও সিদ্ধার্থীরা তো অনেক দেখেছি, কিন্তু কারও স্বামী সম্মিলনে তোমার

মতো শোভা সৌন্দর্য দেখা যায় না। তোমার ও আমার পতির যেমন ভূষণ শোভা, কোন সুর ললনার তেমন নয়। তোমার কান্তি অযুত তরুণার্কের মতো দেদীপ্যমান, ইন্দ্রাদি দেবগণের কান্তিও এ রকম নয়। এ কি তোমাদের তপস্যার প্রভাব, না দানের পরিণাম, না যজ্ঞের ফল? সত্য কথা প্রকাশ কর।

সাবিত্রী বললেন, আমি পূর্বজন্মে যা করেছি তা শুনুন। স্বামীর সঙ্গে আমি ভক্তি সহকারে শিবের মন্দির মার্জনা ও গোময়ে উপলেপন করেছিলাম বলে এই রকম স্বর্গবাসী হয়েছি। তীর্থের জলে আমরা শিবের স্নান করিয়েছিলাম, তারই ফলে দেহের এই কান্তি হয়েছে। আমাদের যে এই চিত্তের প্রসাদ সৌমতা ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা—এ শিবকে ঘৃতে স্নান করাবার ফল। দধি ও দুগ্ধে স্নান করানোর ফলে এই রকম আনন্দ স্বাস্থ্য গতি ও অভীষ্ট ফল লাভ করেছি। দেহের সুগন্ধ পেয়েছি শিবকে ধূপদানের ফলে। আমরা উভয়ে বিবিধ ব্রত মন্ত্র জপ ও নৃত্যগীতে শিবকে প্রীত করেছিলাম বলেই আমাদের এই সম্পদ। আমি ও সত্যবান এই সব কাজ করেছি বলেই আমরা অক্ষয় স্বর্গভোগ করছি।

সূত বললেন, সাবিত্রীর কথা শুনে ব্রহ্মার পুত্রবধূ অরুন্ধতী শিব ও পার্বতীর উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন, যে রমণী প্রতিদিন শিবের অর্চনা করেন, তিনি সকলের পূজ্য হন এবং তিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা। শিবের অর্চনা করেই অদিতি দেবতাদের, দিতি দৈত্যদের এবং বিনতা গরুড় ও অরুণকে পেয়েছিলেন। যাঁর অর্চনা করে শচী ও উর্বশী অভীষ্ট বিষয় লাভ করেছেন, তাঁর পূজা করা কি কর্তব্য নয়! এই বলে অরুন্ধতী নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

দ্বিজগণ, সাবিত্রী বলেছেন, স্ত্রীলোকেরা শ্রদ্ধা সহকারে শিবের অর্চনা করলে তাদের সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

কুবেরের উপাখ্যান

ঋষিরা বললেন, সূত, পুরাকালে বৈশ্রবণ কী ভাবে মহেশ্বরের আরাধনা করে কুবেরত্ব লাভ করেন তা আমাদের বলুন।

সূত বললেন, শিবের মাহাত্ম্য সূচক এক ইতিবৃত্ত আমি আপনাদের বলছি, শুনুন। পুরাকালে অবন্তী নগরে সোম শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্ত্রীপুত্রের কাজেই সতত আসক্ত থাকতেন। এই ভাবে কিছুকাল অতীত হবার পর সেই লোভাক্রান্ত চিত্তের ব্রাহ্মণ ধন-লোভে একদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করে পৃথিবীর সমস্ত গ্রাম ও নগরে বিচরণ করতে লাগলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগ করবার পর তাঁর পত্নী বিশালাক্ষী কামমোহিত হয়ে যথেচ্ছাচারিণী হল এবং বিধির নির্বন্ধ-বশত এক শূদ্রের ঔরসে তার এক দুরাত্মা পুত্রের জন্ম হল। তার নাম দুঃসহ। সেই পুত্র কিছুকাল পরে মদ্যপানাদি কুক্রিয়ায় আসক্ত ও সমস্ত বন্ধুবান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে নিতান্ত কুপথগামী হল। একদিন সে তার ব্যসন ব্যয় নির্বাহের জন্য পূজার উপকরণ দ্রব্য অপহরণের উদ্দেশে রাত্রি যোগে এক শিবালয়ে প্রবেশ করে। সেই সময়ে প্রদীপে বর্তি না থাকায় তা বিগতপ্রায় হয়েছিল। দ্রব্য অনুসন্ধানের জন্য সে প্রদীপে সলিতা দান করতেই পূজক ব্রাহ্মণ জাগ্রত হয়ে 'কে কে' বলে তার দিকে ধাবিত হল। সেই মূঢ়মতি প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করল। কিন্তু সে নিজের কুৎসিত জন্ম ও কর্মের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত ছিল না। নগর রক্ষকরা তাকে ধরে বিনাশ করল।

জন্মান্তরে সে গান্ধার দেশে সুদুর্মুখ নামে রাজা হল। সেই দেহেও সে গীতবাদ্য মদ্যপান ও বেশ্যাসক্ত হল, প্রজাপীড়ক সর্বধর্মবহিষ্কৃত ও ঘোর মূর্খ হয়েছিল। কিন্তু পূর্বজন্মের কর্ম স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় সে কোন মন্ত্র না জেনেও প্রতিদিন গন্ধপুষ্প ধূপদীপ ও নৈবেদ্য দিয়ে শিবলিঙ্গের অর্চনা করত এবং শিবালয়ের দীপনিচয়ে তৈল ও বর্তি দানে তৎপর ছিল। একদিন সে মৃগয়াসক্ত হয়ে পবিত্র ঐরাবতী নদীর তীরে

পূর্বের শত্রুদের দ্বারা আহত হয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। কিন্তু শিব পূজার প্রভাবে সমস্ত পাপপুঞ্জ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিশ্রবামুনির পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে কুবের নামে বিখ্যাত মহাবলশালী ধর্মাত্মা ও অত্যন্ত সৎ স্বভাবান্বিত হলেন। তিনি সমস্ত যক্ষের অধীশ্বর হয়েছিলেন। ভাগীরথীর তীরে সকলের অভীষ্ট ফলদাতা ঈশানের অর্চনা করে তিনি স্তব পাঠ করেছিলেন, স্বর্গে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতারা যাঁর স্তব করে বিবিধ অভীপ্সিত বিষয় লাভ করেছেন, আমি তাঁকে প্রণাম করে এই স্তব করছি। তাঁর মন্ত্র জপ করে আমি তাঁর শরণাপন্ন হলাম।

এই বলে বিরত হতেই শিব প্রত্যক্ষ হয়ে কুবেরকে তিনটি বর দিলেন। তাঁকে রাজরাজ, গুহ্যকদের অধীশ্বর ও মহাযশস্বী করে কৈলাসে গেলেন। কুবের তাঁর নিকটে তাঁর সখাত্ব দিক্‌পালত্ব ও দেবতাদের ধনাধিপত্য এই সব অতিরিক্ত বর পেয়ে পরম সুখে কাল যাপন করছেন। নিশাচর দশানন নিখিল দোষের আকর ও অজিতেন্দ্রিয় হয়েও শিবের অর্চনা করে সমস্ত পাতক থেকে পরিত্রাণ পেয়ে মুক্তি লাভ করেছে।

স্বর্গে যাবার অনেক মার্গ আছে সত্য, কিন্তু সে সবই ক্লেশসাধ্য ও বিঘ্নবহুল। একমাত্র শিবকে স্মরণ করাই সরল পথ ও নিমেষমাত্রে মহাফলপ্রদ। এই জন্য সুর অসুর ও মানুষ আত্মযোগ ও যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করে শিবের পূজা করেন। দেবতারা গান করে থাকেন যে দেবত্ব লাভের পর পুনরায় যারা স্বর্গ ও অপবর্গের মার্গ ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করে, তারা ধন্য। মানুষ সেখানে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করে কর্মফল শিবে সমর্পণ করে দেহাবসানে তাঁতেই লীন হয়। জানি না কবে অশুভ কর্মক্ষয়ের পর ভারতে জন্মে শিবধর্ম পরায়ণ হব।

সূত বললেন, মহাদেবের প্রসাদে দুঃসহ নামের সেই ব্রাহ্মণীর পুত্রই পরজন্মে বিশ্রবার পুত্র হয়ে ধনাধিপত্য লাভ করেন। সূর্য বলেছেন, যে এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ উত্তীর্ণ হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস করে।

সুদেবীর উপাখ্যান

সূত বললেন, পুনরায় আমি শিবের মাহাত্ম্যের কথা কীর্তন করছি। এই কথা পাঠ বা শ্রবণ করলে সমস্ত পাপ তিরোহিত হয়ে যায়। যোগীরা জ্ঞান যোগে শিবের আরাধনা করেন। যাঁরা দান যজ্ঞ তপস্যা তীর্থস্নান ও বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা কর্মযোগে শিবের অর্চনা করেন। লুব্ধ ও ব্যসনাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরাই শিবের আরাধনায় বহির্মুখ। সেই সব মূঢ় নরকের কীট নিজেদের জরামরণ-বিহীন মনে করে নিশ্চিন্ত থাকে। যে নিজের যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য রমণীতে আসক্ত হয়, বা যে রাজা শিবভক্ত না হয়ে অন্য দেবতায় ভক্তিমান হয়, তারা সমান অবিবেকী। ছল করেও যে শিবালয়ে যৎকিঞ্চিৎ সৎ কর্ম করে, তারা পাপাত্মা হলেও নরকগামী হয় না। যারা শিবালয় মার্জনা বা সেই পথের সংস্কার করে, তারা অমরোপম মহীপাল হয়। এই বিষয়ে আপনাদের এক ইতিবৃত্ত বলছি শুনুন।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পঞ্চাল দেশে নরবর্মা নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি সমস্ত দৈবাস্ত্রে পারদর্শী উৎসাহ-শক্তিসম্পন্ন প্রতাপশালী সন্ধি প্রভৃতি ষড়্গুণবেত্তা মহাবল পরাক্রান্ত এবং সতত সহাস্য বাক্যালাপী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর দশ সহস্র পত্নীর মধ্যে সুদেবী নামে এক পরম রূপলাবণ্যবতী প্রধান মহিষী ছিলেন। সেই শচীর মতো সমস্ত সুলক্ষণসম্পন্ন চন্দ্রকান্তিসম প্রভার সাধ্বী বরবর্ণিনী রাণী সুদেবী প্রত্যহ ভূমি সম্মার্জনাদি দ্বারা শিবায়তনের দ্বার ও মার্গের শোভা বর্ধন করতেন। একদিন রাজপুরোহিত গালব মুনি নির্জনে সুদেবীকে এই কাজে রত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি জন্য তুমি অন্য কাজ পরিত্যাগ করে প্রতি দিন শিবের মন্দির সম্মার্জনা কর?

গালব মুনির এই কথার উত্তরে আয়তলোচনা সুদেবী হেসে বিনয় সহকারে বললেন, এই কাজে আমার যেমন অনুরাগ, এমন আর

কিছুতেই নয়। পূর্বে আমি যে কাজ করেছি, তা আমি আপনাকে বলছি। আমি আকাশচারী গৃধিনী পক্ষী ছিলাম। একদিন ভ্রমণ করতে করতে কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতে উপস্থিত হই। সেই পর্বত হেমকূটের মতো রমণীয় এবং সিদ্ধ ও গন্ধর্বে সমাকীর্ণ। খলিঙ্গ নামে সেখানে এক শিবলিঙ্গ আছেন। মনীষীরা তাঁকে দর্শন করে সুরপুরে গমন করে। কোন ব্যক্তি সেই লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে বিবিধ পুষ্প ধূপ ও অক্ষতে পূজা করে তাঁর পাশে নৈবেদ্য রেখে কোথায় গিয়েছিলেন। এমন সময়ে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে তা ভক্ষণ করবার জন্য লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে নৈবেদ্য খেতে উদ্যত হলাম। আমার পাখার বাতাসে শিবের সামনের ধূলিপটল অপসৃত হল। কিন্তু দৈববশত ক্ষণকালের মধ্যে পূজক সেখানে উপস্থিত হওয়ায় আমি আকাশে উড্ডীন হলাম। কালক্রমে আমার মৃত্যু হল এবং আমি বসুর গৃহে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছি। বসুরাজ আমাকে নরবর্মার জ্যেষ্ঠা পত্নীরূপে সমর্পণ করেছেন। আমার সেই পূর্বকৃত কর্মের প্রভাবেই রাজার দশ হাজার পত্নীর মধ্যে আমিই প্রধান, মান্য, প্রিয় ও পুত্র-পৌত্র সমন্বিত হয়েছি। আমি যখন অনিচ্ছায় শিবালয়ের পাংশু মার্জনা করে বসুরাজের দুহিতা ও জাতিস্মরা হয়েছি, তখন স্বেচ্ছায় এ কাজ করে না জানি কী হব!

রাণীর এই কথা শুনে গালব হৃষ্ট চিত্তে বললেন, আশ্চর্য, এই ভাবে শিবের আরাধনা করেই তুমি এই ঐশ্বর্য লাভ করেছ!

মুনিগণ, শিবলিঙ্গ দর্শন এবং তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেই জন্মান্তরে রাজা হয়। অজ্ঞানতাবশত বা ভয়ে শিবের দর্শন করলেও জাতিস্মরত্ব ঐশ্বর্য বিদ্যা জ্ঞান পুত্র-পৌত্র ও পরম সুখ লাভ হয়। যাঁর নাম মাত্রেই নরক নিবারণ হয়, স্মরণ মাত্রে দেবত্ব প্রাপ্তি ও অর্চনা করে নির্বাণ পদ লাভ করা যায়, কে না তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবে!

পার্বতীর রক্তাসুর বধ

ঋষিরা বললেন, সূত, এবারে আমরা ভগবতী পার্বতীর মাহাত্ম্য শুনতে চাই। যে ভাবে তিনি রক্তাসুর প্রভৃতি দৈত্যদের বিনাশ করেছিলেন, তা আমাদের বলুন।

সূত বললেন, আমি সেই মহাদেবীকে নমস্কার করে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করছি। জগতে তিনি একাক্ষরী, ব্রাহ্মী, দাক্ষায়ণী, উমা, হৈমবতী, দুর্গা, সতী, মাতা ও মাহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁকে সকলে আর্যা, অম্বিকা, মৃড়াণী, চণ্ডী, নারায়ণী, শিবা, মহালক্ষ্মী, জগন্মাতা, মেনকাত্মজা ও কালিকা নামেও কীর্তন করেন। ধর্ম সংস্থাপনার জন্য পার্বতী নানা রূপে অবতীর্ণ হয়ে দানবদের বিনাশ করে থাকেন।

পুরাকালে মহিষাসুরের পুত্র রক্তাসুর নামে দ্বিতীয় হিরণ্যাক্ষর মতো এক মহামায়াবী মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু অসুর ছিল। সেই অসুর ইন্দ্রাদি দেবতাদের জয় করে নিঃশঙ্ক চিত্তে ত্রিভুবনে রাজত্ব করত। ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি নামে তার তেত্রিশজন মন্ত্রী ছিল। তারা সকলেই ভীষণ স্বভাব, মদমত্ত, সিংহস্কন্ধ, মহাকায় ও মহাবল পরাক্রান্ত এবং প্রত্যেকেরই সহস্র অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল। একদিন সেই রক্তাসুর দানবকোটিতে পরিবৃত হয়ে সভায় মানুষ ও দৈত্য দানবদের বলল, তোমরা আমারই পূজা ও স্তুতি কর। আজ থেকে যে দেবতার অর্চনা করবে, সে আমার বধ্য হবে। দেবর্ষিগণ, তোমরা নির্দিষ্ট দান যজ্ঞ ও উপবাস প্রভৃতি কাজ ত্যাগ করে প্রত্যক্ষ সুখকর যথেচ্ছভাবে সুরাঙ্গনা উপভোগ করে সুখে কাল হরণ কর।

দৈত্যেন্দ্রের এই কথায় সমস্ত যজ্ঞাদি কাজ, বেদাধ্যয়ন, দেবপূজা ও উৎসব এ সমস্তই বিনষ্ট হল এবং সমস্ত জগৎ অসুর ভাবাপন্ন হয়ে উঠল। সবাই ধর্মহীন হওয়ায় তারা ম্লেচ্ছ বলে প্রতীয়মান হল। এই ভাবে ধর্ম লোপের জন্য ক্রমে দেবরাজের বলহানি হল। তারপর দানবরা ইন্দ্রকে হীনবল জেনে তাঁকে আক্রমণের জন্য ধাবিত হল। অসুরদের

বিক্রমে অভিভূত হয়ে তিনি স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করে বৃহস্পতির নিকটে গিয়ে বললেন, রক্তাসুরের আদেশে কোটি কোটি দৈত্য আমাকে বিনাশের জন্য সর্বত্র উৎপীড়ন করছে। অসুরদের আক্রমণে আমি এখানে থাকতেও পারছি না এবং অন্যত্র যেতেও সমর্থ হচ্ছি না। এর জন্য আমি সম্যকরূপে সংগ্রাম করতে চাই, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। বিধাতা যতক্ষণ না ললাটলিপি প্রমার্জন করেন, তত দিনই মুমূর্ষু বা যুদ্ধমান ব্যক্তির জীবন। আপনি আমার জয় প্রার্থনা করুন, আমি অরাতিদের সঙ্গে সংগ্রাম করব। কারণ মুহূর্ত কালও প্রজ্বলিত হওয়া ভাল, কিন্তু চিরদিন ধূমায়িত থাকা শ্রেয় নয়।—

মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতং চিরম্।

আততায়ী শত্রুদের প্রতিবিধানে অক্ষম হয়ে যে নিজেকে জীবিত মনে করে, তার জীবনে ধিক্। ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহে কর্মায়ত্ত, কিন্তু পৌরুষ আমার অধীন। এইজন্য আমি যুদ্ধ করবই করব এবং নিশ্চয়ই আমার মঙ্গল হবে।

দেবরাজের এই কথা শুনে বৃহস্পতি বললেন, এ তোমার সংগ্রামের সময় নয়। অতএব ক্রুদ্ধ হলে কী হবে। তুমি খেদ কোরো না, কার্যের গতি এই রকম। দৈববশতই জীবের সম্পদ ও বিপদ উপস্থিত হয়। সন্ধি প্রভৃতি ষড়্‌গুণবেত্তা পুরুষ স্বীয় ও পরকীয় শক্তি দেশ কাল ও উপায় নির্ণয় করে সমরে প্রবৃত্ত হয়। এ সব বিচার না করে কাজ করলে তা দোষ উৎপাদন করে। রাজা শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যক অবগত থাকলেই যুদ্ধে জয়লাভ, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের পরিত্রাণ ও শত্রুদের নিগ্রহ করতে পারেন। অন্যথায় নিজেই বিনষ্ট হন। যে রাজা কাউকে বিশ্বাস না করে সকলকেই বিশ্বস্ত করতে পারেন এবং ছিদ্রান্বেষণ করে শত্রুকে আক্রমণ করেন, তিনিই বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে থাকেন। সম্প্রতি তোমার শত্রু বদ্ধমূল, কিন্তু তুমি দৈবহীন। সুতরাং এ সময়ে যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য নয়।

বৃহস্পতির কথার পর পুরন্দর পুনরায় বললেন, গুরু, দৈত্যদের

নিকটে পরাভূত হয়ে জীবন ধারণ করতে আমি চাই না। যে শত্রুদের অনুগ্রহভাজন, কিংবা মূর্খ স্ত্রীজিত ব্যাধিগ্রস্ত বা দরিদ্র. তার মৃত্যুই শ্রেয়, তার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। এ বিষয়ে আমি আর অধিক কী বলব, আমি নিশ্চয়ই দানবদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হব। আপনি স্থির জানবেন, কার্যারম্ভ কালে মানুষের দৃঢ় সংকল্পই শ্রেয়োজনক, যে দোষ গুণ উভয়কেই সমান জ্ঞান করে কাজ আরম্ভ করে, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তির কোন অকুশল ঘটে না। যতকাল ভয়ের কারণ উপস্থিত না হয়, ততকালই ভীত হওয়া উচিত। কিন্তু ভয়ের কারণ এসে উপস্থিত হলে তার সঙ্গে নিঃশঙ্ক চিত্তে যুদ্ধ করা কর্তব্য। মানুষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে জীবিতই থাক বা মৃত্যুমুখেই পতিত হোক, এ দুই-ই তার পরম মঙ্গল। তাই আমি শত্রুর সঙ্গে অবশ্যই যুদ্ধ করব।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি যখন এই ভাবে কথাবার্তা বলছিলেন, তখন ব্রহ্মা এসে বললেন, ইন্দ্র, বিষণ্ণ হয়ো না, পার্বতীর শরণাপন্ন হও। সংগ্রামে যিনি মহিষ রুরু ও চিত্র নামে .অসুরদের বিনাশ করেছিলেন, তিনিই অবিলম্বে রক্তাসুরকেও বধ করে স্বর্গরাজ্য তোমাকে প্রদান করবেন।

ইন্দ্রকে এই কথা বলে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। দেবরাজও সুস্থ ও নির্ভয় হয়ে দেবতাদের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়ে শঙ্করপ্রিয়া সর্বাণীকে স্তব করতে লাগলেন, দেবী মহামায়া, দেবতাদের আরাধ্যা, অক্ষরা অব্যক্তা অনন্তা ও নিরাময়া, তোমার জয় হোক। তুমি ত্রিগুণময়ী আদ্যাশক্তি, তোমার জয় হোক! আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি, তুমি আমাদের রক্ষা কর।

সূত বললেন, দেবরাজ ভগবতী পার্বতীকে এইভাবে স্তব করলে তিনি তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা তাঁকে নমস্কার করে বললেন, দেবী, রক্তাসুরকে বধ করে মহৎ ভয় থেকে আমাদের পরিত্রাণ করুন।

দেবতাদের এই কথা শুনে ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা পার্বতী তাঁদের অভয় দিয়ে অদ্ভুত রূপ ধারণ করলেন। সকলে দেখলেন যে মহাদেবী সিংহের

উপরে আরূঢ় হয়ে তাঁর বিশ হাতে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করলেন। তারপর অট্টহাস্যের সঙ্গে মুহুর্মুহু সিংহনাদ করতে থাকলে সেই ঘোরতর শব্দে বিশ্বমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল এবং পৃথিবী ভয়াতুরা প্রমোদার মতো কম্পিত হতে লাগল। এই কথা সম্যক পরিজ্ঞাত হয়ে কালান্তক যম সদৃশ অসুররা চতুরঙ্গ বল নিয়ে উপস্থিত হল। পাতালে যে সব রাক্ষস ও দৈত্য ছিল, তারাও এসে দৈত্যেন্দ্র রক্তাসুরের সঙ্গে যোগ দিল। তারা বিবিধ আয়ুধে সজ্জিত হয়ে ধ্বজা পতাকা উড্ডীন করল। তাদের দেহপ্রভা তমাল ও অলিকুলের মতো কৃষ্ণবর্ণ এবং নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। তাদের ভাব দেখে মনে হল যে তারা যুগ পরিবর্তনে প্রবৃত্ত হয়েছে। মাতঙ্গের গলঘণ্টারবে, অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে, বীরের সিংহনাদে, শস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শব্দে এবং রথচক্রের নিনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হতে লাগল।

দেবী পার্বতীকে দেখে দানবরা আনন্দে পটহ ভেরী ঝর্ঝরিণী শঙ্খ ডমরু ও ডিণ্ডিমাদি বাদ্য রাজাতে লাগল। কেউ অশ্বে, কেউ মাতঙ্গে, কেউ বা বিচিত্র যানে আরোহণ করে পরম শোভা ধারণ করল। তারা এইভাবে দলবদ্ধ হয়ে এককালে সুতীক্ষ্ণ বাণে পার্বতীকে বিদ্ধ করতে লাগল। তারা কুঠার চক্র মুষল অঙ্কুশ লাঙ্গল পাশ তোমর শূল দণ্ড পট্টিশ মুদ্গর পরিঘ প্রাণ শক্তি ঋষ্টি শতঘ্নী ৰাপি উপল আয়োগুড় ভূশুণ্ডী কুম্ভ ও গদা প্রভৃতি আয়ুধ নিয়ে ভগবতীকে আচ্ছাদন করে সিংহনাদ করতে লাগল। আহত হয়ে পার্বতী সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রোধে প্রজ্বলিত হলেন এবং অসুরদের সমস্ত অস্ত্র গ্রাস করে ফেললেন। তারপর তিনি দানবদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কাল পূর্ণ হলে শলভরা যেমন আগুনের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি দানবরাও মরবার জন্য পার্বতীর দিকে ধাবিত হল। পর্বত যেভাবে প্রচণ্ড প্রভঞ্জন বেগ ধারণ করে, সেই ভাবেই তিনি একাকী আততায়ী দানবদের বেগ ধারণ করলেন। পার্বতীর শস্ত্র প্রহারে দৈত্যরা ছিন্নভিন্ন হয়ে ভূমিতে শয়ন করতে লাগল। তাদের মনে হল যেন মৃত্যুর দেবী তাদের জীবন

আকর্ষণের জন্য রসনা বিস্তার করেছেন। রক্তের নদী বয়ে গেল। সেই নদীতে অশ্ব মৎস্যের, হস্তী কুম্ভীরাদি জলজন্তুর, চর্মফলক কূর্মের, রথ আবর্তের এবং ছত্র পতাকা ফেনপুঞ্জের আকার ধারণ করল। ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত অসুর সৈন্য দেবীর শস্ত্রাঘাতে ক্ষত কঙ্কর হয়ে রুধির বর্ষণ করে ঘূর্ণ্যমাণ অর্ণবের মতো প্রতীয়মান হল।

নিজের সৈন্যদের হন্যমান ও দেবীর বিক্রম দেখে রক্তাসুর বিস্ময়ান্বিত হয়ে সেনাপতিদের বলল, অশ্বারোহী গজারোহী ও রথীরা কালসমা ভবানীকে বেষ্টন করে ত্বরায় বিনাশ কর। দৈত্যরাজের এই আদেশ পেয়ে ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি মহাবীর ষোলজন সেনাপতি জীবনের আশা পরিত্যাগ করে দেবীকে আক্রমণ করল। দেবী রুদ্রাণী যেন নৃত্য করতে করতে কাউকে পট্টিশের আঘাতে কাউকে বা মুষলের অভিঘাতে ধরাশায়ী করতে লাগলেন। অর্ধচন্দ্র বাণে কালপাশের মাথা কাটলেন, গদাঘাতে বেদান্তকের হনু চূর্ণ করলেন এবং অসি দিয়ে মাথা কাটলেন ব্রহ্মঘ্নের। তারপর ধূম্রাক্ষকে কালদণ্ড প্রহারে, ক্রূরকে বজ্র প্রহারে, ত্রিশূলের আঘাতে যজ্ঞদংষ্ট্র যজ্ঞকোপ ও বিধর্ম প্রভৃতিকে অন্তক দেবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়ে চক্র প্রহারে শঙ্কু কর্ণ দুর্ভিক্ষ বিদ্যুন্মালী ও বিভাবসুকে মস্তকহীন করলেন। এইসব দেখে কুষ্মাণ্ড ও শুভকাঙ্ক্ষ নামে রক্তাসুরের দুই ভীমকায় ও ভীমকর্মা অনুজ মুষল ও অশ্ম প্রহারে দেবীকে আহত করলে তিনি তাদের শরনিক্ষেপে সংহার করলেন। তাদের নিহত হতে দেখে স্ত্রীঘ্ন এগিয়ে এলে দেবী খড়্গের আঘাতে তার প্রাণ বিনাশ করলেন। তারপর ঘণ্টক লোহার পরিঘ দিয়ে দেবীকে প্রহার করল। দেবীর চপেটাঘাতে আহত হয়ে সে ভূতলে পতিত হল। প্রাপঞ্চিক তার শরাসন আকর্ষণ করতেই পার্বতীর শক্তি প্রহারে যমালয় গেল। এই ভাবে দেবী আঠারোজন দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে বিনাশ করলেন। তিনি আটান্নজন প্রধান অসুর ও তেত্রিশ সহস্র অক্ষৌহিণী সৈন্য সংহার করলেন। একত্রিশ হাজার আটশো সত্তরজন আরোহী সহ রথ, দ্বিগুণ ত্রিগুণ ও পাঁচ গুণ গজ অশ্ব ও পদাতি নিহত হল।

দেবীকে নৃত্য করতে দেখে হয়গ্রীব প্রভৃতি অবশিষ্ট দশজন অসুর রক্তাসুরকে নমস্কার করে তাঁকে আঘাত করতেই তিনি দিব্যাস্ত্রে তাদের ভস্মসাৎ করলেন এবং রক্তাসুরের নিকটে গিয়ে বললেন, দেবতাদের দুঃখ দিয়ে তুমি জীবন নিয়ে কোথায় যাবে? বলে তার হৃদয়ে শূল বিদ্ধ করলেন। শূলাহত রক্তাসুর ভীষণ মূর্তি ধারণ করল। কিন্তু দেবী অম্বিকা নানারূপধারী অসুরকে যুদ্ধে নিহত করলেন। তাকে এইভাবে গতাসু হয়ে পতিত হতে দেখে দৈত্যরা হাহাকার করতে করতে চতুর্দিকে পলায়ন করতে লাগল। কেউ অস্ত্র ত্যাগ করে বেঁচে গেল, কেউ সমুদ্রে বা পর্বতগুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। কেউ মস্তক মুণ্ডন করে অরণ্যে বাস করতে লাগল, কেউ অমূলক ব্রত গ্রহণ করে দয়াধর্ম প্রকাশ করতে লাগল। কেউ বা পাষণ্ডব্রত অবলম্বন করল। তারা হেতুবাদে নিপুণ, সৌচবিহীন, মূঢ় এবং অসুরদের ক্ষপণ বা ত্যাগকারী বলে ক্ষপণক নামে প্রসিদ্ধ হল। কেউ বা শিবশাস্ত্র বহির্ভূত অর্হৎ নামে বিখ্যাত হল। এই পাষণ্ডরা মন্ত্রৌষধ প্রয়োগ করে জনগণকে বঞ্চনা করে। এই দৈত্যরা ঘোর কলিযুগে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কুযুক্তি দিয়ে শিবোক্ত কর্মযোগের দ্বেষ করবে। দেবী পরমেশ্বরী এইভাবে শত্রু দলন করে ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করলেন। ইন্দ্র দেবতাদের সঙ্গে ভগবতীকে প্রণাম করে অমরাবতী পুরীতে গেলেন।

পার্বতীর প্রভাব

সূত বললেন, দেবরাজ একদিন তেত্রিশ কোটি দেবতা পরিবৃত হয়ে আছেন এবং অপ্সরা গন্ধর্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর ও উরগরা তাঁর গুণগান করছেন। এমন সময়ে বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিরা তাঁকে ত্রৈলোক্য রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং তিনি পুনরায় নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করতে লাগলেন। তিনি আবার রাজ্য ফিরে পেয়েছেন জেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অঙ্গিরা প্রমুখ সমস্ত ঋষিরা এসে উপস্থিত হলেন। সকলেরই মাথায় জটা, সর্বাঙ্গ ভস্মে ভূষিত এবং স্কন্ধে কৃষ্ণাজিনের

উত্তরীয়। সেই সব বেদবেদাঙ্গপারগ মহাত্মাদের দেখে রুদ্রমূর্তি বলে বোধ হয়। ইন্দ্র সেই ব্রহ্মকল্প ঋষিদের যথাবিধি অর্চনা করে আসনে উপবেশন করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, যাঁর প্রসাদে আমি পুনরায় স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়েছি, সেই ভবানীর আরাধনা কীভাবে করতে হয় তা বলুন।

ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ঋষিরা মনে মনে শিবরূপিণী সর্বাণীকে নমস্কার করে বললেন, যারা প্রতিদিন ভক্তি সহকারে পার্বতীর অর্চনা করে, তারা ধন্য। কৃতার্থ ও প্রকৃত সাধু। সূর্যের কিরণ যেমন জালবদ্ধ হয় না, তেমনি চণ্ডিকায় চিত্ত সমর্পণ করে কর্মের অনুষ্ঠান করলে পাতকও জড়ীভূত হয় না। যে সব বিষয়ান্ধ মানুষের গৃহে পার্বতীর পূজা হয় না, তাদের বৎসর মাস ও দিন বিফল। পার্বতীর স্তুতি করে যে গতি লাভ হয়, তপস্যা তীর্থসেবা দান ও দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞেও তেমন গতি হয় না। ব্রত উপবাস ও পূজা করে তাঁর আরাধনা করলে তিনি সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন।

সর্বফলপ্রদ উল্কা নবমী ব্রতের কথা শোন। ঐ নবমীতে তিনি সমরে মহাসুরদের সংহার করেন বলে তাঁর প্রিয় হয়েছে। আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমীতে স্নান করে মহিষমর্দিনী ভগবতীর অর্চনা করে স্তব পাঠান্তে প্রার্থনা করবে, আমাকে অভীষ্ট বস্তু আরোগ্য ও বিজয় দান কর। যাবতীয় ভয় থেকে আমাকে সতত রক্ষা কর। তোমাকে নমস্কার। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই বলে নয়টি, সাতটি বা একটি সবর্ণা কুমারীর পূজা করবে। এইভাবে এক বৎসর প্রতি মাসে দেবীর আরাধনা করে কুমারীদের ভোজন করিয়ে বস্ত্রালঙ্কার দেবে এবং বিসর্জনের পর ব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গমণ্ডিত গো দান করবে। পুরুষেরা এই ব্রত করে তেজস্বী হয় এবং রমণীরা সপত্নীদের মধ্যে স্বীয় তেজে উল্কার মতো দেদীপ্যমান হয়। এখন এই তিথি মহানবমী নামে বিখ্যাত হয়েছে।

মহাত্মা কপিল মেরু পর্বতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে ত্রিজগজ্জননী পার্বতীর যে অন্যবিধ আরাধনার কথা বলেছিলেন, তার কিয়দংশ

বলছি, সুস্থ চিত্তে শোন। পার্বতী ভক্তদের কামধেনু, সুকৃতার্থীদের কল্পপাদপ, ধনাভিলাষীদের চিন্তামণি। তাকে স্মরণ করলে রাজভয় চৌরভয় অগ্নিভয় ও ব্যাঘ্র সর্পাদি সমস্ত শত্রুভয় দূর হয়ে যায়। এমন কি চরণে নিগড়বদ্ধ হয়েও তাঁকে স্মরণ করলে মুক্তিলাভ হয়। পার্বতী প্রসন্ন হলে প্রতিকূল দৈবও বলপ্রয়োগে সমর্থ হয় না, যেমন বর্ষাকাল সমাগত হলে প্রখর গ্রীষ্মের তাপেও বনরাজি নবপল্লবে শোভিত হয়।

সূত বললেন, ইন্দ্র ঋষিদের নিকটে ভবানীর এই রকম কল্যাণময় চরিত শোনার পর ভক্তিসহকারে তাঁর আরাধনা করে নিষ্কণ্টকে রাজ্য-ভোগ করতে লাগলেন।

তিথি নির্ণয়

ঋষিরা বললেন, এইবারে আমাদের নিকটে তিথি বিবেক ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রকাশ করুন।

সূত বললেন, কোন্ তিথিতে কোন্ কার্য কর্তব্য তা বলছি, শুনুন। তিথি নির্ণয় না হলে কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি বা স্মৃতির যে কোন ব্রত ও দান এবং বেদের যাবতীয় কর্ম তিথি নির্ণয় করে করতে হয়। দেবতার প্রীতির জন্য তিথির শেষ ভাগে উপবাস করা বিধেয় এবং পিতৃগণের সন্তোষের জন্য তিথির প্রথম ভাগেই উপবাস করবে। যে তিথিতে সূর্য অস্তমিত হন, তা ত্রিমুহূর্তব্যাপী হলে সমস্ত ধর্মকাজেই তাকে সম্পূর্ণ বলা হয়। কৃষ্ণপক্ষে তিথির পূর্বভাগ ও শুক্লপক্ষে উত্তর ভাগ গ্রাহ্য। কিন্তু তিথি ত্রিমুহূর্তব্যাপী হলে ক্ষয়বৃদ্ধির কারণ জানবে। ব্রত পরায়ণ ব্যক্তি চন্দ্রসূর্যের উদয় দ্বারা এইভাবে তিথি নির্ণয় করে একাদশী ষষ্ঠী ও তৃতীয়াতে উপবাস করবে। পঞ্চমীবিদ্ধ ষষ্ঠী, দশমীবিদ্ধ একাদশী ও ষষ্ঠীবিদ্ধ সপ্তমীতে কদাপি উপবাস করবে না। দশমীবিদ্ধ একাদশী বিহিত ফল নষ্ট করে এবং দ্বাদশী উল্লঙ্ঘন করে ত্রয়োদশীতে পারণ করলেও উপবাসের ফল বিনষ্ট হয়। যদি পারণের দিন কলামাত্র দ্বাদশী না পাওয়া যায়, তবে দশমীবিদ্ধ একাদশীতে উপবাস হবে।

শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষে যদি একাদশী উভয়দিন ব্যাপী হয়, তবে যতিরা পূর্ব দিনে ও গৃহীরা পরদিন উপবাস করবে। যে নক্ষত্রে সূর্য অস্তমিত হয়, কিংবা প্রদোষ কালে চন্দ্রের সঙ্গে যার যোগ হয়, তাতেই উপবাস বিধেয়। সূর্য ও চন্দ্র যতক্ষণ রাহুগ্রস্ত থাকেন, ততক্ষণ শয়ন ও ভোজন করবে না এবং জপ করবে। সূর্য বা চন্দ্রকে মুক্ত দেখে স্নানান্তে ভোজন করবে। অশৌচ হলেও ব্রতী উপবাস ত্যাগ করবে না। দীক্ষান্বিত ব্যক্তি সর্বদা দেবার্চনা করতে পারবে, অশৌচ কোন প্রতিবন্ধক হয় না। শিবপূজক সাগ্নিক ব্রহ্মচারী বা যতির শরীরে কোন অশৌচ থাকে না।

প্রায়শ্চিত্ত বিধি

সূত বললেন, এই বারে প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে বলছি, শুনুন। প্রকট ও গুপ্ত—পাপ এই দুই রকম। প্রকাশ্য কার্যে যে পাপ হয় তা প্রকট এবং গুপ্ত কাজে গুপ্ত পাপ হয়। যাঁরা বেদ ও ধর্মশাস্ত্র পারগ, কাম ক্রোধ ও হিংসা লোভ বর্জিত, শান্ত স্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়, এই রকম একুশ, সাত, পাঁচ বা তিন ব্যক্তি যা বলবেন তাই ধর্ম—বেদে এই কথা আছে। ব্রহ্ম হত্যাকারী, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীতে উপগত ব্যক্তি, সুবর্ণ চোর ও তাদের সঙ্গে সংসর্গী—এই পাঁচজন মহা পাতক। যে এদের একজনের সঙ্গে এক বৎসর সজ্ঞানে এক শয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, এক যানে আরোহণ প্রভৃতি সহবাস করে, সেও পতিত হয়। ব্রহ্ম হত্যাকারী বারো বৎসর সংযত হয়ে বনে বাস করবে এবং সকলের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে একবার মাত্র ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবে।

বারো বৎসর অতীত হলে তার ব্রহ্ম হত্যার পাপ বিনষ্ট হবে। কিন্তু সজ্ঞানে ব্রহ্ম হত্যার পাপের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ, উচ্চস্থান থেকে পতন, অনশনে প্রাণ ত্যাগ অথবা ব্রাহ্মণ বা গুরুর জন্য জীবন বিসর্জন দিলে সেই পাপ তিরোহিত হয়। কিংবা বারানসীতে গিয়ে কালে সেখানে প্রাণ ত্যাগ করতে পারলেও সমস্ত

পাপমুক্ত হয়ে শিবপদ লাভ হয়। মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ সন্তপ্ত অগ্নিবর্ণ সুরা বা জল কিংবা সেই রকম গোমূত্র বা ঘৃত পান করে জীবন ত্যাগ করতে পারলেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তেও সেই পাপ বিনষ্ট হয়। যে সুবর্ণ হরণ করে, সে যদি রাজার নিকটে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে বলে, আমাকে বধ করুন এবং রাজা তাকে মুষলের আঘাতে বধ করেন, অথবা কোন ক্লেশসাধ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তবেই সে সেই পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। গুরুপত্নী গমনের পাপ লোহায় তপ্ত স্ত্রী আলিঙ্গন করে জীবন বিসর্জন দিতে পারলেই নষ্ট হয়। যে পাতকীর সঙ্গে সংসর্গ করে মানুষ পাপী হয়, তাকে পাপমুক্ত হবার জন্য সেই পাতকীর জন্য বিহিত প্রায়শ্চিত্তেরই অনুষ্ঠান করতে হয়।

স্বয়ং সূর্য বলেছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নানে সব রকম পাপ তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়। মাসী পিসী ও মামী গমনের পাপ করলে কৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করবে। অথবা সেই পাপ শান্তির জন্য চান্দ্রায়ণ কর্তব্য। ভ্রাতৃ-বধূ ও ভাগিনেয়ী গমন করলে চার বা পাঁচটি চান্দ্রায়ণ করতে হয়। মাতুলকন্যা কিংবা বন্ধুর স্ত্রীতে উপগত হলে অহোরাত্র উপবাস করে তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত করবে। রজস্বলা গমনে ত্রিরাত্র উপবাসই প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের পত্নী গমন করলে প্রাজাপত্য ব্রত করবে। কন্যা গমনে চান্দ্রায়ণ কর্তব্য। জলে রেত পাত করলে সান্তপন ব্রত করবে। বেশ্যায় উপগত হলে ব্রাহ্মণকে প্রাজাপত্য ব্রত করতে হয়। মহর্ষিরা ধর্মশাস্ত্রে ঐ সব পাপীদের জন্য অন্য কোন নিস্তারের উপায় দেখেন নি। যে এক বৎসর বেশ্যা গমন করে, তার গুরুপত্নী গমনের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য। কিন্তু যদি সেই বেশ্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, তাহলে তার আর নিষ্কৃতি নেই। শূদ্রা যদি ব্রাহ্মণের বিবাহিতা হয়, তাহলে তাতে গমন ও সন্তান উৎপাদনে কোন দোষ নেই। বিধবায় উপগত হলে সান্তপন ব্রত কর্তব্য এবং এক বৎসর গমনে গুর্বঙ্গনা গমনের পাতকী হয়। নটী রজকী বেণুজীবিনী বা চর্মজীবিনী গমন করলে চান্দ্রায়ণ করবে।

দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বধে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত এবং অদীক্ষিত ক্ষত্রিয় বধে ছয় বৎসর ব্রত করা কর্তব্য। সজ্ঞানে বৈশ্য হত্যা করলে তিন বৎসর ব্রত করবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হত্যা করলে অষ্টবর্ষ সাধ্য, ক্ষত্রিয়া-বধ করলে ছয় বর্ষ সাধ্য, বৈশ্যা বধ করলে তিন বর্ষ সাধ্য এবং শূদ্রা বধ করলে এক বর্ষ সাধ্য ব্রত করবে। অজ্ঞানত বেশ্যা বধ করলে কিঞ্চিৎ দানই প্রায়শ্চিত্ত। মর্কট নকুল কাক বরাহ মূষিক মার্জার ভেক কুকুর কুক্কুট ও গর্দভ বধে প্রাজাপত্য-পাদ এবং অশ্ব বধে সম্পূর্ণ প্রাজাপত্য, হস্তী বধে তপ্ত কৃচ্ছ্র ও গো বধে পবাক ব্রত নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক গো বধ করলে মনীষীরা তার শুদ্ধির উপায় দেখতে পান না। ভক্ষ্য ভোজ্য যান আসন শয্যা এবং ফল মূল পুষ্প অপহরণ করলে পঞ্চগব্য পান প্রায়শ্চিত্ত। তৃণ কাষ্ঠ বৃক্ষ চিপিটক গুড় চর্ম তৈল ও আমিষ অপহরণ করলে তিন রাত্রি উপবাস করবে। হংস কারণ্ডব চক্রবাক টিট্টিভ শুক সারস উলূক কপোত চাষ শিশুমার বলাকা ও বক ভক্ষণ করলে দ্বিজদের বারো দিন উপবাস বিধেয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ মদ্যপান করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করবে। রেত বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য ব্রত। দ্বিজরা বিড় বরাহ গর্দভ উট শৃগাল বানর ও কাক ভক্ষণ করলে চান্দ্রায়ণ করবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজনে কৃচ্ছ্রব্রত, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজনে তপ্ত-কৃচ্ছ্রব্রত, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজনে অতিকৃচ্ছ্রব্রত এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজনে চান্দ্রায়ণ করে শুদ্ধ হবে। সুরাভাণ্ডে জলপান করলেও ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ কর্তব্য। অজ্ঞানত মহাপাতকী বেদবিক্রয়ী রজস্বলা ও চণ্ডালী স্পর্শ করে ভোজন করলে তিন রাত্রি অনাহারে পঞ্চগব্য পান করে শুদ্ধ হয়।

এই সব পাপের চেয়েও দেবনিন্দার পাপ গুরুতর। মোহবশেও দেবতার নিন্দা করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করতে হয়। শিবের নিন্দায় যে পাপ তার নিস্তার নেই। গুরুকৃপা করে তিনটি চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করতে পারেন। গুরুর নিন্দা শ্রবণ করলেও তিনটি চান্দ্রায়ণ কর্তব্য। বাক-

দত্ত বস্তু দান না করলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়, শত শত গ্রাম দান করলেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। শিবের বা গুরুর দ্রব্য অপহরণে কিংবা শিব গুরু পার্বতী বিষ্ণু কার্তিক গণেশ ও যোগীদের নিন্দায় ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়। এই জন্য সূর্য বলেছেন, নিত্য ধাম প্রার্থনীয় হলে মন শরীর ও বাক্যে এঁদের নিন্দা যেন প্রকাশ করা না হয়। যত প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হল, অনুতাপ ছাড়া কোন প্রায়শ্চিত্তেই পাপ দূর হয় না। প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় সেই কাজে আসক্ত হলে তার প্রায়শ্চিত্ত করা না করা দুই-ই সমান। মুহূর্তকাল শিবের চিন্তা করলে স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয় পাতকই বিনষ্ট হয়।

যে কোন পাপ নাশের জন্য এক অনায়াসসাধ্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছি। জলে নিমগ্ন হয়ে একাগ্র চিত্তে প্রসন্ন হৃদয়ে শিবের ধ্যান করে আট বার হর নাম জপ করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কার্তিক মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে যে শিবের অর্চনা করে অথর্ববেদের সার স্বরূপ হর নাম জপ করে, তার ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়। কার্তিক মাসেরই শুক্লা নবমীতে শিবের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ দান করলে মানুষ সমস্ত পাপমুক্ত হয়। পূর্ণিমা অমাবস্যা ও চন্দ্র সূর্য গ্রহণের কালে পঞ্চামৃত দিয়ে শিবলিঙ্গের স্নান করিয়ে যথাবিধি পূজা করলেও সব পাপ তিরোহিত হয়। শনিবার যুক্ত শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে উপবাস করে শিবের অর্চনা করলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় শিব বা শিবযোগীর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ দান করলে সমস্ত পাপমুক্ত হয়ে মানুষ পরম গতি লাভ করে। সর্বজননিন্দিত মহাপাতকীও শিবের শরণাপন্ন হলে সমস্ত পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

হর পার্বতীর বিবাহ

ঋষিরা বললেন, সূত, আমরা শিবজ্ঞান, বর্ণাশ্রম ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধি শুনেছি। এবারে পার্বতীপতির বিবাহের কথা শুনতে চাই।

সূত বললেন, পুরাকালে মনুর প্রশ্নের উত্তরে সূর্য যা বলেছিলেন, আমি আপনাদের তাই বলছি। মনু বলেছিলেন, বেদে এই কথা আছে যে আপনি ছাড়া আর কেউ পার্বতীপতির মাহাত্ম্য সম্যক পরিজ্ঞাত নন। কারণ আপনিই শিবের দ্বিতীয় মূর্তি স্বরূপ, তাই তাঁর প্রকৃত মহিমা জানেন। আমি আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি, শিবের বিবাহের বিষয় আপনি আমাকে বলুন। হিমালয়ের কন্যা কালী কী ভাবে পুনরায় গৌরী হয়েছিলেন, সেই কথা বলুন।

সূর্য বললেন, তুমি যা জানতে চাইছ তা বলছি শোন। আমি সনাতন পরম ব্রহ্ম স্বরূপ ঈশানকে প্রণাম করে তাঁর শরণাপন্ন হচ্ছি। তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি দেহীদের মুক্তি বিধান করেন।

সূত বললেন, তারপর তিনি যা বলেছিলেন তা আপনাদের বলছি। দক্ষের কন্যা সতী দেহত্যাগ করে কালী নামে হিমালয়ের কন্যা হন। তিনি শিবকে স্বামী রূপে পাবার বাসনায় পিতামাতার অনুমতি নিয়ে তপস্যার জন্য একদিন পর্বতের কোন নির্জন প্রদেশে গেলেন। এদিকে ঐ সময়েই দেবতাদের মৃত্যু স্বরূপ লোককণ্টক তারকাসুর দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করে তপস্যায় ব্রহ্মার আরাধনা করে অভীষ্ট বর লাভ করে। তারপর সেই মহাবলশালী তারকাসুরের ভয়ে ভীত হয়ে দেবতারা পলায়ন করলে সে দেবাঙ্গনাদের সবলে হরণ করল। ইন্দ্রাদি দেবতারা দুঃখানলে দগ্ধ হয়ে ত্রিদশনাথ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের সমাগত দেখে ব্রহ্মা বললেন, তোমরা কী জন্য ভীত হয়ে আমার নিকটে এসেছ তা খুলে বল। আমি তোমাদের নিস্তারের উপায় বলছি।

দেবতারা বললেন, আমরা তারকাসুরের ভয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। মৃত্যুকে সবাই যেমন ভয় পায়, আমরা তার ভয়ে সেই রকম

ভীত হয়েছি। আমাদের রক্ষা করুন। আমরা ক্ষণকালও সুখী নই। হরির সঙ্গে তারকাসুরের ত্রিশ হাজার বৎসর দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে তুমুল সংগ্রাম হয়েছিল। তবু তাকে জয় করতে না পেরে অবধ্য বিবেচনা করে ভ্রান্ত চিত্তে দেবদেব চক্রপাণি তাকে পরিত্যাগ করে মহোদধিতে ত্বরায় গমন করেছেন। আর আমরা সভয়ে আপনার শরণাগত হয়েছি। আপনি আমাদের তারকাসুরের হাত থেকে পরিত্রাণ করে সুখী করুন।

ব্রহ্মা বললেন, তোমরা আমার কথা শোন। এ তোমাদের পরম সুখপ্রদ হবে। তোমরা যে মদোদ্ধত তারকাসুরের কথা বললে, সে একসময়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলে তার তপস্যায় চরাচর ক্লিষ্ট দেখে আমি বরদানের জন্য তার নিকটে গিয়ে বলেছিলাম, বৎস, বর নাও। তাতে দৈত্যরাজ তারক আমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলেছিল, আমি যাতে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের অবধ্য হই, সেই বর আমাকে দিন। তথাস্তু বলে তাকে সেই বর দিয়ে আমি তোমাদের হিতের জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কার বধ্য হতে চাও বল। তারক বলল, এই যে দেবাধিদেবেশ নীললোহিত কপর্দী, বিষ্ণুসহ দেবতারা এঁর শুক্র পান করে গর্ভধারণ করলে সেই গর্ভোৎপন্ন পুরুষের হাতে আমার মৃত্যু হোক, অন্য কারও হাতে মৃত্যু আমার অভিপ্রেত নয়। এতেও তথাস্তু বলে আমি সুমেরু শিখরে ফিরে এসেছিলাম। অতএব তোমরা শিবের শরণাগত হও। তিনি ছাড়া তারক বধে সমর্থ এমন আর কাউকে দেখছি না।

ব্রহ্মার এই কথা শুনে ইন্দ্র বৃহস্পতি ও দেবতাদের নিয়ে শিবের পুত্র উৎপত্তির উপায় চিন্তার জন্য ব্রহ্মার সঙ্গে সুমেরুর উত্তর শৃঙ্গে গেলেন। সেখানে অমেয়াত্মা মাধব তারকের ভয়ে গুপ্ত ভাবে বাস করছিলেন। ব্রহ্মার সঙ্গে তিনি দেবতাদের দেখে হৃষ্টচিত্তে বললেন, তারক বধের বিষয়ে কোন উপায় চিন্তা করেছ কি? যদি কোন উপায় থাকে তো বল, তাতে আমাদের স্বস্তি হবে।

সূত বললেন, ব্রহ্মাদি দেবতারা বিষ্ণুর এই কথা শুনে তাঁকে সব

কথা বললেন। এখন কী করা উচিত, মনে মনে এই চিন্তা করে দেবরাজ ইন্দ্র সুরাসুরের অজেয় কামদেবকে স্মরণ করলেন। পুষ্পধনুর্ধর রতিপতি কামদেব ইন্দ্রের চিন্তা অবগত হয়ে তাঁর নিকটে এসে বললেন, প্রভু, আমাকে কী করতে হবে? তীব্র তপস্যায় কে আপনার স্থান অধিকারে উদ্যত? কিংবা কোন্ রমণী আপনার আদেশ পালনে অসম্মত হয়েছে? তাকে আমি আজই আপনার ধ্যানপরায়ণ করব। আমার নিকটে বীর মানী বা পণ্ডিত কেউ নেই। সমস্ত জগৎ আমার আয়ত্ত। বেশি আর কী বলব, আমার বাণে বিদ্ধ হয়ে মহামুনি দুর্বাসাও পতিত হতে পারেন।

ইন্দ্র বললেন, পুষ্পধন্বা, তোমার সামর্থ্য আমার অবিদিত নয়। তোমাকে দিয়ে সব কার্য সিদ্ধ হয়, অন্য ভাবে হয় না। তুমি দেবতাদের হিতের জন্য শিবের নিকটে যাও। মহাদেবের মনে ক্ষোভ উৎপাদন করে পার্বতীর সঙ্গে তাঁর সম্মেলন সম্পাদন কর। এই আমার কাজ, এই আমার আকাঙ্ক্ষা, এর জন্যই আমি তোমাকে স্মরণ করেছি।

মনোভব মকরধ্বজ ইন্দ্রের এই কথা শুনে মধু-রতি সমভিব্যাহারে পঞ্চশর নিয়ে মহেশ্বর শম্ভু যেখানে একাগ্র চিত্তে অচল ভাবে ধ্যানযোগে আত্মায় স্বাত্মচিন্তা করছিলেন সেইখানে উপস্থিত হলেন। শিবের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন যে দ্বারদেশে মেরুশৃঙ্গের মতো উন্নত চতুর্ভুজ নন্দী দ্বিতীয় শঙ্করের মতো দণ্ডায়মান। তাঁর অঙ্গে সমস্ত অলঙ্কার, সহস্র সূর্যের মতো তেজ, হাতে বজ্র ও শূল, ত্রিলোচন এবং শশিকলা শিরোভূষণ। তাঁকে দেখে কামদেব চিন্তাকুল হলেন, কী ভাবে প্রবেশ করে ত্রিদশ পূজিত শিবকে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করব, কেমন করেই বা দেবতাদের প্রীতিবর্ধক কাজ করব! অনেক চিন্তার পর মদন মৃদু সুগন্ধ শীতল বায়ুর রূপ ধরে নন্দীকে বঞ্চিত করে দক্ষিণ দিক আশ্রয় করে শিবের আশ্রমে প্রবেশ করলেন। আজও এই জন্য দক্ষিণের বায়ু মৃদু সুগন্ধ শীতল ও সুখাবহ হয়ে প্রবাহিত হয়। মদন সেখানে দেবদেব নীলকণ্ঠকে কোটি সূর্যের মতো দেদীপ্যমান দেখলেন।

তাঁকে দেখে তিনি ধনু আকর্ষণ করে শিবের ধ্যান অবসানের প্রতীক্ষা করে রইলেন। এই ভাবে ষাট হাজার অযুত বর্ষ অতীত হলে শিব নয়ন উন্মীলন করে পার্বতীকে দেখতে পেলেন। তপে প্রসক্তা লজ্জান্বিতা গিরিরাজ পুত্রীকে দেখে 'এখানে এ কী!' এই বিকল্প বুদ্ধি হয়েই স্মরহর শিব বুঝলেন, এ কাম। কামদেবকে শরাসন আকর্ষণ করে উপস্থিত দেখেই তাঁকে নয়নানলে ভস্মসাৎ করলেন।

সূত বললেন, কন্দর্পকে দগ্ধ করে শম্ভু পার্বতীকে বললেন, দেবেশি, তোমার কী অভিলাষ পূর্ণ করব বল। তুমি বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার উপরে প্রসন্ন হয়েছি। তোমার দুর্লভ কিছু নেই।

পার্বতী বললেন, কন্দর্প তো নিহত হয়েছে, এখন আর আপনার নিকটে বর নিয়ে কী করব! একসঙ্গে কোটি সূর্যের উদয়ের মতো কাম ছাড়া স্ত্রীপুরুষের ভাব একান্তই অসম্ভব। ভাবোদয় না হলে কী ভাবে সুখোদয় হবে বলুন!

শিব বললেন, আমি মদনকে ভস্ম করি নি। এ আমার চোখের ধর্ম। আমি কী করব বল।

দেবী বললেন, আমি বালিকা। আমিও তো আপনার সামনে আছি, আপনি আমাকেও দগ্ধ করতে পারেন। শিব যদি প্রতারণায় প্রবৃত্ত হন তো কে তাঁকে নিবারণ করতে পারে। কিন্তু আমাকে প্রতারণা করা আপনার উচিত হবে না। আমি আপনার শরণাগত, আমার আর উপায়ান্তর নেই, আমাকে আপনার পরিত্রাণ করতেই হবে। আমি আপনাকে প্রণাম করছি।

সূত বললেন, ত্রিপুরহন্তা হর প্রসন্ন হয়ে দেবী কালীকে বললেন, তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তা প্রদান করছি।

দেবী বললেন, কাম জীবিত হোক, কামের জীবন ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।

ঈশ্বর বললেন, তোমার প্রীতির জন্য কাম অনঙ্গ হয়ে থাক এবং সেই রূপেই সে জগৎকে মুগ্ধ করতে সমর্থ হোক।

তারপর বায়ুর মতো অপ্রমেয় অনঙ্গাকার মকরধ্বজ উত্থিত হলেন এবং উমার প্রার্থনা মতো ধনুর্বাণধারী ও রতির সহচর হলেন। মহেশ্বর প্রীতিপূর্বক পঞ্চবাণ স্মরকে বর দান করে অন্তর্হিত হলেন।

সূত বললেন, শঙ্করের নিকটে বর লাভ করে ভগবতী উমা পিতৃগৃহে গেলেন। গিরিরাজ কালীকে কোলে নিয়ে মস্তক আঘ্রাণ করে প্রীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তপস্যায় শম্ভুকে তুষ্ট করতে পেরেছ তো? তাঁর কাছে তুমি কী বর পেলে?

দেবী বললেন, শূলপাণিকে তপস্যায় আরাধনা করে তাঁকেই পতি-রূপে লাভ করে কৃতার্থ হই, এই আমার প্রার্থিত বর। আমাতে ও মহেশ্বরে তত্ত্বত ভেদ নেই, বেদান্তের অর্থ বিচারে আমাদের ঐক্য সিদ্ধ হয়। যে ঈশ্বরীয় তেজে সর্বকৃতাত্মক বিশ্ব শান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, তা আমাকেই জানবে। আমিই সকলের অন্তর্যামী মায়াশক্তি, মহেশ্বর মায়াবান। আমি একা পরাশক্তি, মহেশ্বরও এক। আমি শিবেরই পরমাশক্তি। ব্রহ্মার আদেশে আমি দক্ষের কন্যা হয়েছিলাম। পিতা দক্ষ শূলীর নিন্দা করেছিলেন বলে আমি তোমার কন্যা হয়ে জন্মেছি। এবারে আমি স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হয়েছি, অন্য কোন কারণে নয়।

দেবীর অনুগ্রহে হিমালয় মাহেশ্বর জ্ঞান লাভ করে জীবন্মুক্ত হলেন।

সূত বললেন, তারপর তিনি নানাবিধ বিস্ময়কর উপকরণে ভূষিত বিবাহ মণ্ডপ নির্মাণের জন্য বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন। তাঁর আহ্বানে জগতের সমস্ত কর্মে কুশল বিশ্বকর্মা হিমালয়ের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আনন্দিত হয়ে সাদরে তাঁর পূজা করে বললেন, আপনি সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ বলেই আপনাকে এখানে ডেকেছি। শিব আমার কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য আসবেন। তাই এই যজ্ঞের জন্য অযুত যোজন বিস্তৃত একটি হিরন্ময় মণ্ডপ আপনি নির্মাণ করুন।

হিমালয়ের কথায় বিশ্বকর্মা বহু রত্ন দিয়ে একটি বিবাহ মণ্ডপ অতি

শীঘ্র নির্মাণ করে দিলেন। স্তম্ভগুলি সোনা ও বিবিধ মণি রত্ন ও স্ফটিকে নির্মাণ করলেন, মাঝে মাঝে মুক্তার দাম ও দর্পণের মালা সাজিয়ে দিলেন। ধ্বজা মালা ও পতাকায় শোভিত হল মণ্ডপ। রত্ন দিয়ে সিংহ শার্দূল ও গজাদির আকৃতি নির্মিত হল। শিবের প্রিয় রুদ্র গন্ধর্ব অপ্সরা দেবতা ও মানুষের চিত্রও রাখা হল। গৃহের ভূমিভাগ চিত্রিত হল নানা বর্ণে। দেখে মনে হতে লাগল, বিধাতা যেন মানস কল্পনায় ঐ গৃহ নির্মাণ করিয়েছেন। যথাস্থানে বিন্যস্ত হল কলস স্বস্তিকদ্রব্য হরিচন্দন গন্ধদ্রব্য ও কর্পূর। পুষ্পের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হতে লাগল। নানাবর্ণের নানাবিধ পবিত্র আসন সজ্জিত হল। মণ্ডপের স্থানে স্থানে জলপূর্ণ দীঘিকা হ্রদ রত্নসোপানমণ্ডিত নদী এবং ক্রীড়াস্থল ও ক্রীড়া-বাপী নির্মিত হল। দীর্ঘিকার রমণীয় তটে মনোহর মহীরুহে মুক্তাদাম দিয়ে দোলা নির্মাণ করা হল। স্থানে স্থানে রমণীয় উদ্যান। সেই মণ্ডপের হেমময় পীঠের মধ্যে শ্বেতবর্ণের সিংহাকৃতি সমন্বিত, সহস্রদল-মণ্ডিত পারিজাতের মঞ্জরী দিয়ে অলঙ্কৃত, চারু সোপানে সুশোভিত স্তম্ভ ও কলস সমেত নানা অপ্সরা বেষ্টিত রত্নখচিত ইন্দ্রনীলময় বেদী নির্মাণ করলেন এবং নূতন আকারের বীণা ও বেণুধারিণী রমণীমূর্তি স্থাপিত হল। এইসব মনোহর নয়নসুখকর দিব্যসুরসুন্দরী বিচিত্র চিত্র ও বিবিধ উপকরণ দিয়ে বিশ্বকর্মা বেদীর মধ্যস্থল সজ্জিত করলেন।

সূত বললেন, বিশ্বকর্মার মণ্ডপ নির্মাণের কথা শুনে শঙ্কর শিলাদ তনয় নন্দীকে বললেন, নগরাজ দেবতাদের ও আমাদের হিতার্থে বিবাহ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। স্বয়ং হিমালয় সেখানে কন্যাদানের জন্য উপস্থিত হচ্ছেন। ব্রহ্মাদি দেবতাদের সঙ্গে আমিও সেখানে যাব। তুমি কালাগ্নি প্রভৃতি দেবতা দ্বিজ দ্বীপ সাগর পর্বত ও নদীদের আহ্বান করে সেখানে এসো। বিশ্বকর্মা যেখানে মণ্ডপ নির্মাণ করেছেন, সেখানে আমার ধ্যান-পরায়ণ উমাও আছেন।

শিবের এই কথা শুনে নন্দী তাঁকে প্রণাম করে ধ্যানমগ্ন হলেন। ক্ষণকাল ধ্যান করতেই বিশ্বদাহক কালাগ্নি রুদ্ররা কোটি কোটি গণেশ্বরে

পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সর্বজ্ঞ নন্দীশ্বরকে বললেন, শম্ভু আমাকে কী জন্য আহ্বান করেছেন? প্রলয় কাল কি উপস্থিত হয়েছে? তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই সব সংহার করে ফেলি।

কালাগ্নির কথার পর নন্দী তাঁকে বললেন, না, শম্ভু তোমাকে প্রলয়ের জন্য ডাকেন নি। পার্বতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবেন বলেই তোমাকে ও ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাকে এখানে ডেকেছেন।

নন্দীর কথা শুনে কালাগ্নি বললেন, শূলপাণিকে আমরা সবাই দেখতে চাই। তাঁকে দেখাও, দেখে আমরা সুখী হই। তাঁকে জানাও যে ব্রহ্মাদি দেবতারাও এসেছেন এবং তাঁকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

কালাগ্নি প্রমুখের কথা শুনে নন্দীশ্বর শিবের নিকটে গিয়ে বললেন, আপনার আদেশ মতো ব্রহ্মাদি দেবতারা এসেছেন। তাঁরা আপনাকে দেখবার জন্য ও প্রণাম করবার জন্য অভিলাষ করছেন। দ্বারদেশে তাঁরা আপনার দর্শনের জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

তারপর নদী যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তেমনি কোলাহল করে কালাগ্নি বিষ্ণু ব্রহ্মা শতক্রতু দেবতা গন্ধর্ব ঋষি মনু অসুর ও উরগেরা তাঁর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। নানা ধাতুতে বিচিত্রিত, কোটি কোটি গণে সমাকীর্ণ, কোটি রুদ্র সেবিত ভবনে রুদ্র ও দেবতাদের সঙ্গে বিপ্রগুরু অন্তকানল প্রথমেই দেখলেন যে শিব নিশ্চল ভাবে সিংহাসনে বসে আছেন। নন্দী শিবকে প্রণাম করে বললেন, নরকের অধোদেশে অযুত যোজন বিস্তীর্ণ যে পুরত্রয় প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখান থেকে সহস্র সহস্র রুদ্র সমভিব্যাহারে নিজের তেজ সংযমন করে কালাগ্নি আপনার প্রীতির জন্য এখানে এসেছেন। তাঁর দিকে তাকান। ইনিও নীলকণ্ঠ ত্রিনেত্র, বৃষকেতু, পঞ্চবদন, ইন্দুশেখর। অনন্তকে ইনি মেখলা রূপে ধারণ করেছেন, তক্ষককে কুণ্ডল করেছেন, রক্ত ও নীলবর্ণ এঁর আকৃতি। কিন্তু ইনি সৌম রূপ ধারণ করে আপনার নিকটে এসেছেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যপতিরাও এসেছেন। শেষ প্রভৃতি

নাগ, রূপযৌবনগর্বিতা পাতালবাসিনী, সাগর, দ্বীপ, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, অপ্সরা, স্রোতস্বিনী, মুনি ও দেবতারাও উপস্থিত। সত্যলোক পর্যন্ত সপ্ত লোক, ভবাদ মূর্তি, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও সত্যলোকবাসী ও ঋষিরাও এসেছেন। ঐ দেখুন, পদ্মযোনি ব্রহ্মা এসেছেন সাবিত্রীকে নিয়ে, রমাকে নিয়ে আপনার প্রিয় বিষ্ণুও এসেছেন। ইন্দ্র এসেছেন, অগ্নি, সূর্য, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু ও কুবের এসেছেন। ত্রিশ কোটি গণে পরিবেষ্টিত ঈশান ও গণেশ্বর পিনাকী এসেছেন। গণদের নিয়ে কালকণ্ঠ, ঘণ্টাকর্ণ, বসুঘোষ, দণ্ডী, শিখণ্ডী ময়ূববদন, সিংহাস্য, কিরাটি, কালান্তক, নকুলী, মুণ্ডমালী, ত্রিশূলী, বিশ্বমালী, ত্রিমূর্তি—এই সব গণেশ্বরও এসেছেন। সমাগত এঁদের কোলাহল আপনি শুনুন। তীর্থাধিপতিরা দিব্যমূর্তিতে এসেছেন। আটজন গুহ্যক এসেছেন এবং নদারা এসেছেন মূর্তি ধারণ করে। আপনার দর্শন পেয়ে সবাই কৃতার্থ হবে। এই বলে নন্দী দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

সূত বললেন, তারপর হিমালয় নিজের কন্যা উমাকে মহেশ্বরের হাতে প্রদান করবার জন্য তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন। নন্দী তাঁকে দেখে পিনাকীকে বললেন, পর্বতেশ্বর কিছু বলবার জন্য এসেছেন।

নন্দীর কথা শুনে মহাদেব বললেন, গিরিবর নিজের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলুন, তাঁর অভীষ্ট অচিরেই পূর্ণ হবে সন্দেহ নেই।

শম্ভুর এই কথা শুনে পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় অগ্রসর হয়ে অবনত অঞ্জলিতে বললেন, পূর্বে যিনি আপনার পত্নী ছিলেন, তিনিই আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে আপনার হাতে প্রদান করব বলে আমি এসেছি। ব্রহ্মাদি দেবতারা আপনার সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছেন। এঁদের সামনে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনার গোত্র কী বলুন।

বিশ্বেশ এই প্রশ্ন শুনে ভাবতে লাগলেন, আমার গোত্র কী। কিন্তু

কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তখন দেবতারা হিমালয়কে বললেন, ইনিই জগতের উৎপত্তির কারণ, এঁর আবার গোত্র কী ভাবে সম্ভব হবে।

দেবতাদের কথা শুনে গিরিরাজ বললেন, প্রভু, আপনাকে তিন সত্য করে বলছি, উমাকে প্রদান করলাম।

তারপর জয় শব্দ প্রভৃতি মঙ্গলধ্বনির সঙ্গে দুন্দুভি বাদ্যের গভীর নিনাদ উত্থিত হল। শম্ভু পর্বতেশ্বরকে বললেন, আমি পার্বতীকে গ্রহণ করলাম।

তারপর তিনি দেবীর হাতে একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করে হিমালয়কে বললেন, আপনি এই হৈম কলস নিয়ে গিয়ে এই জলে উমাকে স্নান করিয়ে দিন। ত্রিলোকে এই রকম বিধি অবলম্বন করলে বিবাহে অন্য কোন কাজ করতে হয় না। আপনি সত্বর ফিরে যান।

তারপর বিবাহ যজ্ঞে নিরত শৈলেশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে সমাহিত চিত্তে উপস্থিত চরাচর সকলকেই তৃপ্তি সহকারে ভোজন করালেন এবং শঙ্করের প্রতীক্ষায় অবস্থান করতে লাগলেন। এই সময়ে ধর্মকেতু মহেশ্বর শার্ঙ্গীকে অবলোকন করে উত্থিত হলেন এবং জয় জয় শব্দ হতে লাগল। সত্যলোক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। বৃক্ষরা আনন্দিত হয়ে মেঘের মতো পুষ্প বর্ষণ করতে লাগল। বীণা বেণু মৃদঙ্গ ও দুন্দুভির তুমুল নিনাদ হতে লাগল। হরি বিরিঞ্চি ও শক্র প্রভৃতি দেবতারা জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। বিপ্রেরা উচ্চস্বরে বেদ পাঠ আরম্ভ করলেন। গায়ত্রী সাবিত্রী রুদ্রকন্যা বিদ্যাধরী নাগিনী দেবাঙ্গনা সিদ্ধকন্যা যক্ষকন্যা সপ্তমাতৃকা নক্ষত্রমাতৃকা গিরিপত্নী সমুদ্র ও সরোবর সানন্দে মঙ্গলগান করে দেব-দেবের পাদপদ্মে অষ্টাঙ্গ সমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করলেন। এই সময়ে হিমালয়ের নিকট থেকে মৈনাক হেমকুম্ভ এনে সালঙ্কায়ন-পৌত্রের কাছে এলেন। তিনি দেবদেবকে জানালেন। মঙ্গলেশ জলাশয় বিধাতার আদেশে সমুদ্রের জলে শূলপাণিকে স্নান করালেন। দেবদেবের স্নান সমাপনের পর নদী ও সাগর আবার সলিলযুক্ত স্বেদাক্ত ও কৃশাঙ্গ হলেন।

নারায়ণ ও দেবতারা বিস্ময়াপন্ন হয়ে শঙ্করকে দেখতে লাগলেন। তাঁর শরীরে সমস্ত নদী ও সমুদ্র প্রলীন হয়ে গেলে ব্রহ্মাদি দেবতারা যোগমায়ায় জগতের সমস্ত জল বিনষ্ট হয়ে গেল দেখে পশুপতির স্তব করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের স্তবে ভব সহাস্যে সেই জল পরিত্যাগ করে পূর্বরূপ ধারণ করলেন। পিনাকী এই রূপ সমভাবে অবস্থান করলে বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতারা ত্রিমূর্তি ভগবান ভবের স্নান করালেন। নিধি পেয়ে নির্ধন যেমন আনন্দ লাভ করে, মৈনাকও তেমনি আনন্দিত হয়ে বদ্ধাঞ্জলি-পুটে দেবদেবের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। শম্ভু তাঁকে বিদায় দিলেন এবং মৈনাক তাঁর পিতার ভবনে ফিরে এলেন। পার্বতীকে সেই জলে স্নান করিয়ে বস্ত্র পরিধান করানো হল। কপর্দী স্বয়ং ঐ জলপাত করেছিলেন। কুলজ ব্যক্তিদের এই নির্মল পার্বতেয় বিধি। এরপর তপোময়ী ভগবতী পিতার নিকটে আসনে উপবেশন করলেন।

সুত বললেন, এরপর হিমালয় ও মেরু শিবকে দেবতাদের সঙ্গে ছত্র সমন্বিত হয়ে আসতে দেখে জয় জয় ধ্বনি করতে লাগলেন। হাতে মাল্য ও বস্ত্র নিয়ে হিমালয় উঠে দাঁড়ালেন। মহেশ্বরও পুষ্প হাতে উঠে দাঁড়ালেন। আনন্দে পর্বতরাজ নানাবিধ বস্ত্র পতাকা জয়ন্তী মালা পঞ্চবর্ণের ধ্বজা চন্দ্রাতপ ও পুষ্প দিয়ে পথের শোভা বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের দিকে চেয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। অপ্সরাগণ হরি-চন্দনে নিজের গাত্র লেপন করে সুবর্ণপাত্র পদ্ম প্রভৃতি হাতে নিয়ে তাঁর সামনে এল। তাঁরা হাবভাব ও বিলাস প্রকাশ করতে করতে মদনারিকে প্রণাম করে গান গাইতে লাগল। শূলধর সেখানে ক্ষণকালের জন্য স্বীয় মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। পর্বতরাজ বহুবিধ ধন দিয়ে তাঁর পূজা করে স্তব ও প্রণাম করলেন। তখন তাঁর আকৃতি আট বৎসরের বালকের মতো হল। তিনি হেমাঙ্গ কিরীটধারী ও কুণ্ডলমণ্ডিত হলেন। সেই সময়ে সুর ও অসুরেরা পিনাকীর রূপ দেখে আনন্দে হেসে উঠলেন। মহাদেব হেমময় আসনে উপবেশন করলেন। তাঁর দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে জনার্দন এবং সম্মুখে কালরুদ্র রুদ্র ও গণেশ্বর গণ, দেবতা সিদ্ধ ও মুনি-

দের সঙ্গে নন্দীও উপবেশন করলেন। তাঁদের চারি দিকে তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব ও নারদ প্রভৃতি ঋষিরা গান গাইতে লাগলেন। অপ্সরা ও কিন্নরীরা তাল লয় সমন্বিত নৃত্য করতে আরম্ভ করল।

শম্ভু গিরিজার উদ্দেশে আকাশপথে অলঙ্কার প্রদান করে বললেন, তুমি এই ভূষণে বিভূষিত হলে আমার যোগ্য হবে। পূর্বজন্মে দক্ষের উপরে তুমি যে ক্রোধ করেছিলে, সেই ক্রোধ ও তামস ভাবও দূর হবে।

এদিকে পার্বতী শূন্য থেকে নিপতিত ভূষণ নিয়ে পিতার নিকটে গেলেন। তিনি তখনই উৎসব করে তাঁকে দিব্য বসন ও আভরণে বিভূষিত করলেন। মেনকা তাঁকে উৎসঙ্গে নিয়ে আনন্দিত হলেন। জলদের মধ্যে চন্দ্রলেখার মতো পার্বতী শোভা পেলেন।

তারপর ত্রিপুরান্তক বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের নিয়ে সমস্ত ক্রীড়াস্থল ভ্রমণ করতে লাগলেন। নন্দিকেশ্বর বলতে লাগলেন, এই যে বেদী ইন্দ্রনীলমণির মতো শোভা পাচ্ছে, এ জলময়ী এবং জলময়ী বলে মনে হচ্ছে এই বেদীটিই ইন্দ্রনীলমণির। রত্নের এই রকম প্রভা। এ সব নির্মাণ করেছেন বিশ্বকর্মা। ঐ যে লম্বক পরিবৃত ভিত্তি দ্বারের মতো দেখাচ্ছে, তা দ্বার নয়। রত্ন বিন্যাসের জন্যই তাকে দ্বার বলে ভ্রম হচ্ছে। এই যে চিত্ররথের আকার বন, এ নিশ্চয়ই কোন রত্ন-ভূমির প্রতিবিম্ব। আর এই যে সোপানমণ্ডিত মন্দিরের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে এবং সাগরের আকৃতি ভূমি, এও জলসিক্ত রত্নভূমি। এটি ক্রীড়ামণ্ডপ।

মহাদেব সেই ক্রীড়ামণ্ডপে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে সকলেই ক্রীড়াসক্ত হলেন। সেখান থেকে তিনি বেদীর নিকটে গেলেন এবং তাতে আরোহণ করলেন। তাঁকে সেখানে উপবিষ্ট হতে দেখে হিমালয় তাঁর সামনে দেবেশীকে বসিয়ে বলতে লাগলেন, তুমিই পরমাত্মা, তার-পর অর্ধনারীশ্বর। দেবতাদের হিতের জন্য পৃথক অর্ধ তনু হয়েছ। দক্ষের দুহিতা সতী জগদ্ধাত্রী ছিলেন, তিনিই দেহত্যাগ করে আমার কন্যারূপে অবতীর্ণ হয়ে তোমার পত্নী হয়েছেন।

শম্ভু এই কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে বললেন, ইনি যে আমারই পরমা-শক্তি মায়া এবং যোগবলে দেহত্যাগ করে তোমার গৃহে জন্মেছেন, এ সমস্তই আমি জানি। কিন্তু লোকাচার রক্ষার জন্য তোমার দানের অপেক্ষা করেছি। পার্বতীকে যদি আমি অদত্তা অবস্থায় গ্রহণ করতাম, তাহলে এই রকম অদত্তাপহরণ লোকাচার হয়ে পড়ত।

তারপর গিরিরাজ জলপূর্ণ কলস নিয়ে নিত্য পুরুষের পাদ প্রক্ষালন করিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পাণিপদ্মে পার্বতীকে অর্পণ করলাম, পার্বতীকে অর্পণ করলাম বলতে বলতে জলদান করতে লাগলেন। দেবতাদের মঙ্গলধ্বনি এবং বীণা বেণু মৃদঙ্গ ও কাহল প্রভৃতির নিনাদ হতে লাগল। কণ্ঠে হার শোভিত, কটি সূত্রে আবদ্ধ, চারুচঞ্চলনয়না পর্বতরাজের কন্যা সুমেরুস্থিত চন্দ্রলেখার ন্যায় শোভিত হলেন। অগ্নিকে নিয়ে পিতামহ ব্রহ্মা জলপাত্র হাতে বেদীর উপরে এলেন। কন্দর্পের অস্ত্র স্বরূপ বিশ্বমায়া কামময়ী মাহেশ্বরীকে দেখে ভগ্নকুম্ভ থেকে জল পড়ার মতো সহসা তাঁর বীর্যপাত হল। শম্ভুর আদেশে প্রজাপতি তা অগ্নিতে হবন করলেন। সেই আহুতি থেকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আটাশী হাজার মুনি উৎপন্ন হয়ে সূর্যমণ্ডলের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হলেন এবং অগ্নির মতো প্রভাসম্পন্ন হয়ে রইলেন। দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মুনিগণ, পিশাচ দানব ও দৈত্যগণ, কিন্নর নাগ বিদ্যাধর অপ্সরা সকলেই হর পার্বতীর সমাগমে সাতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। হোম অবসানে বিরিঞ্চি মধুপত্রে মহাদেবকে নিবেদন করলেন। তিনি ব্রহ্মাদি দেবতাদের বিবিধ বর দিয়ে স্থাবর ও জঙ্গম সকলকেই বিদায় দিলেন। তাঁরা প্রস্থান করলেন।

বিপ্রগণ, এই বিবাহ বৃত্তান্ত সূর্য যেমন সংক্ষেপে বলেছিলেন, অবিকল সেই ভাবেই আমি বললাম। যে ইহা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ বা পাঠ করে, সংবৎসর মধ্যে সে সমস্ত পাপমুক্ত হয়ে অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়, তেজস্বী ও প্রিয়দর্শন হয়ে শত বৎসরের বেশি জীবিত থেকে ব্রহ্ম-পদ লাভ করে।

কার্তিকেয়র জন্ম ও তারকাসুর বধ

সূত বললেন, এই ভাবে শম্ভু হিমালয়ের কন্যাকে বিবাহ করে কৈলাস পর্বতে গেলেন এবং সেখানে সহস্র বৎসর ধরে ক্রীড়া করতে লাগলেন। নানাবিধি গণ তাঁর ক্রীড়ার সহচর। কেউ সিংহাস্য, কেউ শরভানন, কেউ বা ব্যাঘ্র গৃধ্র গজ মৃগ উষ্ট্র বা হয়মুখ, কারও বিচিত্র মুখ, কারও মুখ বৃক মার্জার সর্প নকুল শিশুমার বা ভল্লুকের মতো, কেউ ময়ূর বদন, কারও বদন বক বানর বা গর্দভের মতো। এইরূপ অন্যান্য জরামরণবর্জিত স্বচ্ছন্দগতি প্রমথগণের সঙ্গে তিনি কৈলাসে ক্রীড়া করে অনেক তপস্যার পর মন্দরাচলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করলেন। কৈলাস ত্যাগ করে মন্দর পর্বতে গিয়ে সেখানে ক্রীড়া করে দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করলেন।

দেবতাদের হিতের জন্য শূলধর কামাসক্ত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন। দেবতারা পূর্বে তারকাসুর বধের জন্য প্রার্থনা করে-ছিলেন। তাঁর বীর্যে উৎপন্ন পুত্র তারকাসুর বধে সক্ষম হবে ভেবে তিনি উমার সঙ্গে ক্রীড়ারত হলেন। এদিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হল। প্রচণ্ড বায়ু ও মেঘ গর্জন করে রক্ত ও অস্থি বর্ষণ করতে লাগল। পর্বত উল্টে গেল এবং দেবতাদের বিমান ভূতলে পড়ল। উল্কাপাতে আকাশ আচ্ছন্ন হল এবং জলন্ত অগ্নির মতো কেতু উদিত হল। প্রলয় কালের মহাবহ্নির মতো ভীষণ দিক্‌দাহ হতে লাগল। মৃত্যুকালে লোক যেমন কিছুমাত্র সুখ পায় না, কেবল যন্ত্রণা বোধ করে, তেমনি জগৎও সুখরহিত ও দুঃখগ্রস্ত হল। শঙ্কর ও পার্বতীও কম্পমান হলে ত্রৈলোক্যও ভয়ে কম্পমান হল। কালাগ্নিও কেঁপে উঠল। বিরিঞ্চি মুনি ও ইন্দ্রাদি দেবতাদের নিয়ে পৃথিবীতে এলেন। দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর ও যক্ষ সকলেই বসুন্ধরায় সমুপস্থিত।

এই সময়ে দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্র তাঁর অর্চনা করে বললেন, মহর্ষি, এই যে দারুণ উৎপাত আরম্ভ

হয়েছে, এর কারণ কী এবং কী ভাবে এর শান্তি হবে বলুন।

নারদ বললেন, পরম জ্যোতি বিশ্বপতি মহেশ্বর অহর্নিশ অবিশ্রান্ত ভাবে উমার সঙ্গে সংযুক্ত আছেন বলেই এই সব উৎপাত হচ্ছে। যদি ভাল চান তো এর বিঘ্ন করতে হবে। উমার গর্ভে যে তেজস্বী অপত্য উৎপন্ন হবে, ব্রহ্মাদি সুরাসুর তা কী ভাবে ধারণ করবে! কেউই এই অপত্যকে ধারণ করতে সমর্থ নয়।

নারদের কথা শুনে ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে কিয়ৎকাল চিন্তার সাগরে নিমগ্ন হয়ে রইলেন। গরু যেমন পঙ্কে অবসন্ন হয়, দেবতারাও তেমনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন। দেবতাদের হিতের ইচ্ছায় জনার্দন বিষ্ণু বলতে লাগলেন, তোমরা আমার কথা শোন। শঙ্কর কামাসক্ত হন নি, তোমাদের হিতের জন্যই ভোগযুক্ত হয়েছেন। স্বাধীন শক্তি সম্পূর্ণকাম বিশ্বাত্মা বিভু স্বভাবতই কামজয়ী। কন্দর্প তাঁর কী করতে পারে! তাঁর বীর্য সম্ভূত সন্তান তারক বধ করবে, এই জন্যই তিনি দেবীর সঙ্গে সঙ্গত আছেন। কিন্তু ইন্দ্র বা কোন সুরাসুর তাঁর উৎপন্ন তেজ ধারণ করতে সক্ষম নয়। আর অপেক্ষা করলে যে ত্রিজগৎ বিনষ্ট হবে, তাতে সন্দেহ নেই। সে একাই বিষ্ণু ইন্দ্র প্রজাপতি আদিত্য কুবের ঈশান বরুণ যম সোম ও বায়ু হয়ে দাঁড়াবে। এখন একটাই উপায় দেখা যাচ্ছে। তোমাদের মুখে অগ্নি আছেন। সেই অগ্নি উগ্র গহন ঘোর অপ্রধৃষ্য এবং অগোচর, তোমাদের হৃদয়গত কার্য সাধনে সমর্থ।

এই বলে বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ত্মা অগ্নিকে বললেন, আমার কথা শোন। দেবতাদের যে কাজ উপস্থিত হয়েছে তা তোমাকেই সাধন করতে হবে। এতে সমস্ত দেবতারই হিত হবে। শিব উমার সঙ্গে সঙ্গত আছেন দেখে সমস্ত দেবতার ভয় উপস্থিত হয়েছে। তুমি তাদের মঙ্গলের জন্য মহাদেবের নিকটে যাও। তুমিই সকলের মুখ ও কার্যসাধক।

অগ্নি এই কথা শুনে বিষ্ণুকে বললেন, আপনি যা বললেন তা যুক্তি-যুক্ত মনে হয় না। বিজনে স্থিত মহেশের সামনে যাওয়া উচিত নয়।

ধ্যানে তৎপর, মন্ত্রণায় ব্যাপৃত, ভোজনে রত, নির্জনে বা দানে স্থিত ব্যক্তির নিকটে যেতে নেই। যারা জপে প্রবৃত্ত বা উপহার যুক্ত, হোমে নিরত বা পূজায় ব্যাপৃত, তাদের নিকটে গমন নিষেধ। সাধারণ লোকই নির্জনস্থিত হলে তার নিকটে গমন যখন নিষিদ্ধ, তখন প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত মহেশ্বরের নিকটে কী ভাবে যাওয়া যেতে পারে। তাঁর নিকটে যেতে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। আমাকে আসতে দেখলে শম্ভু তৎক্ষণাৎ আমাকে বধ করবেন। বিবস্ত্রা মাকেই বা আমি কেমন করে দর্শন করব। এ কাজ অতি কষ্টকর, ভয়াবহ ও গর্হিত। আমি সেখানে গিয়ে কী বলব? তাঁরাই বা কী বলবেন? শিব নিশ্চয়ই আমাকে বলবেন, এই মূর্খকে ধিক্! যা হবার হোক, আমি এই গর্হিত কাজ করতে পারব না।

অগ্নির এই ভয়ের কথা শুনে বিষ্ণু পুনরায় তাঁর প্রশংসা করে দেবতাদের সামনেই শান্তভাবে বললেন, তুমি যা বললে তা সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কাজ নিজের হিতের জন্য করলেই দোষের হয়, পরোপকারের জন্য করলে কোন দোষ নেই। কপর্দী তোমাকে সংহারের জন্য আদেশ করেছেন। তুমি অণু রূপে সেখানে প্রবেশ কর, কোন দোষ হবে না। তুমি তেজ মূর্তি, তোমার প্রস্তুত-অপ্রস্তুত কিছু নেই। তুমি সর্বদা সর্বত্র যেতে পার, তোমার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না। তুমি সমস্ত প্রাণীকে ব্যাপ্ত করে আছ। তাদের উদরস্থ হয়ে তুমি অন্নপাক কর। তুমি একাই জগৎ রক্ষা করছ। তোমার অপ্রাপ্য কী, দোষই বা কী আছে! এ কাজ তুমি ঘৃণ্য মনে কোরো না। কার্য-সিদ্ধির এই সময়। দেবতারা তোমার শরণাগত হয়েছে, এ কাজ করলে তুমি শ্লাঘ্য ও ধন্য হবে। দান করে তুমি বিপন্ন দেবতাদের কাজ উদ্ধার করে দাও। মর্ত্যবাসী যেমন সারাক্ষণ সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে, তেমনি দেবতারাও এখন তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। এ কি কম কথা?

বিষ্ণুর এই কথায় অগ্নি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, শিবের কাছে যেতেই হল। ইন্দ্র বরুণ আদিত্য ও দেবতারা, যক্ষ উরগ ও

রাক্ষসরা অগ্নির মনোগত ভাব জানতে পেরে শুভবাক্যে পাবকের স্তব করে বললেন, জলভীরু জলোৎপন্ন জলচর যজ্ঞদেব হুতাশন, তোমার জয় হোক। তোমাকে নমস্কার করি, তুমি জয়যুক্ত হও, দেবতাদের রক্ষা কর।

দেবতাদের এই স্তবে অগ্নি উঠে দেবতাদের প্রদক্ষিণ করে শম্ভুর গৃহে গেলেন। দ্বারদেশে নন্দীকে প্রতীহার দেখলেন এবং তাঁকে দেখেই তাঁর তীক্ষ্ণ বেগ সহসা প্রতিরুদ্ধ হয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এবারে আমি কী ভাবে শিবের দর্শন পেতে পারি! নন্দী দ্বারে থাকলে কোন পুরুষ প্রবেশ করতে পারে না। আমি প্রবেশ করছি দেখলে নন্দী কুপিত হবেন, আর তাহলে কোন ফলই লাভ হবে না। এইভাবে তিনি যখন চিন্তায় মগ্ন, তখন দেখলেন যে নানাবিধ পক্ষী সেখানে বিচরণ করছে। তাই দেখে তিনি ভাবলেন যে হংসরূপে তিনি হরের সন্নিধানে যাবেন। তখনই তিনি হংসরূপ ধারণ করে নিঃশঙ্ক চিত্তে সূক্ষ্ম আকারে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখলেন যে দেবীর বাহন সিংহ কেশর প্রসারণ করে হুঙ্কার করছে। সেই শব্দে বধির হয়ে অগ্নি ভাবলেন যে মহাসঙ্কট উপাস্থিত, সিংহের কাছ থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারলেই যথেষ্ট। এই কথা মনে হতেই তিনি সেখান থেকে দ্রুত বহির্গত হয়ে সুমেরু শিখরে দেবতাদের কাছে ফিরে এলেন।

অগ্নিকে দেখে দেবতারা আনন্দিত চিত্তে বলে উঠলেন, তুমি আমাদের কী কাজ করে এলে বল।

অগ্নি বললেন, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন কাজই করে আসতে পারি নি। দ্বারে নন্দীশ্বরকে দেখে হংসরূপে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই গিরিজার প্রলয়ান্তক বাহনকে দেখেই ভয়ে পালিয়ে এসেছি। সকলের যাতে মঙ্গল হয় তার উপায় পুনরায় চিন্তা করুন।

অগ্নির এই কথা শুনে দেবতারা বিষ্ণুকে নিয়ে মুনিদের সঙ্গে মন্দর পর্বতে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বৃষভধ্বজের স্তব করতে লাগলেন। শম্ভু

এই স্তবে তুষ্ট হয়ে বরদানে উদ্যত হলেন। বললেন, তোমরা বর প্রার্থনা কর।

অগ্নি প্রমুখ দেবতারা প্রাঞ্জলি হয়ে নির্ভয়চিত্তে বললেন, আপনি যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে এই বর দিন যে গিরিজার গর্ভে যেন সন্তান না হয়।

শম্ভু বললেন, তথাস্তু। আমি বৃথা ত্রৈলোক্যের ক্ষয় কারণ বীর্যপাত করব না। বৃথা বীর্যপাত হলে ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ হবে।

শম্ভুর এই কথা শুনে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা ভয়ে বিহ্বল হয়ে কিছুই বলতে পারলেন না। কর্দমে পতিত গাভীর ন্যায় দেবতারা অবসাদগ্রস্ত হলে বিষ্ণু নিজের অঞ্জলি প্রসারিত করে বললেন, আপনি বীর্যপাত করুন। অমৃত স্বরূপ ঐ বীর্য দেবতারা পান করবেন।

তারপর শিব চন্দ্রবিম্বের মতো লিঙ্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত জাতীকুসুম ও নীলোৎপলের ন্যায় সুবাসিত বীর্য বহ্নির পাণিপুটে প্রদান করলেন। বহ্নি তা সুধা মনে করে আনন্দ সহকারে পান করলেন।

দেবতাদের বিদায় দিয়ে শিব অন্তর্হিত হলেন এবং ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা অগ্নির পূজা করে প্রস্থান করলেন। অগ্নি দগ্ধপ্রায় হয়ে পাতাল থেকে সুতলে গেলেন।

শিব পার্বতীর নিকটে এসে বললেন, যা ঘটেছে সব কথা তোমাকে বলছি শোন। দেবতারা আমার শরণাগত হয়েছিল। শরণাগতকে আমি কখনও পরিত্যাগ করি না। তোমার ষড়ানন এক পুত্র হবে, কিন্তু তাতে তোমার অংশ দেবতারা নষ্ট করেছে। সেই জন্য আমি বহ্নিতে আমার বীর্যপাত করেছি। বহ্নির মুখ থেকে তা তার উদরে গিয়ে অংশে অংশে দেবতাদের উদরগত হয়েছে। অবশিষ্ট যা তার উদরে আছে, সে তা গঙ্গায় নিক্ষেপ করবে। তার প্রভাবে গঙ্গাও দগ্ধ-প্রায় হবে। ছয়জন কৃত্তিকা গঙ্গায় স্নান করতে এলে গঙ্গা তাদের মধ্যে সেই বীর্য নিক্ষেপ করবে। পরে তাঁরা সবাই আমার শরণাগত হলে আমার কথামতো কৃত্তিকারা শরবনে গর্ভ মোচন করবে, দেবতারাও

তাই করবেন। পরে সেই সব তেজ একত্র হয়ে অযুত কাল সূর্যের মতো প্রভাবশালী এক পুত্র হবে। ঐ পুত্রের নাম আগ্নেয়, বহ্নিজ গাঙ্গেয় কৃত্তিকাসূত স্কন্দ ও গুহ হবে।

শিবের কথা শুনে দেবী বললেন, আমার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র দেবতারা চায় নি বলে তারা অপুত্রক হবে। আর অগ্নি যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করে আমাকে বিবস্ত্র দেখেছিল, তা উপেক্ষা করার জন্য যোগী যোগ-বলান্বিত নন্দী মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হবে। নন্দী এই শাপের কথা শুনে বজ্রাহত শৈলের মতো নিপতিত হলেন। মহাদেবের কথায় দেবী অনুগ্রহ করে নন্দীর শাপ মোচন করে মহাদেবকে আলিঙ্গন করলেন।

ঋষিরা বললেন, সগর্ভ হয়ে দেবতারা কী সুখ পেয়েছিলেন এবং নারায়ণ প্রভৃতি দেবতারা কী করেছিলেন, কেমন করে তাঁদের গর্ভ ভূমিষ্ঠ হল এবং সেই সন্তান কী করেছিল—এই সব আমরা জানতে চাইছি, আপনি সংক্ষেপে বলুন।

সূত বললেন, দেবতারা সন্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং পনের হাজার আট বৎসর গর্ভ গোপন করবার পর শঙ্করের শরণাগত হলেন এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে বললেন, আমাদের অত্যন্ত ক্লেশ হচ্ছে, এ যাতে দূর হয় তার উপায় করুন। পুরুষের গর্ভ ধারণ উপহাসের কথা, নরকের পাপীর মতো আমাদের দাহ অনুভব হচ্ছে। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

দেবতাদের এই কথা শুনে দেবদেব শিব ঈষৎ হেসে বললেন, তোমরা তো তাই চেয়েছিলে। দেবীর গর্ভস্থ সন্তানে তোমাদের প্রয়োজন নেই। তাই তোমাদেরই গর্ভ দশা হয়েছে। এখন তোমাদের যা কর্তব্য, তাই বলছি শোন। অগ্নিকে নিয়ে তোমরা মন্দর পর্বত থেকে মেরু পর্বতে যাও। সেখানে শরধান বনে গিয়ে হ্রদের মধ্যে প্রসব কর। তোমাদের গর্ভ নিঃসৃত হবে ও ক্লেশ দূর হবে।

শিবের কথা শুনে দেবতারা নারায়ণকে অগ্রবর্তী করে অগ্নির অন্বেষণ করে সুমেরু পর্বতে গেলেন। দেবতারা তার উত্তর দিকে শরাধান বনে বিধাতাকে মাঝখানে ও নারায়ণকে সামনে রেখে উপবেশন

করে সকলেই প্রসব করলেন। শৈব তেজে সেই মেরু পর্বত রঞ্জিত হয়ে কাঞ্চনময় হয়ে গেল। অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা শিবের তেজ ধারণ করেছিলেন বলে তাঁরা জরাদি মুক্ত ও অমর হলেন। সেখানে সিদ্ধ মুনি জলজ ও স্থলজ যা কিছু ছিল, সবই কাঞ্চন সদৃশ হল। শিবের সমস্ত তেজ সুমেরু পর্বতের পার্শ্বদেশ ভেদ করে গঙ্গায় পড়ে একত্র হয়ে গেল। তারপর মহাদেব সেই তেজ দর্শন করে পিঙ্গলকে দেখিয়ে সুমেরু পর্বতে গোপন করে রাখলেন। সহস্র বৎসর পরে সেই তেজ দেদীপ্যমান ও কঠিন হয়ে স্কন্দিত বা রাশীকৃত হল। এই জন্য তাকে স্কন্দ বলা হয়। হর থেকে উৎপন্ন বলে তিনি কুমার নামে অভিহিত।

সেই স্কন্দ কুমার ষড়ানন দ্বাদশ লোচন ও দ্বাদশ বাহু বিশিষ্ট হয়ে শোভা পেলেন। ঈশ্বরের আদেশে পরমা সুন্দরী ছয়জন কৃত্তিকা স্নানের জন্য সেখানে এসে তাঁকে দুধ দিয়েছিল বলে তাঁর কার্তিকেয় নাম হয়। তপ্ত স্বর্ণের মতো কান্তিমান গর্ভপঙ্কে লিপ্ত কুমারকে ঐ শরধান বনে গঙ্গায় স্নান করানো হল। বিধাতা সহস্র নামে ঐ কুমারের স্তব করলেন। তারপর তিনি উঠে গভীর নিনাদ করতে লাগলেন। সেই শব্দে সুমেরুর শৃঙ্গ ও পাতাল শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল, সিংহাদি পশুরাও প্রপীড়িত হল। তারপর পিঙ্গল শিবের পুত্রকে সেখানে ক্রীড়া করতে দেখে শিবকে জানালেন, অযুত সূর্যের মতো আপনার ষড়ানন পুত্র কেমন ক্রীড়া করছে দেখুন।

পিঙ্গলের এই কথা শুনে ঈশ্বর দেবীকে সানন্দে বললেন, সুমেরু পর্বতের যেখানে তোমার পুত্র আছে, এসো আমরা সেখানে গিয়ে ষড়ানন পুত্রকে দেখি। আমাদের মানস হংস স্বরূপ ঐ পুত্র কার্মুক হাতে কেমন ছুটোছুটি করছে দেখ।

তারপর হর পার্বতী সেখানে উপস্থিত হলে অগ্নি তাঁদের দেখে কুমারকে বললেন, এই হর ও পার্বতী তোমার পিতা মাতা। তোমাকে দেখবার জন্য এখানে এসেছেন, এঁদের নিকটে গিয়ে আশ্রয় নাও।

অগ্নির কথায় কুমার পার্বতীর অঙ্কে উঠলেন এবং গৌরীর কোলে

থেকে তাঁর স্তন্যপান করতে লাগলেন। তিনি উমার তিলক ও অলক স্পর্শ করতে লাগলেন এবং শিবের ভুজঙ্গ হার ও কপর্দস্থ চন্দ্র হাত দিয়ে মর্দন করতে লাগলেন। তারপর ষষ্ঠীপ্রিয় গুহ পঞ্চমীতে উপবেশিত হলেন। ষষ্ঠীতে চতুষ্পাদগতি অর্থাৎ হামাগুড়ি ছেড়ে ত্রৈলোক্য হননে উদ্যত হলেন। সেই বালক স্থাবর জঙ্গম সকল জন্তুকে বোধিত করলেন, পর্বতশৃঙ্গকে সমান করে দিলেন, সিংহকে আকর্ষণ করে ভূতলে ফেললেন এবং তাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। কখনও সম্মুখে আগত দুই হস্তীর শুণ্ড ধরে অবলীলাক্রমে পরস্পরের কুম্ভে আঘাত করলেন। কখনও আকাশে খেচরদের বিমান মাটিতে ফেলে দিতেন, আবার দেখতে না দেখতেই আকশে উঠে চন্দ্র সূর্য ও গ্রহদের পথ রোধ করে দিতেন। সুমেরুর শৃঙ্গ উৎপাটন করে ইতস্তত নিক্ষেপ করতেন. পর্বত ও নদীকে উন্মার্গে নিয়ে যেতেন। এই ভাবে তিনি বিষ্ণুর ত্রিপাদের নিক্ষেপ স্থান ত্রিজগৎকে ত্রাসিত করে তুললেন।

তখন সমস্ত প্রাণী ঐ ভীষণ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ইন্দ্রের নিকটে গিয়ে বলল, অযুত সূর্যের মতো তেজস্বী এই বালক আমাদের বধ করতে এসেছে। নিশ্চয়ই সে আপনার রাজ্যও হরণ করবে। পরাক্রমে সে আপনার চেয়ে শত গুণ। যদি আপনি তাকে বিনষ্ট করতে পারেন তবেই মঙ্গল। আমাদের কথামতো কাজ করুন, তাতেই আপনি রক্ষা পাবেন। শিশু ভেবে তাঁকে উপেক্ষা করবেন না, সযত্নে বিচার করে তাকে বিনাশ করুন।

তাদের কথা শুনে পুরন্দর বললেন, কেমন করে তোমরা বালক হত্যা করতে বললে! ঐ গর্হিত কাজে এই চরাচরে সমস্ত ধর্ম ও কীর্তি নষ্ট হয় ও পাপ বর্ধিত হয়। ধর্ম শাস্ত্রের নিয়ম বলছি, শোন। ঋষিরা পূর্বে পুরাণে লিখেছেন যে আতুর ভীরু উদ্বিগ্ন শরণাগত ক্রোড়স্থ স্ত্রী কিংবা বালক বৃদ্ধ পঙ্গু তপস্বী বিলাপকারী উন্মত্ত বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ পতিত পাপায়মান কামাসক্ত অস্ত্রহীন নগ্ন দীন নখরোম সমন্বিত মুণ্ডিতকেশ বৃদ্ধ ও মত্ত কিংবা সুপ্ত ব্যক্তিকে যে মূঢ় হত্যা করে, সে গর্তে পতিত কুঞ্জরের

ন্যায় নরকার্ণবে পতিত হয়ে আর উঠতে পারে না। অতএব তোমরা শিবের পুত্র গুহের নিকটে গিয়ে তাঁর শরণাগত হও। আমি বালক বধ করতে সাহস করি না।

ইন্দ্রের এই কথায় চরাচরগণ অতি দুঃখিত হয়ে ক্রোধোদ্দীপক বাক্যে পুনরায় বলল, পূর্বে আপনি ক্রোধে যখন দিতির গর্ভ নষ্ট করেছিলেন, তখন এই সব নীতির কথা কোথায় ছিল যে এখন খুব নীতিমান হচ্ছেন! অশক্য কর্মে সব পুরুষই নীতির দোহাই দেয়। এই বালকের সঙ্গে রণস্থলে যুদ্ধ করে, এমন বীর কে আছে! শত শত ইন্দ্র এসে কোটি কোটি বজ্র নিক্ষেপ করেও তার একটি রোমাগ্র উৎপাটিত করতে পারবে না।

এইসব প্রাণীরা এই কথা বলতেই ঘৃতে অভিষিক্ত হয়ে অগ্নি যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে পুরন্দর হাতে বজ্র নিয়ে তাদের বললেন, আমি পূর্বে যেমন দিতির দেহে প্রবেশ করে তার গর্ভপাত করেছি, আবার তেমনি শিশু হত্যার কাজে প্রবৃত্ত হলাম। বহ্নি যেমন পতঙ্গকে দগ্ধ করে, আমি গিয়ে সেইভাবে তাকে বধ করব। আমি বজ্র নিয়ে যুদ্ধে উপস্থিত হলে কে আমার সৌর্য সইতে পারে!

ক্রোধানলে প্রদীপ্ত শক্র এই কথা বলে দেবতা সাধ্য ও আদিত্যগণকে আদেশ করলেন, আমি বালক বধের জন্য শরধানে যাচ্ছি। ঐরাবতকে আমার সামনে আনো।

আদেশ পেয়েই দেবতারা সেই হাতীকে ইন্দ্রের কাছে আনলেন। ইন্দ্র সেই হাতীর পিঠে চড়ে দেবতা সাধ্য বিশ্বদেব অষ্টবসু মরুৎ আদিত্য ও অশ্বিনীকুমারদের সঙ্গে স্কন্দকে বধের জন্য বহির্গত হলেন। তিনি সুসজ্জিত হয়ে আকাশমণ্ডলে উঠলে চরাচর তাঁর স্তব করতে লাগল, অপ্সরারা চারিদিকে নৃত্য করতে লাগল, কিন্নররা বাদ্য ও সুগায়ক গন্ধর্বরা মনোহর গান করতে প্রবৃত্ত হল। সিংহের নিনাদে, গজের গর্জনে ও অশ্বের হ্রেষারবে চতুর্দিক পূরিত হল। মহাবেগে রথ ধাবিত হল, পতাকা বৈজয়ন্তী ও ধ্বজ উত্তোলিত হল, ছত্র চামর ও নানাবিধ দ্রব্যে

আকাশ আচ্ছন্ন হল। ইন্দ্র দ্বিতীয় নন্দীশ্বরের মতো চলতে লাগলেন। তাঁর চারিপাশে চামর ব্যজন হতে লাগল। সুরকিন্নরীরা গান-গাইতে লাগল এবং কামাতুর সুরসুন্দরীরা সতৃষ্ণ নয়নে তাঁকে যেন পান করতে লাগল। পথিমধ্যে মুনি ও সিদ্ধরা তাঁর পূজা করলেন। বজ্রধর কিরীটি-ধারী আনন্দিত চিত্তে কুমারকে লক্ষ্য করে হরির মতো গমন করতে লাগলেন।

সূত বললেন, শচীপতি এইভাবে পার্বতীর পুত্রের সন্নিধানে গিয়ে অযুত সূর্যের মতো দেদীপ্যমান বালককে দেখলেন। বালকের আকৃতি দেখে তিনি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুমেরুর চেয়ে শতগুণ উঁচু তেজে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করে ইনি কে শোভা পাচ্ছেন?

ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে নারদ বললেন, দেবতাদের সঙ্গে আপনি এখানে যে গর্ভমোচন করেছিলেন, তারই এই প্রভাব। এ সূর্যপুঞ্জ নয়, পর্বতও নয়। এই তেজের প্রভাবে নিচে ষোল হাজার যোজন, উপরে চুরাশি হাজার যোজন ও বত্রিশ হাজার যোজন বিস্তৃত এই সুমেরু পর্বত কাঞ্চনময় হয়ে গেছে। সেই তেজ সহস্রাব্দ অতীত হলে স্কন্দভাব প্রাপ্ত হয়, চতুর্থীতে এর শ্রী আর হয়, পঞ্চমীতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ষষ্ঠীতে দুই পায়ে ত্রৈলোক্য বিজয়ে উদ্যত ও সপ্তমীতে আপনার সঙ্গে পালন কার্যে ব্যাপৃত হবেন। শতবর্ষেও আপনি একে পরাজিত করতে পারবেন না। এই কুমার পার্বতীর আনন্দবর্ধক, নানাবিধ অস্ত্র সমন্বিত ও নানা আভরণে ভূষিত হয়েছেন। প্রমথ ও মাতৃগণ এর সেবা করছে।

এইরকম কথা হতে হতেই ইন্দ্র বালকের উপরে বজ্রাঘাত করলেন। কিন্তু পার্বতীতনয় সেই বজ্রকে তৃণবৎ জ্ঞান করে এক বাণে ইন্দ্রকে বিদ্ধ করলেন। ইন্দ্র মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ষড়ানন অন্য এক শরে ইন্দ্রের ধ্বজ পতাকা ও ছত্র ছেদন করলেন। যুদ্ধস্থলে শম্ভু যেমন রুরুকে আঘাত করেছিলেন, সেইভাবে আর এক শরে শতক্রতুকে আঘাত করলেন এবং অগ্নির মতো আর এক তীক্ষ্ণ শরে হরির মুকুট অবলীলা-ক্রমে ছেদন করলেন। পঞ্চ বাণে যমকে আহত করলেন, দশটি শরে

নিঋ´তিকে, পনরটি শরে বরুণকে ভেদ করলেন। ত্রিশ শরে সোমকে তাড়িত করে পুনরায় পঞ্চশত শরে শক্রকে আহত করলেন। স্কন্দ গভীর নিনাদ করতে করতে দুই পাঁচটি শরেই অন্যান্য দেবতাদের তাড়িত করলেন। ইন্দ্র পুনরায় বজ্র দ্বারা স্কন্দকে তাড়না করলেন। পরক্ষণেই তিনজন দেবতা, বেদ, অগ্নি ও দিবাকরগণ মনোহর মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। তারপর দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বললেন, মহাদেবের পুত্রের সঙ্গে আপনার যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আপনাকে আমি হিত উপদেশ দিচ্ছি, শুনুন। যদি সুখভোগ করতে চান, তবে আমার কথামতো কাজ করুন। এর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে নিষ্কণ্টকে চিরকাল রাজ্যভোগ করুন। বজ্রাঘাতে যাঁর একটুও পাড়া হয় না, তাঁকে আপনার মতো শত লোকেও কি বধ করতে পারবে!

সূত বললেন, তখন শক্র গুরুর কথা শুনে সেই কুমারের শরণ নিলেন। ইন্দ্র বললেন, আমি তোমার শরণাগত, আমি তোমার পা নিজের মাথায় ধারণ করছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমিই দেবতাদের রাজা হয়ে আমার রাজ্য গ্রহণ কর।

ইন্দ্রের কথা শুনে ষড়ানন দয়াযুক্ত হয়ে বললেন, আমি রাজ্যে কী করব! প্রাকৃত ভোগে আমার প্রয়োজন নেই, পিতামাতার প্রসাদে আমার কিছুই অপর্যাপ্ত নয়। তুমিই নিষ্কণ্টকে রাজত্ব কর, আমার সঙ্গে সখ্যতা করে শক্র জয় কর।

স্কন্দের এই কথা শুনে ইন্দ্র বললেন, দেবতাদের মধ্যে বিখ্যাত বলবান কেউ নেই, অতএব তুমিই এখানে রাজত্ব কর। কোথায় শৈশব ও কোথায় সংগ্রাম! এই রকম নীতি পরাক্রম জ্ঞান বুদ্ধিমত্তা ও সৌম্যতাই বা কোথায় আছে! এই রকম মায়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা ও প্রসাদও কোথাও দেখা যায় না। এই সমস্ত গুণের জন্য তুমিই এই রাজ্যের উপযুক্ত ভোক্তা। বন্দী চারণ বিদ্যাধর যক্ষ অমর সিদ্ধ গন্ধর্ব ও অপ্সরা-গণ যে সব গুণের জন্য স্তব করে, তা তোমারই স্বরূপ স্বগুণমাত্র। এ সবে অত্যুক্তির লেশও নেই। আমি তোমার সেনাপতি হব এবং তুমি

সবার উপরে বিরাজমান হয়ে ত্রৈলোক্য ভোগ কর।

ইন্দ্রের এই কথা শুনে অম্বিকা পুত্র বললেন, তোমাকে অভয় দিচ্ছি, কোন ভয় নেই, তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর। তুমি ইন্দ্র দেবরাজ, তুমিই জগতের প্রভু, বলদর্পে গর্বিত দুর্জয় দানবেরা যখন তোমাকে পরাভব করবে, তখন আমাকে স্মরণ করো, আমি তাদের বধ করব। কথা বাড়াবার প্রয়োজন নেই, আমি নিশ্চয়ই তোমার সখা হলাম।

তারপর ইন্দ্র মহাদেবের পুত্রকে রাজ্যে নিস্পৃহ দেখে বললেন, তোমার যদি ইন্দ্রত্বে অভিমত না হয়, তবে, হে গুহ, আমার সেনাপতি হও।

তথাস্তু। বলে কার্তিকেয় শচীপতির এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন। তারপর সমস্ত দেবতা পিতামহের আদেশে গুহকে যথাবিধানে সেনাপতিত্বে অভিষেক করলেন। হরের আজ্ঞানুক্রমে কার্তিকেয়কে সেনাপতিত্ব প্রদত্ত হল এবং তখনই সহসা তারকাসুর কুমারকে হনন করবার জন্য উপস্থিত হল। অগ্নি যেমন তুলারাশিকে ভস্ম করে, তেমনি আসতে দেখেই কার্তিকেয় তাকে অবলীলাক্রমে বিনষ্ট করলেন। পাবক যেমন শলভ দাহ করে, সেই ভাবেই তারকাসুরকে দগ্ধ করে স্কন্দ প্রীত মনে মাতার উৎসঙ্গে উপবেশন করলেন। মহাদেবও বিষ্ণুর সঙ্গে বিধাতা প্রভৃতিকে বিদায় দিয়ে প্রমথদের সঙ্গে অন্তর্হিত হলেন।

ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ

ঋষিরা বললেন, সূত, শিবের বিবাহ, কার্তিকেয়র জন্ম ও তার পরাক্রমের কথা শুনলাম। এবারে ভক্তি যোগের কথা বলুন।

সূত বললেন, পুরাকালে ব্রহ্মা প্রীত মনে নারদকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা শুনুন। সত্যলোকে ব্রহ্মা সুখে বসে আছেন, মুনি ঋষি সিদ্ধ ও সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয় তাঁর উপাসনা করছেন এবং দেবতারা তাঁর স্তব করছেন। এই সময়ে নারদ তাঁকে প্রণাম করে বললেন, দেবদেব শূলপাণির ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য আমাদের বলুন।

ব্রহ্মা বললেন, শঙ্করকে প্রণাম করে তাঁর ভক্তিযোগ বলছি, শোন।

এই ভক্তিযোগের বিষয় শিবের নিকটে যেমন শুনেছি, ঠিক সেই রকমই বলব। শিবের প্রতি ভক্তি প্রাণীদের দুর্লভ। কিন্তু কোন ভাবে যদি সেই ভক্তি লাভ হয় তো আর কিছুই তার দুর্লভ থাকে না। অগ্নি যেমন কাঠ দগ্ধ করে, তেমনি শিবভক্তি শুভ-অশুভ সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত করে। ম্লেচ্ছও শিবভক্ত হলে চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও তার সমান হতে পারে না। শিবভক্তে ঘোরতর পাপ করেও পাপে লিপ্ত হয় না। দুষ্কৃতি করেও সে শিবের প্রসাদে মুক্তি লাভ করে। একবার মাত্র শিবের পূজা করে অশ্বমেধ যজ্ঞের বেশি ফল পাওয়া যায়। পদ্মপত্রে জলের মতো জীবনকে চঞ্চল ও মৃত্যুর পর দুরন্ত নরক মনে করে শিবের প্রতি মতি করবে। শিবভক্ত হলে কারও কোন ভয় থাকে না, সংসার সাগর সহজেই উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মোক্ষ স্বর্গ বা ব্রহ্মপদের অভিলাষী ব্যক্তিরা শিবভক্তিই যে একমাত্র পথ এবং অন্য পথ নেই—এ বেদ বাক্য। সমস্ত পরিহার করে শিবভক্ত হও, তাতেই মুক্ত হবে। শিবের উদ্দেশে দান ও হোম, শিব স্নাপন ও শিব জপ যে অক্ষয় ফল দান করে, এ শিবেরই উক্তি। কুরুক্ষেত্র নৈমিষারণ্য প্রয়াগ প্রভাস গঙ্গাসাগর সঙ্গম রুদ্রকোটি গয়া শালগ্রাম অমরকণ্টক পুষ্কর ভারভূতেশ গোকর্ণ ও মণ্ডলেশ্বরে বাস করলে যে ফল পাওয়া যায়, একদিন ভক্তিভরে শিবপূজা করলেই সেই ফল লাভ হয়। শিবলিঙ্গ পূজার চেয়ে বেশি পুণ্য ত্রিভুবনে আর কিছুতে নেই, শিবলিঙ্গ পূজাতেই নিখিল জগৎ পূজা করা হয়। মায়ায় মোহিত ব্যক্তি মহেশ্বরকে জানতে পারে না, তাঁর অনুগ্রহেই তাঁকে জানা যায়। পৃথিবীতে যত তীর্থ ও পবিত্র স্থান আছে, সে সমস্তই শিব-লিঙ্গে অবস্থিত। রত্ন পরিত্যাগ করে কাচ অন্বেষণের মতো শিবলিঙ্গ পূজা পরিত্যাগ করে যে অন্য দেবতার পূজা করে সে মূঢ়। চতুর্দশী অষ্টমী পূর্ণিমা অমাবস্যা ও ত্রয়োদশীতে শিবপূজা করলে সমস্ত তীর্থে স্নানের ফল সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল ও দেহান্তে দুর্লভ শিবলোক প্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা অন্ত্যজ জাতিও শিবভক্ত হলে সকলের পূজ্য হয়। কারও আচার কুল ব্রত এ সব কিছুই দেখতে হবে

না, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত দেখলেই তার পূজা করবে। যে কর্ম মন ও বাক্যে শিব ভক্তের নিন্দা করে, নরক থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। যম শিবভক্ত ছাড়া আর সবার শাসনকর্তা, শিবভক্তের শাসনকর্তা শিব নিজে। শিবভক্তের রাজভয় তো থাকেই না, মৃত্যুর পরে যমের ভয়ও থাকে না। একটি আশ্চর্য উপাখ্যান বলছি, শোন।

উজ্জয়িনীতে সত্যধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ধর্মাত্মা সত্য-সঙ্কল্প ও প্রজাপালনরত ছিলেন। কালক্রমে তিনি স্বর্গে গেলেন। তাঁর পুত্রের নাম বসুশ্রুত। ইনি মহাকালপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু ধর্মত প্রজা-পালন করতেন না, রাজধর্ম বহিষ্কৃত ছিলেন। তিনি অসাধুদের ত্যাগ করে সাধুদের হিংসা করতেন। প্রজাদের মঙ্গল ছিল না, সব বিষয়েই তারা শত্রুসঙ্কুল ছিল। ম্লেচ্ছরা যাজ্ঞিকদের যজ্ঞ বিধ্বস্ত করত। এই ভাবে সহস্র বৎসর অতীত হলে রাজার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল। পাপিষ্ঠ বিবেচনা করে যমের কিঙ্কররা এবং শিবভক্ত বিবেচনা করে শিবের ভৃত্যরা সেখানে উপস্থিত হলেন। শিবের দূতেরা সর্বকামপ্রদ বিমান এনেছিলেন। কিন্তু পাশ দণ্ড খড়্গাধারী ক্রূর যমদূতেরা সেই রাজাকে গ্রহণ করবার জন্য উদ্যত হল। তাই দেখে গণাধিপতিরা ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিশূল মুদ্গর চক্র গদা ও মুষল দিয়ে যমদূতদের পীড়িত করলেন এবং রাজাকে শিবপুরে নিয়ে গেলেন।

যমের কিঙ্কররা ফিরে গিয়ে যমকে বললেন, ধর্ম, শিবের গণাধ্যক্ষেরা আমাদের প্রহার করে পাপিষ্ঠ বসুশ্রুত রাজাকে নিয়ে গেছেন। যে কখনও যজ্ঞ করে নি, অতিথির পূজা করে নি, ধর্মত প্রজাপালনও করে নি, সে কেমন করে শিবপুরে গেল? আপনি তো ধর্মদণ্ডধারী, আপনি এর তত্ত্ব আমাদের বলুন।

সূর্যের পুত্র ধর্মরাজ কিঙ্করদের এই কথা শুনে গম্ভীর স্বরে তাদের বললেন, আমি দেবতা অসুর মানুষ ও সমস্ত প্রাণীর পালনকর্তা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিবের ভক্তের শাসনকর্তা নই। মহাদেবই তাদের নিয়ন্তা, অন্য কেউ নন। সদা শিব পূজারত শিবের ভক্তরা

আশ্রমাচারহীন হলেও তাদের সযত্নে পরিত্যাগ করবে। শিবের ভক্ত বর্ণাশ্রম আচার পরিত্যাগ করলেও শাসনের যোগ্য নন, পরন্তু তিনি পূজনীয়।

তাঁরা পাপকর্মে রত হলেও তাঁদের কোন পাপ নেই। মৃগরা যেমন সিংহের নিকটে ভীত, আমি তেমনি শিবের ভক্তদের ভয় পাই। এক সময়ে আমি শ্বেত নামে এক মুনিকে গ্রহণ করতে গিয়ে শিবের হাতে নিহত হয়েছিলাম। তার পর থেকে আমি আব শিবের ভক্তদের শাসন করতে অগ্রসর হই না। রাজা বসুশ্রুত যদিও প্রজাপালন করেন নি, তথাপি কর্ম দেহ মন ও বাক্যে শিবের ভজনা করছেন। শিবের প্রসাদে পাপ তাঁকে স্পর্শ করে নি। একবার যে ত্রিলোচন মহাকালকে দর্শন করে, সে সমস্ত পাপ মুক্ত হয়ে শিবের পরম পদ লাভ করে। যে সতত মহাকালের পূজক, তাকে তোমরা গণাধ্যক্ষ বলে মানবে।

যমের এই কথা শুনে তাঁর কিঙ্করর। নিরুদ্বেগ হল। তাই বলছিলাম, নারদ, শিব বিশেষত শিবের ভক্ত পূজনীয়। ভক্তের পূজায় শিবও প্রীত হন। লোকে নিত্য তৃপ্ত শিবের আর কী করতে পারে! তাঁর ভক্তের তৃপ্তি সাধন করতে পারলেই তাঁর প্রীতি সম্পাদন করা হয়। তুমিও সমস্ত দেবতাকে পরিত্যাগ করে শিবের ভজনা কর।

ব্রহ্মা বললেন, শিবের উদ্দেশে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে একবার পত্র বা পুষ্প প্রদান করলেই অনন্ত ফল লাভ হয়। শতকোটি মহামন্ত্র শিবের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। কিন্তু সে সব পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান নয়। দীক্ষিত বা অদীক্ষিত ব্যক্তি বিধিমতো বা অবিধিমতো এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে শিবের অনুচর হয়। এই মন্ত্র জপ করে ভ্রূণ হত্যার মতো পাপ থেকেও সদ্য মুক্ত হওয়া যায়। যে বিল্ব-পত্র দিয়ে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে শিবের পূজা করে, তার শিবপদ প্রাপ্তি হয়। বিল্ববৃক্ষ দর্শন স্পর্শ বা বন্দনা করে অহোরাত্রে কৃত পাপ বিনষ্ট হয়। অন্তকালে সর্বাঙ্গে বিল্ববৃক্ষমূলের মৃত্তিকা লেপন করলে পরম গতি লাভ হয়। পুষ্পা ভাবে পত্র নিবেদনীয়, ফলের অভাবে তৃণ গুল্ম ও ওষধি দিয়ে

পূজা করবে। ওষধির অভাবে শুধু ভক্তি দিয়েই শিবের পূজা হতে পারে। যে নিজে পুষ্প বৃক্ষ রোপণ করে সেই পুষ্পে শিব পূজা করে, তার সেই পুষ্প দেবদেব মহেশ্বর সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন। শিবলিঙ্গের চতুর্দিকে এক ক্রোশ শিব ক্ষেত্র। কোন ঋষির স্থাপিত লিঙ্গের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ দুই ক্রোশ এবং স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ক্ষেত্রে এক যোজন। এই শিবের ক্ষেত্রে কোন পাপাচারী ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তার শিবপদ প্রাপ্তি ঘটে। শিবক্ষেত্রের সম্মুখবর্তী জলাশয়ের নাম শিব গঙ্গা। সেখানে স্নান করে শিবের দর্শন করবে। শিবের ক্ষেত্রে যে দীঘিকা বা কূপ নির্মাণ করে, সে একুশ পুরুষ নিয়ে শিবলোকে বাস করে।

নারদ বললেন, পিতা, লিঙ্গ কার নাম? লিঙ্গের অধিষ্ঠাতাই বা কে?

ব্রহ্মা বললেন, তমোতীত অব্যক্ত আনন্দই লিঙ্গ নামে কথিত। মহাদেবের যত্নে উদ্ভূত বলে তাঁকে লিঙ্গী বলা হয়। পুরাকালে ঘোর একার্ণবে স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হলে আমার ও বিষ্ণুর প্রবোধের জন্য শিব স্বরূপ লিঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল। তখন থেকেই আমি ও বিষ্ণু পরম ভক্তিভরে লিঙ্গমূর্তিধারী শান্ত বৃষধ্বজকে পূজা করি।

নারদ বললেন, কেন আপনাদের উভয়ের প্রবোধের জন্য আনন্দ-স্বরূপ শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হয়েছিলেন?

ব্রহ্মা বললেন, ঘোর একার্ণব কালে জগৎ পরিচ্ছেদ শূন্য এবং তমোময় হলে তপ্তকাঞ্চনপ্রভ বিষ্ণু শয়ান ছিলেন। আমি তার সমীপবর্তী হয়ে ক্রোধ সহকারে বললাম, দুর্মতি, তুমি শুয়ে আছ কেন? উঠে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি জগতের অধিপতি। যদি যুদ্ধ করতে না চাও তো আমাকে ভজনা কর। অমেয়াত্মা মধুসূদন আমার এই কথা শুনে হেসে বললেন, বৃথা গর্ব করছ কেন। আমিই সর্বলোকের কর্তা, আমিই পালক ও অন্তে আমিই সব সংহার করে থাকি। আমার সমান আর কেউ নেই। বিষ্ণুর সঙ্গে এই নিয়ে আমার বিবাদ আরম্ভ হলে আমাদের উভয়ের দর্পহারী লিঙ্গ

প্রাদুর্ভূত হলেন। সেই লিঙ্গ কালানল তুল্য জ্বালা মালায় পরিবৃত, আদি মধ্য অন্ত ও ক্ষয় বৃদ্ধি শূন্য। এই লিঙ্গের মধ্যেই স্বপ্রকাশ সনাতন অর্ধনারীশ্বর মহাদেব স্বয়ং অধিষ্ঠিত। তিনি বললেন, তোমাদের বিবাদ এখন থাক। আমি কিছু বলছি। বিষ্ণু যদি আমার এই লিঙ্গের মূল দর্শন করতে পারেন তো তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মা যদি এর অগ্রভাগ দেখতে পান তো তিনিই শ্রেষ্ঠ হবেন। শিবের এই কথা স্বীকার করে আমি লিঙ্গের অগ্রভাগ দেখতে গেলাম এবং বিষ্ণু গেলেন মূল দেখতে। আমরা মায়ামোহিত চিত্তে সহস্র বৎসর চলে শুধু বিস্ময়াবিষ্ট হলাম। বিষ্ণু মূল দেখতে না পেয়ে সেখানে ফিরে এলেন, আমিও বিফল মনোরথে ফিরে এলাম। আমরা উভয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে বিবিধ প্রকার স্তব করলে মহাদেব বললেন, মাধব, আমার প্রসাদে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ হও। আমার ভক্তদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ পূজ্য ও মান্য হবে। লিঙ্গে আমাকে তুমি পূজা কর,তারপর অন্য দেবতারাও লিঙ্গ পূজা করবে। লিঙ্গ পূজায় আমি অজ্ঞান বিনাশ করি। মহেশ্বর বিষ্ণুকে এই বর দিয়ে আমাকে বললেন, ব্রহ্মা, তোমাকেও আমি বর দিচ্ছি, গ্রহণ কর। তুমি চরাচর জগতের মান্য হও, এবং চতুর্মুখে চতুর্বেদ গ্রহণ কর। বিশ্বেশ্বর আমাদের উভয়কে বর দিয়ে ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্হিত হলেন। তারপর থেকেই বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা দৈত্য দানব গন্ধর্ব মুনি সিদ্ধ যক্ষ নাগ ও কিন্নরেরা লিঙ্গ পূজা করে সিদ্ধি লাভ করছে। ত্রিভুবনে লিঙ্গ পূজার চেয়ে শ্রেয় আর কিছু নেই।

নারদ বললেন, শিব যেখানে সন্নিহিত এমন দিব্য স্থানের কথা আমাকে বলুন।

ব্রহ্মা বললেন, আমি দিব্য লিঙ্গ ও তীর্থের মাহাত্ম্য তোমাকে বলছি। সমুদ্র শিবের পরম মূর্তি। এইজন্য আমি বিষ্ণু ও অন্য দেবতারা এই সমুদ্রে বাস করি এবং সমুদ্রকে তীর্থরাজ বলা হয়। জম্বুদ্বীপ পবিত্র স্থান, এর মধ্যে লবণ সাগর অতি পবিত্র। সমুদ্র দর্শনে অহোরাত্রের পাপ বিনষ্ট হয়, স্নান করলে এক মাসের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। চন্দ্র

বা সূর্য গ্রহণে স্নান করলে সমগ্র দানের ফল লাভ হয়। বাড়বানল যুক্ত বলেই এই তীর্থ এত পবিত্র। এর চেয়ে বড় তীর্থ পৃথিবীতে আর নেই। যেখানে গঙ্গা গোদাবরী নর্মদা চন্দ্রভাগা ও বেদিকা নদীর সঙ্গম, সেই-খানে সমুদ্রস্নান করবে। সমুদ্রতীরে তেজলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। পুরাকালে সেখানে সাত কোটি মুনি সিদ্ধ হয়েছেন। তার পর থেকেই সেই লিঙ্গ সপ্তকোটিশ্বর নামে বিখ্যাত হয়েছেন। তার স্মরণ মাত্রেই সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

ব্রহ্মা বললেন, উজ্জয়িনীতে যারা মহাকাল দর্শন করবে, তাদের দুঃখবর্জিত পরম স্থান প্রাপ্তি হয়। মহাকাল লিঙ্গ দিব্যলিঙ্গ নামে অভিহিত। সেই লিঙ্গ স্পর্শ করলে সশরীরে শিব প্রাপ্তি হয়। এ কথা অবগত হয়ে আমি তাঁর সন্নিধানে কুক্কুটাকার এক পাষাণ খণ্ড নিক্ষেপ করি। মহাকালের প্রভাবে তিনি কুক্কুটেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ হয়েছেন। সেই রমণীয় নগরে শূলেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন। এর পূর্বভাগে ওঙ্কারেশ্বর লিঙ্গ। সেখানে পুণ্য বারিতে পূর্ণ এক দিব্য কুণ্ড আছে। অগস্ত্যমুনি এখানেই তপস্যায় শিবের আরাধনা করেছিলেন। তাতে শিব প্রাদুর্ভূত হন। তিনিই অগস্ত্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। সেখানেই শক্তিভেদ নামে মুনিসেবিত তীর্থ। সেখানে স্নান করে ভদ্রবট দর্শন করলে সমস্ত পাপমুক্ত হয়ে কার্তিকেয় লোক প্রাপ্তি হয়। উজ্জয়িনীর চারি দিকে কোটি কোটি তীর্থ আছে। কার্তিকেয় স্কন্দ পুরাণে তাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

কুরুক্ষেত্রে স্থাণু নামে মহেশ্বর আছেন। সেখানে তপস্যা করে আমি ব্রহ্মত্ব লাভ করেছি। বালখিল্যাদি ঋষিরাও সেখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন। পুলহ ঋষি পূর্বজন্মে স্থাণুর মন্দিরে মশক ছিলেন। স্থাণুর প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর আমার পুত্র হয়ে জন্মেছেন।

প্রয়াগ তীর্থরাজ নামে বিখ্যাত তীর্থ। সেখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। শিবও আছেন। পরম গোপনীয় অন্য তীর্থ আছে, তার নাম গয়াতীর্থ।

সেখানে শিবের চরণ যুগল প্রতিষ্ঠিত। গয়ায় পিণ্ডদান করলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। মহানদীতে স্নান করে রুদ্রপাদ স্পর্শ করলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। শিবের প্রিয় মহাতীর্থ মহাকালেও দেবাদিদেব ভূতলে চরণ বিন্যাস করেছেন।

ব্রহ্মা বললেন, তিথির শেষ ভাগে উপবাস করতে হয়। পিতৃগণের সন্তোষের জন্য তিথির পূর্ব ভাগ গ্রাহ্য। যে তিথিতে সূর্যাস্ত হয়, তাতে দিনের তিন মুহূর্ত থাকলেই তাকে সম্পূর্ণ তিথি বলে মানতে হয়। গুরু-সঙ্গে অন্ধকার বিনাশ বোঝায়। গুরুত্যাগে মৃত্যু ও মন্ত্রত্যাগে দারিদ্র্য।

নারদ বললেন, মহেশ্বর কেন যমের কাল স্বরূপ হয়েছিলেন, তা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ব্রহ্মা বললেন, পুরাকালে শ্বেত নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি তীর্থজলস্নায়ী, যম-নিয়ম-সেবী, সামগুণাবলম্বী, শিবপূজারত ও শৈবদের অগ্রগণ্য ছিলেন। ভয়ঙ্কররূপী যম তাঁকে নেবার জন্য দণ্ড হাতে উপস্থিত হলেন। সেই বিপ্র যমকে দেখে ভয়ে ব্যাকুল চিত্তে দু হাতে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে শিবের ধ্যান করতে লাগলেন। যম তাই দেখে অট্টহাস্য করে শ্বেত মুনিকে বললেন, আমি এলে প্রাণীরা কি আর সুস্থ থাকতে পারে! আমার ভয়েই লোকে ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা করে এবং স্বকর্ম পরায়ণ হয়ে তীর্থ ও দানের প্রশংসা করে। দেবতার পূজা ও বিবিধ যজ্ঞাদি করে আমারই ভয়ে। এখন উঠে আমার পাশের বশবর্তী হও, তোমাকে নিয়ে যাই।

যমের এই কথা শুনে শ্বেত সভয়ে করালরূপী যমকে বললেন, আমি শিবপূজারত, আমাকে নেওয়া আপনার আয়ত্ত নয়। শিবপূজা পরায়ণ ব্যক্তি আপনাকে ভয় পাবে কেন?

শ্বেত মুনি এই কথা বললে যম তাঁকে দৃঢ়তর পাশে বন্ধন করে ফেললেন।

তারপর ত্রিলোকের কর্তা মহাদেব আবির্ভূত হলেন। ঈশ্বরকে দেখে শ্বেত মুনি হৃষ্ট হলেন।

শঙ্কর যমকে বললেন, আমার ভক্তকে ছেড়ে দাও। সে স্বাধীন। তাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ কেন?

কিন্তু যম তাঁর কথা লঙ্ঘন করে শ্বেত মুনিকে বন্ধন করে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। তাই দেখে মহাদেব যমকে ভস্মসাৎ করলেন এবং শ্বেত মুনিকে পাশ বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন। তাঁকে নিত্য গাণপত্য পদ দিয়ে ক্ষণকালের মধ্যে দেবীর সঙ্গে অন্তর্হিত হলেন। এই জন্যই শম্ভু কাল-কাল নামে অভিহিত। পরে আমি বিষ্ণুর সঙ্গে মহাদেবকে স্তবে প্রসন্ন করলে যম পুনর্জীবিত হল।

নর্মদার তীরে আর একটি পবিত্র তীর্থ আছে, তা জালেশ্বর নামে খ্যাত। জালেশ্বর শিবের নিকটে কোটি কোটি তীর্থ আছে। শ্রীপর্বত নামে আর এক শুভ তীর্থ আছে। এই পর্বতের সব জায়গায় সিদ্ধ মুনিদের দেখা যায়। শ্রীমল্লিকার্জুন লিঙ্গে শিব সতত সন্নিহিত। সেই পরম লিঙ্গ দর্শন করলে মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। শ্রীপর্বতে মৃত্যু হলে শিবের পরমপদ লাভ হয়।

কেদারে রুদ্রদেবের পরম প্রিয় তীর্থ আছে। দেবিকা নদীর তীরে বৃষধ্বজ তীর্থে পরম লিঙ্গ বর্তমান।

পাপহারিণী গোদাবরী নদী যেখানে নির্গত হয়েছেন, সেখানে ঈশ্বর ত্র্যম্বক নামে খ্যাত। সেই ব্রহ্মগিরিতে স্নান দান জপ যজ্ঞাদিতে অক্ষয় ফল লাভ হয়। গোদাবরীতে স্নান করে ত্র্যম্বক দর্শন করলে কার্তিকেয় ও নন্দীর সমান হয়ে শিবের সমীপে ক্রীড়া করা যায়।

নর্মদার অনতিদূরে গোকর্ণ নামে বিখ্যাত তীর্থ, শিব সেখানে সর্বদা সন্নিহিত। গোকর্ণ লিঙ্গের বায়ু কোণে দেবেশী ভদ্রকালী আছেন। সেখানে মহাবল নামে শিব। সিন্ধু তীর্থে দক্ষিণ গোকর্ণ নামে মহেশ্বর

আছেন এবং দারুবনে শিবের আর এক প্রিয় তীর্থ। সেই তীর্থে শিব মুনিপত্নীদের মোহিত করেছিলেন।

নারদ বললেন, কী ভাবে তিনি মুনিপত্নীদের মোহিত করেছিলেন, তা সংক্ষেপে বলুন।

ব্রহ্মা বললেন, শিবের শুভ চরিত্র বলছি, শোন। ভৃগু অত্রি বশিষ্ঠ পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু জমদগ্নি ভরদ্বাজ গোতম ভাগুরি বামদেব অঙ্গিরা শঙ্খ লিখিত বৃহচ্ছ্রবা বিশ্বামিত্র জাবালি ও অন্যান্য মুনিরা শিবের পরম ভাব অবগত না হয়েই যজ্ঞে শিবপূজা ও তপস্যা করছিলেন। তপঃ-ক্লিষ্ট সেই মুনিদের মাথা থেকে ধূম উত্থিত হল, তাতে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হল।

দেবী ত্রৈলোক্য ধূমে ব্যাপ্ত দেখে কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ধূমের কারণ কী?

ঈশ্বর বললেন, দারুবন তীর্থে তপোনিষ্ঠ মুনিরা অবস্থান করছেন। আমাকে অবগত না হয়েই তাঁরা শরীরকে ক্লেশ দিচ্ছেন। তাঁদেরই মাথার ধূমে চরাচর ব্যাপ্ত হয়েছে। কিন্তু আমাকে না জানলে সমস্ত কর্মই নিষ্ফল।

শিবের এই কথা শুনে দেবী বললেন, মুনিরা কেমন অজ্ঞান, তা দেখতে আমার উৎসাহ হচ্ছে!

দেবীর এই কথা শুনে নীললোহিত বিট বেশ ধারণ করে দারুবনে গেলেন। বিষ্ণুও স্ত্রীরূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। বিষ্ণুর সঙ্গে শিব দেবদারু বনবাসীদের মায়ায় মোহিত করে সেই বনে বিচরণ করতে লাগলেন। মুনিপত্নীরা শিবকে দেখে মদনানলে দীপিত হয়ে লজ্জা ও বস্ত্র ত্যাগ করে তাঁর অনুগামী হল এবং মুনিকুমাররাও কামবাণে পীড়িত হয়ে স্ত্রীরূপধারী বিষ্ণুর অনুগমন করল। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে মুনিরা ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে লিঙ্গহীন ও বিষ্ণুকে গোপবেশধারী করলেন। এর পর থেকেই শিবা মেখল-সঙ্গিতা হলেন অর্থাৎ গৌরীপট্ট

ও লিঙ্গের সংযোগই শিবস্বরূপ হল।

দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার এই কথা শুনে শিবভক্তি নিয়ে তীর্থ করতে গেলেন।

সূত বললেন, শৌনক, এই সৌর পুরাণ আমি আপনার নিকটে যথাযথভাবে কীর্তন করলাম। ইহা শ্রবণ করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। শিবভক্ত ব্রাহ্মণদের পুরস্কৃত করে শ্রদ্ধা সহকারে একাগ্র চিত্তে এই পুরাণ শ্রবণ করবে।

সৌর পুরাণ সমাপ্ত